প্রকাশক : সুনীল পট্টনায়ক
স্কাইলার্ক পাবলিকেশন্স্
১৪/৬২, আচার্য্য পল্লী
নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা

স্বত্ব : বীতা নাগ

প্রথম প্রকাশ . পঁচিশে বৈশাখ, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ : দীননাথ সেন

বাঁধাই : স্বরূপ বাইণ্ডার্স
৪৩, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন কলিকাতা-৬

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাসচন্দ্র অধিকারী
স্বপ্না প্রেস
৩৫/২/১এ বীডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বাবা-মা কে

মনুষ্যত্ববোধের
প্রথম পাঠ
যাঁদের কাছে পেয়েছি

মুখবন্ধ

'The older I grow, the more every thing seems to me to lie in Manliness. This is my new gospel.'

Swami Vivekananda

মনুষ্যত্ববোধ, ইংরেজীতে যাকে বলি 'ম্যানলিনেস, কথাটির সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ বলেই, উদাহরণের প্রয়োজন। ছাত্রজীবনে যখন গ্যাব্রিয়েল ওকেব প্রথম খোঁজ পেয়েছিলাম, তখনই তাকে অমন একটি উদাহবণ বলে মনে হয়েছিল। বয়সে তখন নবীন ছিলাম তাই 'মানুষ' চিনতে ভুল হয়নি। সাধাবণ জীবন-যাপনের পটভূমিতেই যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। শক্তিমত্তা, কৌশল, মেধা বা শাস্ত্রপাঠ দ্বারা তাকে অর্জন করা যায় না। এ গল্পের নায়িকা বাথশেবা এভার্ডিন প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এমন এক নারী, যাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় পুরুষ অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করে থাকে। বাথশেবা ও তার তিন প্রেমিকের এ কাহিনী মানবিক হৃদয়বৃত্তির এক সনাতন কাব্য। বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে এইসব মানুষদের অন্তরঙ্গ পরিচয় করিয়ে দেওয়াব তীব্র বাসনাই আমার বর্তমান প্রচেষ্টার পশ্চাৎপট।

টমাস হার্ডির 'ওয়েসেক্স নভেলস' আজ ক্লাসিকস্ বলে পরিগণিত। অথচ লজ্জার কথা, বাংলা ভাষায় সেগুলি অনুবাদ করার কোনো উল্লেখযোগ্য অনুশীলন এযাবৎ লক্ষ্য করা যায় নি। এই অভাববোধই 'ওয়েসেক্স নভেল' গুলির বাংলা রূপান্তরে ব্রতী করেছিল আমাকে। অনুবাদকে সাধ্যমতো মূলানুসারী করার চেষ্টা করেও মাঝে মাঝে বাস্তব অসুবিধার সঙ্গে আপস করতে হয়েছে কারণ আক্ষরিক অনুবাদের দৈন্য আমার কাছে সবসময়েই অস্বস্তিকর। এই প্রয়োজনেই বর্ণনা কোথাও কোথাও সঙ্কুচিত করতে হয়েছে কাহিনীকে অক্ষুণ্ণ রেখে।

হার্ডির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ আমার একমাত্র প্রেরণা। তবুও বলতে হয়, আমার পিতৃতুল্য অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল আমাকে নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন, নইলে হয়তো আরব্ধ কর্ম শেষ হত না। মূল পুস্তকটি সরবরাহ করে আমাকে উপকৃত করেছেন শ্রীবিপ্লব পাল। আমার কোনো কোনো আত্মীয়ের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে রাত্রিজাগরণ-জনিত শারীরিক অসুস্থতার কারণে। সময় ও স্বাস্থ্যের অপচয় মনে করলেও তাঁরা প্রশ্রয় দিয়েছিলেন বলেই কাজটি শেষ হয়েছে। শ্রীপার্বতীচরণ চক্রবর্তী ও শ্রীসুনীলবরণ পট্টনায়কের ঐকান্তিক আগ্রহ ব্যতীত এ বই প্রকাশ লাভ করত না। প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন শ্রীদীননাথ সেন। মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীদেবপ্রসাদ পাল ও শ্রীহৃষীকেশ সাহা। প্রকাশনার যাবতীয় ঝক্কি বহন করেছেন শ্রীতরুণ রাণা। এঁরা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। শ্রীমিণ্টু রাণার প্রসঙ্গ না উল্লেখ করলে আমার মুখবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেই ছিল আমার এ লেখনের প্রথম পাঠক। অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের দ্বারা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে সে একাধিক পাঠককে এ কাহিনীর স্বাদগ্রহণে অংশীদার করেছিল। এই বই প্রকাশিত হওয়া তারও তৃপ্তির কারণ হওয়া উচিত— আত্মগোপন করে থাকলেও আশাকরি এ বই তার হাতে পড়বে একদিন।

অনুবাদের উপভোগ্যতা এবং পাঠকের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি সর্বদা, তৎসত্ত্বেও যা কিছু ত্রুটি রয়ে গেল, তা সবই আমার। কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে গেছে সময়ের স্বল্পতার জন্যে। রোজকার শ্রমে যাঁদের জীবিকা-অর্জন করতে হয়, তাঁরা আমার এ আক্ষেপ উপলব্ধি করতে পারবেন। শুধু সান্ত্বনা, টমাস হার্ডির প্রেমিক ও অনুরাগী হিসেবে তাঁর সৃষ্টিকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পরিচিত করতে পারলাম. পাঠকের অন্তরেও সেই অনুরাগ জন্মালে শ্রম সার্থক মনে করব।

অনুপ বসু

ভূমিকা

টমাস হার্ডির মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষঙ্গে মনস্বিনী ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ লিখেছিলেন যে, হার্ডি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি যে মহৎ গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত করে' তাদের মহত্তম ট্রাজেডী নাট্যের মহিমায় উন্নীত করেছেন, তা কেবল তুলনা রহিতই নয়, আধুনিক কথাকারদের হাতে উপন্যাস যে অন্যতম বিনোদনশিল্পে পরিণত হতে চলেছিল, সেই দুর্গতি থেকে এই শিল্পরূপকে রক্ষা করে' তিনি তাকে তার আপন উচ্চ অধিকারেও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'ঔপন্যাসিক' এই অভিধাটি তাই আজ আর অগৌরবের নয়।

কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। হার্ডি যখন উপন্যাস রচনায় হাত দেন, তখনই সেই শিল্পরূপটির বয়স দেড়শত বৎসর অতিক্রান্ত; বহু শক্তিমান শিল্পীর রূপসৃষ্টি তাকে ঐশ্বর্যশালী করেছে, নানা রস ও সুরের বৈচিত্র্য তাকে মহোজ্জল করেছে, নানা ভাবচিন্তার ফসল তাকে সমৃদ্ধ করেছে, হাসি অশ্রুর বর্ণালিবিভঙ্গ তাকে হৃদয়লোভন করেছে। এই আসরে এসে হার্ডি যে কেবল একটি নতুন সুরই যোগ করলেন, একটি নবীন রসদৃষ্টির বিভাই সঞ্চার করলেন তাই নয়, তিনি এমন একটি অতিপ্রবল জীবনদর্শন নিয়ে এলেন, যাকে নমনীয় রূপবন্ধে সার্থক করা, অসাধারণ প্রতিভা, নিষ্ঠা ও শিল্পনৈপুণ্যের অপেক্ষা রাখে। হার্ডির শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে সেই প্রতিভা, নিষ্ঠা ও শিল্পপ্রকর্ষের প্রশ্নাতীত উপস্থিতি সকলেই স্বীকার করবেন। এখানে যে মহিমান্বিত রূপসৃষ্টির সাক্ষাৎ ঘটে, তার তুলনা কেবলমাত্র গ্রীসীয় তথা শেক্সপীয়রীয় মহান ট্রাজেডী নাটকগুলি। উপন্যাসকে এই মহত্তম শিল্পপদবীতে উপনীত করে' হার্ডি যে এই রূপবন্ধকে এক অনন্য মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা অবশ্য স্বীকার্য্য। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান কেবল টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কির সৃষ্টিকর্মের সঙ্গেই তুলনীয়।

টমাস হার্ডির জন্ম ১৮৪০ সালে। দক্ষিণপশ্চিম ইংলণ্ডের ডরচেষ্টার শহরের কাছে, এক ছোট্ট গ্রাম হায়ার বখ্যাম্পটনে। পিতা ছিলেন বাস্তুকার। ধনী পরিবার নয়, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবার অর্থ সামর্থ্য ছিল না। স্কুলের পড়ার শেষে হার্ডি মিঃ হিক্‌স্‌ নামে ডরচেষ্টারের এক স্থপতির কাছে শিক্ষানবিশ

নিযুক্ত হন। পরে লণ্ডনের এক খ্যাতনামা স্থপতির কাছেও তিনি পাঠগ্রহণ করেন। যদিও হার্ডি শেষ পর্যন্ত স্থপতির বৃত্তি ত্যাগ করেছিলেন, তবু স্থাপত্য শিল্পে দীর্ঘ শিক্ষানবিশী ও পাঠগ্রহণ তাঁর শিল্পদৃষ্টি ও সাহিত্যকর্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। হার্ডির উপন্যাসে যে নির্মাণকৌশল, অবয়ব সংস্থান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভারসাম্যের প্রতি মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়, তা এই কৃচ্ছ্রলব্ধ স্থাপত্য জ্ঞানেরই ফলশ্রুতি।

এই শিক্ষানবিশী কালেই তিনি নিজের চেষ্টায় গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন শুরু করেন এবং সমসাময়িক চিন্তা নায়কদের ভাবনার সঙ্গেও পরিচিত হন। মিল, স্পেন্সার, হাক্সলী ও ডারুইন তাঁর চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, এবং শোপেনহাওয়ারের দর্শনও তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করে। যদিও মানুষের আপন মনের স্বভাবই নিরূপিত করে সে কোন ভাবচিন্তার দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হবে, এবং হার্ডির মনঃপ্রকৃতি ছিল বিষণ্ণ ও গম্ভীর, তবু এও সত্য যে, হার্ডির জীবনদর্শন ও বিশ্ববীক্ষা মিল, ডারুইন, স্পেন্সার, হাক্সলী ও শোপেন হাওয়ারের সুশৃঙ্খল চিন্তারাজিদ্বারাই পুষ্টি লাভ করে এবং সুপরিণত রূপ নেয়।

অল্প বয়স থেকেই কবিতা লেখার হাত ছিল তাঁর। কিন্তু কবিতায় যে অন্ন নাই তাও জানতেন। এদিকে উপন্যাসের আছে আকর্ষণীয় বাজার। তাই সেই নবীন স্থপতি আর্থিক আনুকূল্যের প্রত্যাশায় উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। তাঁর আটাশ বছরের প্রথম রচনা "দি পুয়োরম্যান এণ্ড দি লেডি" দুটি প্রকাশক সংস্থা কর্তৃক প্রত্যাখাত হলেও হার্ডি কিন্তু নিরুৎসাহ হন না। উপন্যাস রচনায় তাঁর দ্বিতীয় প্রয়াস "ডেসপারেট রেমিডিজ" জনৈক প্রকাশক গ্রহণ করে—তবে হার্ডিকে বইটি প্রকাশের অর্দ্ধেক খরচ বহন করতে হয়। এ বইটি কিছু সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও ধীরে ধীরে প্রথম সংস্করণ বিক্রীও হয়ে যায়। এর পরের বই 'আণ্ডার দি গ্রীণ উড ট্রি'ও ঐ প্রকাশকই বের করেন, তবে এবারে হার্ডিকে প্রকাশন ব্যয়ের অতি সামান্য অংশই বহন করতে হয়। এবারও বইয়ের বিক্রী হয়, তবে ধীরে। এরকম অনিশ্চিত আয়ের ভরসায় থাকা নবীন স্থপতির পক্ষে খুব উৎসাহজনক নয়। তাই প্রকাশকের পরামর্শে হার্ডি এর পরে মাসিক পত্রিকার জন্যে ধারাবাহিক কিস্তিতে উপন্যাস লিখতে মনস্থ করেন। এভাবে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'এ পেয়ার অব ব্লু আইজ'। ধারাবাহিক প্রকাশনে অনেক অসুবিধা আছে, তবে একটা নিশ্চিত আয়ের প্রতিশ্রুতি থাকে

বলে লেখকের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে না। এছাড়া পত্রিকা মাধ্যমে বিস্তৃততর পাঠকসমাজে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে, এবং যা মোটেই অবহেলনীয় নয়, উপন্যাসটি পরিশেষে বইয়ের আকারে প্রকাশের সম্ভাবনাও থাকে। 'এ পেয়ার অব ব্লু আইজ'-এর ক্ষেত্রে তাই হল। এটি মাসিক পত্রে প্রকাশকালেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে, এবং পরে যখন বই হয়ে প্রকাশিত হয় তখন বেশ ভালো কাটতি হয়।

হার্ডির প্রতিভার স্বীকৃতি ও বাজারদর দুইই ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এর পরের উপন্যাসটি মনীষী লেসলি স্টিফেন সম্পাদিত 'কর্ণহিল ম্যাগাজিন-এ মাসিক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর বিখ্যাত 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড'। ১৮৭৪ সালে 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড' পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। সেই বছরই তিনি বিবাহও করেন—স্ত্রীর নাম এম্মা গীফোর্ড। এর পরের কিস্তিবন্দী উপন্যাস 'হ্যাণ্ড অব এথেলবার্টা' কিন্তু নিতান্ত জোর করে জোড়াতাড়া দিয়ে লেখা একটি কাহিনী। এতে প্রতিভার কোনো স্পর্শই চোখে পড়ে না। এর পরের উপন্যাসটি তিনি ধীরে সুস্থে লেখেন যা ১৮৭৮এ বই হয়ে প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস-সপ্তকের অন্যতম, 'দি রিটার্ণ অব দি নেটিভ'। লেখক হিসেবে আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও প্রতিভার স্বীকৃতি দুইই তিনি তখন অজন করলেন। এর পরের বই 'দি ট্রাম্পেট মেজর'ও খুব জনপ্রিয় হয়।

এর পর দুটি অপ্রধান কাহিনী "লাওডিসিয়ান" ও "টু অন্ এ টাওয়ার" (মাসিক কিস্তিতে ও পুস্তক আকারে) প্রকাশের পরে তাঁর পরপর দুটি সার্থক উপন্যাস প্রকাশিত হয়—১৮৮৬ ও ১৮৮৭-তে—যথাক্রমে, "দি মেয়র অব ক্যাষ্টারব্রিজ" এবং "দি উডল্যাণ্ডার্স"। এরপর হার্ডির সর্বস্বীকৃত মহত্তম উপন্যাস "টেস অব দি ডার্বারভিলস" প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে। টেস্-এর দ্বারা তিনি তৎকালীন প্রথম সারির ঔপন্যাসিকদের অন্যতম বলে পরিগণিত হন। সমালোচকপ্রবর লায়নেল জনসন ঐ বছরই তার "দি আর্ট অব টমাস হার্ডি" গ্রন্থে হার্ডির প্রতিভার অনন্য বৈশিষ্ট্যের উপর বিশদ আলোকপাত করেন। টেসও যথারীতি প্রথমে মাসিকপত্রে ধারাবাহিক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। মাসিক কিস্তিতে প্রকাশের সময় পাঠকদের মনস্তুষ্টির জন্যে ও তাদের অভ্যস্ত সংস্কারকে বাঁচিয়ে চলার তাগিদে তাঁকে কাহিনীর শেষদিকে অনেক কাট-ছাঁট করতে হয়েছিল। এটা হার্ডির মোটেই মনঃপুত ছিল না, কিন্তু পত্রিকা

সম্পাদকের অনুরোধে এটা তাঁকে করতে হয়। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশের কালে সেই পরিত্যক্ত অংশগুলি তিনি কাহিনীতে পুনর্বিন্যস্ত করেন। ফলে বইটি গুণীজনের দ্বারা বহুলভাবে সমাদৃত হলেও নীতিবাগীশদের কোপে পড়ে। তাদের ক্রুদ্ধ আক্রমণে পত্র-পত্রিকা ফেনিল হয়ে ওঠে। তবে এই আক্রমণের ফলে তাঁর বইয়েব বিক্রী খুব বেড়ে যায়। সকলেই এই অতি-আলোচিত লেখকের বই পড়ে দেখতে উৎসুক হয়। হার্ডি মনে মনে স্থির করেন, উপন্যাস লেখা ছেড়েই দেবেন, কবিতাই তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত মাধ্যম। কিন্তু আরেকটু আর্থিক সুনিশ্চিতি দরকার, তাই তাঁর সুচিরসঞ্চিত কবিতাবলি প্রকাশের সংকল্প আপাততঃ স্থগিত রেখে আরেকটি উপন্যাসে হাত দিলেন। এটি তাঁর সর্বাধিক বিতর্কিত উপন্যাস "জুড্ দি অবস্কিওর"। এটিও অর্থনৈতিক যুক্তির প্রেরণায় প্রথমে সাময়িকপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'জুডে'র মধ্যে বিস্ফোরক বস্তুর পরিমাণ টেসের অপেক্ষা অনেক বেশী থাকায় সম্পাদকেব অনুরোধে তাঁকে এক্ষেত্রে আরো অনেক বেশী কাটছাঁট কবতে হয়। পরে পুস্তক আকারে প্রকাশের সময় সেই সব ছাঁটাই অংশ পুনর্বিন্যস্ত ও সংযোজিত হয়ে বের হলে ভীষণ হৈচৈ পড়ে যায়। এবার আক্রমণের বিপুলতা ও ব্যাপকতা তাঁর মনকে অত্যন্ত তিক্ত করে তোলে। উপন্যাসে লেখকেব সত্যকথনের স্বাধীনতা খুবই সীমিত, পদে পদে পাঠকদের মনোরঞ্জনেব জন্য তাদের স্পর্শকাতর সংস্কারবদ্ধ চেতনার কথা মনে রেখে চলতে হয়। তিনি তাই উপন্যাস আব লিখবেন না এ বিষয়ে মনঃস্থির করে ফেললেন। আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও নিরাপত্তাও এখন সুনিশ্চিত। তাই তিনি তাঁর পুরানো কবিতাগুলি বাছাই করার কাজে মন দিলেন। এদিকে 'জুডে'র আগে লেখা একটি ছোট্ট কাহিনী হাতে ছিল, নাম "দি ওয়েল বিলাভেড"—সেটিও প্রেসে প্রকাশের জন্য দিয়ে দিলেন। এ বইটির প্রকাশকাল ১৮৯৭—'জুডে'র প্রকাশের ঠিক একবছর পরে। এটিই তাঁর প্রকাশিত শেষ উপন্যাস। এর পরের বছব (১৮৯৮) থেকে তিনি শুধু কবিতাই প্রকাশ করেন। কবিতা এবং কাবানাটক। পরবর্তী আরো যে ত্রিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন—তাঁর দেহাবসান ঘটে ১৯২৮-এ—তিনি বারোটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ'র মধ্যে আছে ১৯০৪, ১৯০৬ ও ১৯০৮-এ প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত এপিক কাবানাট্য "দি ডিন্যাস্টস্"-এর তিন খণ্ড। তাঁর মৃত্যুর বছরেও একটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, নাম "উইণ্টার-ওয়ার্ডস"। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল অষ্টাশি।

হার্ডির প্রথমা স্ত্রী এম্‌মা ১৯১২ সালে মারা যান। এর দু'বছর পরে হার্ডি লেখিকা ফ্লোরেন্স এমিলি ডাগডেলকে বিবাহ করেন। হার্ডির ভস্মাবশেষ ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবিতে সমাহিত করা হয়, তবে তাঁর হৃৎপিণ্ডটি তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রোথিত করা হয় তাঁর প্রিয় 'ওয়েসেক্সে'।

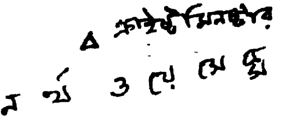
ব্যক্তিজীবনে হার্ডি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও নিরভিমান। খ্যাতির উচ্চতম শিখরেও তাঁর সহজ ভদ্রতা, নম্রতা ও অকপটতা সকলকে মুগ্ধ করেছে। জীবনের শেষ পঁচিশ বছর তিনি ছিলেন ব্রিটেনের সর্বাধিক মান্য লেখক। বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট অব লিটারেচারে ভূষিত করেছিল। বহু তরুণ লেখক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। তাঁর একাশিতম জন্মদিনে ১০৬ জন ব্রিটিশ লেখকলেখিকা তাঁকে একটি স্বাক্ষরিত মানপত্র দেন। সেই মানপত্রের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি।—

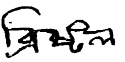
"In your novels and poems you have given us a tragic vision of life which is informed by your knowledge of character and relieved by the charity of your humour and sweetened by your sympathy with human endurance. We have learned from you that the proud heart can subdue the hardest fate even in submitting to it.

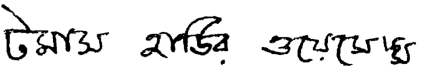
[আপনার উপন্যাসে ও কবিতায় আপনি আমাদের কাছে জীবনের ট্র্যাজিক রূপ উন্মোচিত করেছেন, যে আলেখ্য আপনার মানব-চরিত্র জ্ঞানের দ্বারা প্রবুদ্ধ এবং আপনার সহৃদয় হাস্যরসের বিভায় আলোকিত, এবং মানুষের দুঃখসহন শক্তির প্রতি আপনার সহানুভূতির স্পর্শে সঞ্জীবিত। আপনার নিকট আমরা এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, গর্বসমুন্নত মানবহৃদয় ক্রূরতম অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করেও তাকে পরাভূত করতে পারে।]

হার্ডি তাঁর দীর্ঘজীবনের প্রায় সবটাই কাটান একটি বিশেষ অঞ্চলে—যেটি তাঁর নিজের জেলা বা কাউন্টি ডরসেটশায়ার ও তার পার্শ্ববর্তী মুখ্যতঃ কৃষি-প্রধান অ-নাগরিক অঞ্চল। প্রায় দেড়শো মাইল দৈর্ঘ্যের ও আশি মাইল প্রস্থের এই বিস্তৃত অঞ্চলটিতে সম্পূর্ণ ডরসেটশায়ার ছাড়া আরও পাঁচটি কাউন্টির অংশবিশেষও পড়ে—যেমন, উইল্টশায়ার, সমারসেটশায়ার, ডেভনশায়ার হ্যাম্পশায়ার ও অক্সফোর্ডশায়ার। হার্ডিরা বহু প্রজন্মকাল ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা। এখানকার মাটি, মানুষ ও অতীতাশ্রয়ী জীবন—যার মুখচ্ছবি বহু শতাব্দীকাল









কাল্পনিক নাম যেমন: এক্সনবেরী, মেলচেস্টার, চক নিউটন, ক্রাইস্ট মিনস্টার

প্রকৃত নাম যেমন: ব্রিস্টল, বাথ, সাদাম্পটন, পোর্টসমাউথ

টমাস হার্ডির ওয়েসেক্স

ধরে ছিল অপরিবর্তিত—হার্ডির মর্মমূলে অনুস্যূত হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম ইংলণ্ডের এই সমুদয় অঞ্চলটির তিনি নাম দিয়েছিলেন "ওয়েসেক্স" (Wessex)। এ নামটি তিনি ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাস থেকে গ্রহণ করেন। প্রাচীন ইংলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে 'ওয়েসেক্স' নামে যে বিস্তৃত রাজ্য একদা স্থাপিত ছিল, প্রাতঃস্মরণীয় রাজা অ্যালফ্রেড যেখানে নবম শতাব্দীতে সম্রাট ছিলেন, তার পরিধি ও আয়তন অনেকটা এইরূপই ছিল। অন্ততঃ ইতিহাসের সাক্ষ্য তাই বলে।

এ অঞ্চলটির জীবনধারায় যন্ত্রসভ্যতার নখরাঘাত ঘটেনি তখনো। বড় শহর বলতে কিছুই নেই। কয়েকটি আধঘুমন্ত মফঃস্বল শহর—যার মধ্যে ডরচেষ্টার অন্যতম। ডরসেটশায়ারের জেলাশহর এই ডরচেষ্টার। এই সমস্ত অঞ্চলটি তাঁর আপনজনের মুখের মতো প্রিয় ছিল বলেই হার্ডি এর প্রতিটি গ্রাম, বন, পথ, ঘাট, নদী, উপত্যকা, পাহাড়, পর্বত, প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্র সব আপন হস্তরেখার মতই চিনতেন। এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানই ছিল তাঁর একমাত্র ব্যসন ও নেশা। 'ওয়েসেক্স' নামটি শুধু প্রাচীন নয়, ইতিহাস আশ্রিত। প্রাচীন ইতিহাসের বাইরে তার পরিচিতি ও ব্যবহার ছিল না। কিন্তু হার্ডি যেহেতু একটি সমগ্র অঞ্চলের জীবন তাঁর উপন্যাসের সামগ্রী করতে মনস্থ করলেন—যে অঞ্চলটি ইতিহাসের লালনপোষণে সাযুজ্য, সারূপ্য ও একপরিবারভুক্ত সাদৃশ্য অর্জন করেছিল—সেইহেতু তাঁকে ইতিহাসেরই দ্বারস্থ হতে হল ঐ প্রান্তটিকে ঐ প্রাচীন অভিধায় চিহ্নিত করতে। তিনি বোঝাতে চাইলেন, তিনি একটি অখণ্ড অঞ্চলের মানুষদের জীবনকথা বলছেন, যার উপভাষিক বৈশিষ্ট্য এবং জীবনচর্য্যা ও অর্থনীতির চেহারায় গোত্রসাদৃশ্য লক্ষণীয়। এবং পাছে গ্রাম, শহর, পাহাড়, বন, প্রান্তরের নামগুলি যথাযথ ব্যবহার করলে পাঠকরা সহজেই কোনটা কোন কাউন্টির এলাকাভুক্ত তা চিনে ফেলে এবং খণ্ডিত করে দেখে, সেইজন্য হার্ডি তাঁর উপন্যাসে এদের নাম অল্পাধিক বদলে দিলেন, যেমন ডরচেষ্টার এর নাম দিলেন ক্যাষ্টারব্রিজ, এগারডন হিলএর নাম নরকুম্ব, পিড্‌ল্‌টাউনের নাম ওয়েদারবেরী, শেফটস্‌বেরির নাম স্যাষ্টন, সলস্‌বেরির নাম মেলচেষ্টার, অক্সফোর্ডের নাম ক্রাইষ্টমিনষ্টার, ওয়েমাউথ-এর নাম বাডমাউথ, বুর্ণমাউথ এর নাম স্যাণ্ডবুর্ণ ইত্যাদি। (তবে তিনি কয়েকটি বড় শহরের নাম অপরিবর্ত্তিত রাখেন: যেমন ব্রিষ্টল, বাথ এবং সাম্‌থাম্পটন।) যাঁরা চক্ষুষ্মান পাঠক তাঁরা হয়তো এইসব ছদ্মনামের আড়ালে

আসল নামের হদিশ ঠিকই পাবেন, কিন্তু লেখক যে তাদের কাউন্টিবিভক্ত বর্তমান খণ্ডিত রূপটিকে অস্বীকার করতে চান, তাঁর যে অভিপ্রায় এদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সমরূপতাকে চিহ্নিত করা, সে কথাও তাঁদের মনে হবে। হার্ডি তাই চেয়েছিলেন। তিনি এই আঞ্চলিক নাম 'ওয়েসেক্স' প্রথম ব্যবহার করেন তার "ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড" উপন্যাসে। পরবর্তী সব উপন্যাসে ও কবিতায় তিনি এই ছদ্মনামাবলিই ব্যবহার করেছেন।

আঞ্চলিক উপন্যাস বলে' এক শ্রেণীর উপন্যাসকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। একটি বিশেষ অঞ্চলকে পৃষ্ঠপটরূপে অবলম্বন করা, এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষণীতে জীবনের আলেখ্য রূপায়ণের প্রয়াস ও প্রযত্ন এজাতীয় উপন্যাসের বিশেষ লক্ষণ। ওয়াল্টার স্কট তার 'ওয়েভার্লি' নামধেয় উপন্যাসরাজির অধিকাংশেই স্কটল্যাণ্ডের নিম্নাঞ্চলকেই পৃষ্ঠপটরূপে ব্যবহার করেছেন। আমাদের একালীন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকদ্বয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে নদীয়া-যশোর অঞ্চল ও বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চল অবলম্বন করে তাদের অধিকাংশ কাহিনী রচনা করেছেন। কিন্তু এরা কেউ স্থানিক নাম পরিবর্তনের তেমন কোনো প্রয়াস করেননি তাঁদের উপন্যাসে। হার্ডি এদিক দিয়ে অনন্য। 'ওয়েসেক্স' অঞ্চলের মাটি মানুষ ও ইতিহাসের প্রতি দৃঢ়ানুরক্তিই এর যেমন একটি কারণ, তেমনি হার্ডির মানসচরিত্রে অতীতের প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠাও এর মধ্যে উপলক্ষিত। এই অঞ্চলের মধ্যে তিনি স্তব্ধ অতীতকে যেন প্রত্যক্ষ করতেন: কতো শতাব্দী যেখানে ধীরগতিতে, লোকালয় আশ্রিত স্রোতস্বিনীর মতো, মানুষের জীবনের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে, ভাষার একটি নুড়িও স্থানভ্রষ্ট করেনি, উচ্চারণের একটি টান একটি স্বরও বিপর্যস্ত করেনি, কত যুগের লোকগাথা, ব্যালাড, প্রবাদ প্রবচন, অলৌকিক কাহিনী, অন্ধ সংস্কার, উৎসব, ও লোকাচারের স্বরূপ অবিকৃত রেখে দিয়েছে জীবনের আদল যেখানে প্রায় চিরস্থির, পরিবর্তনের স্রোত যেখানে অতি মৃদুসঞ্চারী। দুহাজার বছরের পুরানো জীবনধারার সাক্ষ্যও সেখানে এখনো সগৌরবে বিরাজমান—প্রাচীন কেল্টিক ড্রুইদদের পূজা প্রাঙ্গণ · ষ্টোনহেঞ্জ। রোমান অধিকারের অজস্র নিদর্শন—রোমান রাজপথ, রোমান রঙ্গশালার ভগ্নাবশেষ, রোমানদের নির্মিত দুর্গ প্রাকার-পরিখার ভগ্নস্তূপ—তাও সেখানে সর্বত্র দৃষ্টি গোচর। আরও পুরাকালের, প্রস্তরযুগের, অস্ত্রশস্ত্রও সেখানে মাটির উপরে নীচে যত্রতত্র ছড়ানো দেখা যাবে। প্রাচীন

কেল্ট ও স্যাক্সনদের সমাধিস্থল এযুগের চার্চইয়ার্ডের সমান্তরেই সহাবস্থান করছে। এবং সেখানে মানুষের জীবনধারায়, সংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্যে কতো যে প্রাচীন স্তরের অবশেষ এখনো লগ্ন হয়ে আছে, প্রাক্‌খৃষ্টীয় কতো ভয়, কতো মারণ ও অভিচারতন্ত্র মানুষের মনের অন্ধকারে এখনো সেখানে স্বচ্ছন্দ-লালিত,—তাদের জীবনদৃষ্টির যেন কোনো গভীর ও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি এই সুদীর্ঘ কালপরিক্রমায়।

এই সীমাবদ্ধ ভূভাগকেই তিনি কেন তাঁর উপন্যাসের মুখ্য পটভূমিরূপে নির্বাচন করলেন, আরও বিস্তৃত ও বিচিত্র ভৌগোলিক সংস্থান কেন পরিহার করলেন, সে-প্রশ্নের উত্তর হার্ডি নিজেই দিয়েছেন তাঁর সমুদয় উপন্যাসের 'ওয়েসেক্স' সংস্করণের (১৯১২) সাধারণ মুখবন্ধে। তিনি সেখানে বলেছেন: পটভূমি বিস্তৃত হলেই যে তা মানবচরিত্রের সত্যতর রূপায়ণের পক্ষে অনুকূল হয়—তা যথার্থ নয়। তিনি স্বেচ্ছায় পটভূমিকে সীমিত করেছেন। কারণ, "I considered that our magnificent heritage from the Greeks in dramatic literature found sufficient room for a large proportion of its action in an extent of their country not much larger than the half-dozen counties here reunited under the old name of Wessex, that the domestic emotions have throbbed in Wessex nooks with as much intensity as in the palaces of Europe, and that, anyhow, there was quite enough human nature in Wessex for one man's literary purpose.

[আমি ভেবে দেখেছি যে আমাদের নাট্যসাহিত্যে গ্রীকদের যে গৌরবময় উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি, তার আখ্যানবস্তুর অধিকাংশই তাদের দেশের যে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে স্ফূর্তি পেয়েছে, তা এই আধডজন কাউন্টির সমবায়ে গঠিত পুরাতন ওয়েসেক্স নামধেয় অঞ্চলের চেয়ে বিস্তৃততর নয়। এবং এই ওয়েসেক্সের গৃহকোণে গার্হস্থ্য আবেগের স্পন্দন-তীব্রতা ইওরোপের কোনো রাজপ্রাসাদের অপেক্ষা ন্যূন নয়। এবং যেভাবেই হোক, একজন লেখকের সাহিত্যকর্মের জন্য ওয়েসেক্সে মানবচরিত্রের প্রাচুর্য্যই ছিল।]

প্রথম যৌবনের সেই শিক্ষানবিশ স্থপতি অসাধারণ জ্ঞানতৃষ্ণায় গ্রীক নাট্য-সাহিত্য পাঠ করেছিলেন। সেই তীব্র অভিজ্ঞতা আর কখনো ম্লান হয়নি।

সঙ্কীর্ণ দেশকালের সীমায় কী মর্মন্তুদ বেদনার আলেখ্য রচনা সম্ভব তা তিনি সেখানে দেখেছেন। 'ওয়েসেক্স' কাহিনীগুলিতে অনুরূপ সীমিত দেশকালের আয়তনে অনুরূপ সুতীব্র ট্র্যাজিক রসসৃষ্টির প্রয়াসে তাই তিনি উদ্বুদ্ধ হন।

অবশ্য তাঁর মনের গঠন ও মানস পরিমণ্ডল ট্র্যাজেডিরই অনুকূল ছিল। বহু সহস্র বৎসরের ধ্বংস-চিহ্ন ছড়ানো ওয়েসেক্সের রঙ্গমঞ্চে তিনি মানবজীবনের চিরন্তন ব্যর্থ নাটকের কেবলই পুনরাবৃত্তি দেখতে পেয়েছেন। আবার ডারুইনের চোখ দিয়ে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে তাকিয়ে দেখেছেন লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী নানাপ্রজাতির উত্থান আর বিলয়। অতি নির্মম জীবননাট্যলীলা। মহাবিশ্বে দেখেছেন লক্ষ্য কোটি তারকা-নীহারিকার সংখ্যাতীত আলোকবর্ষের দূরত্বে অচিন্তনীয় বেগে দুর্বোধ্য ধাবনশীলতা। সেই প্রজ্জ্বলন্ত ক্ষ্যাপামির উৎসার থেকে ছিটকে পড়া একটি অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য বর্তুল এই পৃথিবী—মানব-সন্ততির বাসস্থল। মানুষের সুখ দুঃখের প্রতি এই বিশ্বসৃষ্টির কোনোখানে কি একবিন্দু মমতা থাকা সম্ভব? কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে নিবদ্ধদৃষ্টি বিজ্ঞান বলে যে, না সে আশা করা মূঢ়তা। ধর্ম আশ্বাস দেয়, দর্শন কিছু একটা আভাষ দেবার চেষ্টা করে—মানুষের সুখ দুঃখ অর্থহীন নয়, একটা পরম অর্থের সামিল: কিন্তু কোনো প্রমাণ দিতে পারে না।

ডারুইন, স্পেন্সার, হাক্সলীর ভাবচিন্তায় দীক্ষিত হার্ডি মানববিশ্বের দিকে বিষণ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। দার্শনিক শোপেনহাওয়ার তাঁর চোখের সামনে উন্মোচিত করেন মানবপ্রকৃতির মধ্যেই দুঃখের মূল কোথায় নিহিত। এক অন্ধ প্রকৃতি নরনারীর প্রণয়-কামনার মধ্যে দিয়ে দুঃখের বীজ বপন করে চলেছে। নারী, প্রকৃতির হাতের অবোধ ক্রীড়নক, সে অস্থির, চঞ্চল। সে কেবলই প্রলুব্ধ করে। আবার দুঃখের ফাঁদে নিজেও পড়ে, পুরুষকেও জড়ায়। সংসারে তাই দুঃখের নিবৃত্তি নাই।

নানা পঠন চিন্তন ও নানা অভিজ্ঞতার পথে হার্ডি যে ট্র্যাজিক জীবন-দর্শনে পৌঁছান, তা গ্রীক নাট্যকারদের দৃষ্টি অপেক্ষাও নিকষ কালো। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এক অন্ধ ইচ্ছাশক্তি কাজ করছে, তার কোনো ন্যায় অন্যায় বোধ নেই। তার কাজের ধারাই হলো 'cross casualty' বা অন্ধ নির্বোধ আকস্মিকতা। সমস্ত সৃষ্টিতে এই chance বা আপতিক ঘটনার যদৃচ্ছ সমাহার যেন তাণ্ডবের উন্মত্ত পদপাতে মানুষের আশা ভরসা সুখ ভালবাসার সযত্নরচিত স্বপ্নগুলি কেবলি চূর্ণ বিচূর্ণ করে চলেছে। মাঝে মাঝে হার্ডির এও

মনে হয়েছে যে, এই শক্তি সম্পূর্ণ অচেতন নয়—মানুষের সুখের খেলাঘর ভাঙতেই যেন তার নিষ্ঠুর আনন্দ, নির্মম পরিহাসের সুখ। 'টেস অফ দি ডারবারভিল্‌স্‌' উপন্যাসের সমাপ্তিতে এসে হার্ডি আখ্যানকারের নৈর্ব্যক্তিকতা বর্জন করে তীব্রনিখাদে এইরূপ খেদোক্তিই প্রকাশ করেন। The President of the Immortals has ended his sport with Tess—সৃষ্টির অধিকর্তা টেস্‌কে নিয়ে তাঁর নিষ্ঠুর কৌতুকক্রীড়া সাঙ্গ করলেন। এই ট্র্যাজিক চেতনা হার্ডি যে কত অল্প বয়সেই অর্জন করেছিলেন তা তাঁর প্রথম দিককার কবিতাতেই (১৮৬৬-৬৭তে লেখা)—যা পরে Wessex Poems নামে ১৮৯৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল—চোখে পড়ে। যেমন একটি কবিতা Hap। তাতে তিনি বলছেন—

Cross casualty obstructs the sun and rain.
And dicing Time for gladness casts a moan···
Those purblind Doomsters had as really strown
Blisses about my pilgrimage as pain.

—অন্ধ নিয়তি পাশা খেলছে। তাই যেমন খুশী মানুষের চলার পথে কখনো সুখ কখনো দুঃখ দিচ্ছে ছড়িয়ে।

সফোক্লিসের একটি কোরাসে এই আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে: সেই সুখী, যার জীবন দৈর্ঘ্যে স্বল্পতম; তবে সবচেয়ে ভালো একেবারে না জন্মানোটাই। হার্ডির শেষের দিকের উপন্যাসে—যেখানে তাঁর তিক্ততা, ক্ষোভ এবং জীবন ব্যাপাররূপ শোচনীয় প্রহসনের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রচণ্ড উত্তাপে ভাস্বর—এই ভাবটির বারংবার পুনরুচ্চারণ শুনতে পাই। এবং 'জুড দি অবস্কিওর'-এর শেষ পরিচ্ছেদে মৃত্যু-পথযাত্রী জুডের মুখে বাইবেল বর্ণিত Job-এর আর্তনাদ নিঃশ্বসিত হয়েছে:

Let the day perish wherin I was born and the night in which it was said, there is a man child conceived···Why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly?···[সেই দিনটি নিশ্চিহ্ন হোক যেদিন আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, এবং সেই রাত্রিটি যেদিন উচ্চারিত হয়েছিল, একটি শিশুপুত্র জন্মলাভ করেছে।···কেন আমি গর্ভেই বিনষ্ট হইনি! কেন আমি ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হই নি?]

এমন কি হার্ডির যে-উপন্যাস কয়টিতে ট্র্যাজিক অন্ধকার অপেক্ষাকৃত কম

মসীকৃষ্ণ সেখানেও অদৃষ্টের বিদ্রূপ অট্টহাস্য বিদ্রূপ ঘটনাসম্পাতের মধ্যে দিয়ে বারংবার ধ্বনিত হয়। যেমন 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড'-এ সাধুবৃত্ত ফার্মার ওকের জীবনে ব্যর্থপ্রণয়ের আঘাত নেমে আসার পরেই তার চরম বৈষয়িক সর্বনাশও ঘটলো ত্বরিৎগতিতে। গীর্জার নাম ভুল করেছিল বলে ফ্যানির আর বিয়েই হলো না, চরম দুঃখের করাল গহ্বরে কানীন সন্তানের জন্মদান কালে, তার মৃত্যু ঘটলো ভিখারীদের আশ্রয়ে। কিন্তু মৃত্যুর পরই তার যেন সৌভাগ্যের চাকা ঘুরলো। তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাথশেবার মর্মস্থল দগ্ধ করে' সে প্রমাণ করলো যে, সেই ছিল সার্জেন্ট ট্রয়ের অধিকতর প্রণয়ভাগিনী। ট্রয়ের হাতে লাঞ্ছিতা নিপীড়িতা বাথশেবা শোকে লজ্জায় আত্মধিক্কারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গৃহত্যাগ করে' আত্মগোপন করলো। আবার ট্রয়ের ভাগ্যেও অদৃষ্টের বিদ্রূপ বর্ষিত হলো একটু পরেই। ফ্যানির সমাধির উপরে অনুতাপের আবেগে সে যে মর্মর আধার স্থাপন করেছিল আর নানা ফুলের চারা বুনে তাকে সুন্দর শোভন করেছিল, সেই সমাধির উপরে দৈবের নির্মম পরিহাসের মতো, সারারাত ধরে প্রবল প্রপাতধারায় বর্ষিত হলো আকাশভাঙ্গা বৃষ্টি, গীর্জার ছাদের জলনির্গম পথ বেয়ে—যে পথের সম্মুখভাগে ছিল একটি ব্যঙ্গবীভৎস দানবের মুখাকৃতি!

এমনি আগাগোড়া সব ক'টি মুখ্য চরিত্রের ক্ষেত্রেই নিয়তির এই নিষ্ঠুর পরিহাসরসিকতা। এই আলো, এই অন্ধকার। যে মুহূর্তে আশার আলোক-বর্ত্তিকা উজ্জ্বলতম, রঙমশালের মতো অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় বিচ্ছুরিত, ঠিক তার পরেই অদৃষ্টের উলটো পাশার দান পড়ে; নির্ভুল কৌশলে সবনাশের অন্ধকার গহ্বর মুখ ব্যাদান করে।

তবু কোনো মতে শেষ রক্ষা হয় এই অপেক্ষাকৃত স্বল্পান্ধকার কাহিনীগুলিতে। কোনো মতে ভাঙ্গা জীবনটাকে টেনে নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে আবার সুখের একটা নীড় রচনার প্রয়াস। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক মৃত্যু, অনেক শোক, অনেক হতাশা, অনেক নিষ্ঠুর বঞ্চনার পৌনঃপুনিকতা, যারা বেঁচে রইলো, টিঁকে রইলো, তাদের মনের সব রঙ রস নিঃশেষে মুছে নিয়েছে। তারা আর জীবনকে ভোগ করতে পারবে না; আবেগরিক্ত প্রজ্ঞায় জীবনকে গ্রহণ করবে ও সহ্য করবে মাত্র।

তবু 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউডে' তিক্ততা ন্যূনতম, মাধুর্যের আয়োজন সর্বাধিক। অদৃষ্টের পরিহাসে বোল্ডউড, ট্রয় এবং ফ্যানির জীবন বিনষ্ট হয় সত্য, তবু ফার্মার ওকের পৌরুষ, মানবিকতা ও প্রতিদান-অনপেক্ষ অনুরাগের মহত্ব,

আত্যন্ত অবিচল মহিমায় আমাদের মুগ্ধ করে। আর বাথশেবা এভারডীনের চরিত্রও—যে মস্তিষ্কে স্থিরবুদ্ধি রাণী প্রথম এলিজাবেথ ও হৃদয়ের অস্থিরতায় মেরী কুইন অফ স্কটস্ তুল্য—তার ঔজ্জ্বল্যে ও অন্ধকারে, বুদ্ধি ও হৃদয়াবেগের প্রাখর্যে, শক্তি ও দুর্বলতার সহাবস্থানে, শেষ পর্যন্ত আমাদের হৃদয়কে অধিকার করে রাখে। এবং এই উপন্যাসেই ওয়েসেক্সের নিসর্গ প্রকৃতির সৌন্দর্য ও আনন্দিত মুখশ্রী যেরূপ অনবগুণ্ঠিত ও বিশদ এবং বর্ণসম্পাতে উজ্জ্বল, অন্যত্র তেমন নয়। ঋতুর পর্যায়ে পর্যায়ে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের সমচ্ছন্দে কর্মের পর্যায় ভেদ—হে-মেকিং, বী-হাইভিং, হার্ভেষ্টিং—এবং মেষকুলের গাহন স্নান, লোম-কর্তন প্রভৃতি—চিরন্তন পল্লী জীবনের রূপ রস গন্ধ এ কাহিনীর প্রতিটি দৃশ্যে ও ঘটনার বয়নে প্রবেশ করে' এ উপন্যাসটির প্রতিটি তন্তু অনুরঞ্জিত করেছে। ভূমিশ্রীর এই অকৃপণ লাবণ্য, পল্লীশ্রীর এই উদার মাধুর্য অন্যত্র এমন সুলভ নয়।

অবশ্য হার্ডির উপন্যাসে প্রকৃতির স্থান সর্বত্রই সুপ্রসর। চিরন্তনী প্রকৃতির মুখে চেয়ে হার্ডি সান্ত্বনা অন্বেষণ করেছেন। ক্ষতবিক্ষত মানবজীবনের পাশে প্রকৃতির শান্ত অক্ষুব্ধ মুখচ্ছবি, প্রকৃতির জীবনছন্দের অচঞ্চল ধ্রুব আবর্ত্তন, ব্যাপ্তি বিস্তার ও অসীমতা, এবং অতল গভীর রহস্যময়তা, যেন শুশ্রূষার স্নিগ্ধ করস্পর্শ বুলায়। তবু প্রকৃতির অন্য রূপও যে হার্ডি দেখেন নি, তা নয়। উন্মাদিনী প্রকৃতির রণচণ্ডী রূপ, ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব যা নিয়তির মতোই নির্মম এবং কালদণ্ডের মতোই নেমে এসে যা সহসা লণ্ডভণ্ড করে দেয় মানুষের স্বপ্ন, সাধ, আকাঙ্ক্ষা—এ রকম রুদ্র প্রকৃতির ছবিও হার্ডির অনেক উপন্যাসেই মেলে। "ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড"-এ দুটি ঝড়বৃষ্টির রাত্রির দৃশ্য সহজেই মনে পড়বে। একটিতে বাথশেবার বিপন্ন শস্যস্তূপ একক কর্তব্যনিষ্ঠায় ওক রক্ষা করতে ব্যস্ত; এবং স্বামীর অপদার্থতায় লজ্জা ও অনুশোচনায় ম্লান বাথশেবা সেই বিদ্যুৎবিদীর্ণ আকাশের তলে শস্যস্তূপের উপর ওকের পাশে বসে সামান্য দু চারটি কথায় নিজের গোপন হৃদয়ের কিছুটা উন্মুক্ত করছে। অপরটিতে আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি নির্মম পরিহাসের মতো ট্রয়ের রোমান্টিক অনুশোচনার নিদর্শন ফ্যানির মর্মর সমাধিটি বিপর্যস্ত করছে। 'দি রিটার্ণ অফ দি নেটিভ' উপন্যাসের সঙ্কট সন্ধিক্ষণে, ঝড় জলের উন্মত্ত আক্রোশে, কীভাবে এক রাত্রে ইউষ্টাসিয়া ও ওয়াইল্ডইভের সলিল সমাধি ঘটায় এবং ক্লীম ইয়োব্রাইটকেও মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়, সে দৃশ্যও এজাতীয়।

হার্ডির উপন্যাসে তাই প্রকৃতি কেবল মধুর রূপে নয়, নানা রূপেই

উপস্থিত। প্রকৃতিকে নিয়তির হাতের মারণ যন্ত্রের বেশেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই আমরা, যেমন পাই তার উদার প্রসন্ন মুখচ্ছবি, মানুষের সুখ দুঃখের ঘনিষ্ঠ সংযোগে। আবার, 'দি রিটার্ণ অফ দি নেটিভ' উপন্যাসে, বহু সহস্র বৎসরের পুঞ্জীভূত অতীতের নিষ্ঠুর নিরাসক্তির প্রতীক, 'এগডন হীথ' রূপেও তাকে দেখি। আবার কখনো মহাবিশ্বের অনন্ত নক্ষত্রলোকের রহস্যের আভাসে প্রকৃতির অমানবিক প্রহেলিকা রূপও দেখতে পাই। তবে যে রূপেই সে হাজির হোক হার্ডির উপন্যাসে প্রকৃতি অত্যন্ত সজীব সত্তা। প্রায় মানুষের মতোই। তার উষ্ণ হৃৎস্পন্দন কিংবা ক্রুদ্ধ গর্জন দুইই তার মানব প্রতিবেশীর অন্তঃকর্ণে অনায়াস শ্রুতিগোচর।

হার্ডির কাহিনী জগতে মানুষের স্থান কি? সে কি শুধুই নিয়তির হাতের ক্রীড়নক, অদৃষ্টের বা বিশ্ববিধাতার কৌতুক-কন্দুক, যদৃচ্ছ উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত বিচূর্ণিত? ঠিক তা নয়। মানুষ যদি শুধুই অপ্রতিরোধী, নিশ্চেষ্ট পুতুল সদৃশ হতো, তাহলে সে নিশ্চয়ই ট্র্যাজেডির পাত্র হতো না। হার্ডির উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অদৃষ্টের বিরূপতা উপেক্ষা করে' আকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দমনীয় তাড়নায় তারা সুখ ও সার্থকতা অন্বেষী। বারংবার প্রতিহত হলেও তারা অপরাজয়ী—তারা চূর্ণ হতে পারে, কিন্তু পরাভব স্বীকার করে না। এবং এখানেই তাদের গৌরব। হার্ডি মানুষকে দুর্বল করে চিত্রিত করেন নি। অদৃষ্টের বীভৎস কৌতুকের সে শিকার হতে পারে, বারংবার বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, প্রহৃত, তাড়িত, বিমর্দিত হতে পারে, কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত সে প্রতিবাদ করে যায়: এ অন্যায়, এ অবিচার, এ আমি স্বীকার করি না; আমি মৃত্যুর চেয়ে, অন্যায় অদৃষ্টের চেয়ে বড়। অন্ততঃ আমরা তাদের চরিত্রের মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তির অনমনীয় দৃঢ়তা দেখতে পাই, তার ব্যঞ্জনাই তাই। এবং শুধু কি ইচ্ছা শক্তি? তাদের চরিত্রে এমন কিছু অসাধারণ উপাদান দেখি, রূপ গুণ ব্যক্তিত্বের এমন কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের সেখানে প্রকাশ ঘটে, যে আমরা মানবিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে অনুভব করি যে, ভাগ্যের হাতে তাদের নিগ্রহে তাঁদের অগৌরব নেই। অগৌরব যদি থাকে, তা মানবিক মূল্যবোধের অর্থ অনুধাবনে অক্ষম, দায়িত্বহীন, অন্ধ, মানবেতর সেই শক্তির, যাকে আমরা ভাগ্য বা নিয়তি বা দৈব বলে অভিহিত করি।

সমালোচকপ্রবর Bonamy Dobrée বলেছেন যে, শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির অ্যারিষ্টটল-প্রোক্ত দুটি মুখ্য উপাদান, terror ও pity—আতঙ্ক এবং করুণা

—হার্ডির শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিরও ট্র্যাজিক উপাদান। যদিও হার্ডির নায়ক নায়িকারা কেউই রাজন্যবর্গীয় নয়, ইতিহাসের নায়ক বা পুরাণ পুরুষও নয়, সাধারণ গ্রামীন মধ্যবিত্ত চাষী (yeomen) শ্রেণীর নরনারী—কিংবা দরিদ্রতর স্তরের মানুষ—তবু এদের জীবননাট্যের দৃশ্যে—এই টেস ও জুড, বোল্ডউড ও বাথশেবা, জাইল্‌স্‌ উইনটারবোর্ন ও গ্রেস মেলবেরি, এই আপাত সাধারণদের ক্ষেত্রেও—এ্যাগামেমনন ও ঈডিপাসের ক্ষেত্রে যেমন—আতঙ্ক ও করুণায় আমাদের মন অভিভূত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যেই আমরা আমাদের আপন নিয়তিকে, অদৃষ্টের নাগপাশে ধৃত ও বিনষ্ট মানুষের ভয়ঙ্কর জীবনালেখ্য, দর্শন করি এবং আতঙ্কে মুহ্যমান হই। এবং এদের চরিত্রে এমন কিছু দুর্লভ মহিমাও প্রত্যক্ষ করি, যার ফলে এদের বিনষ্টিতে আমরা গভীর করুণায় আবিষ্টও হই।

Dobrée বলছেন, "Without this sentiment of something fine there can be no tragedy, that is, tragedy···implies dignity of man. It is always fineness which brings about the crash of Hardy's heroes and heroines as it is fineness which impels Oedipus, Orestes, Hamlet or Othello

[এই যে দুর্লভ সুকুমার কিছু বিনষ্ট হচ্ছে, এই চেতনা ব্যতিরেকে ট্র্যাজেডির উপপত্তি সম্ভব নয়। অর্থাৎ ট্র্যাজেডির মধ্যেই মানব মহিমার ব্যঞ্জনা নিহিত।···হার্ডির নায়ক নায়িকাদের সর্বনাশের মূলে সর্বত্র এই দুর্লভ সুকুমার উপাদানটি উপস্থিত। অনুরূপ দুর্লভ সুকুমারত্বই ঈডিপাস, অরেস্টেস, হ্যামলেট ও ওথেলোর চরিত্রেরও প্রেরক শক্তি।]

একথা বললে ভুল হবে যে, হার্ডির উপন্যাসে কার্যকারণ শৃঙ্খলের স্থান নেই: সব ঘটনাই আপতিক। অনেক স্থলে নিতান্ত দৈবের চক্রান্তে, কোনোরূপ প্রস্তুতি ও সম্ভাবনা না থাকলেও ঘটনা ঘটে সত্য, তবু আবার অনেক ক্ষেত্রে নায়ক নায়িকারা তাদের বুদ্ধি বিচার বিবেচনার দোষেও নিজের অথবা অপরের দুঃখ ডেকে আনে। একটা কথা আছে: Character is destiny, অর্থাৎ চরিত্রই ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডিগুলির অনুষঙ্গে অনেকে এই আপ্তবাক্যটি উচ্চারণ করেন। যেন হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, লীয়ারের ট্র্যাজেডির মূল তাঁদের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। কথাটি আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলিতেও দৈবের

হস্তক্ষেপের বা দৈবাধীন পরিস্থিতির যথেষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। বস্তুতঃ শুধুমাত্র চরিত্রই ট্র্যাজেডির কারণ হলে তা শোচনীয় মাত্র হতো, আমাদের এমন করে আতঙ্ক ও করুণায় অভিভূত করতো না।

হার্ডির উপন্যাসেও অদৃষ্টই একমাত্র নিয়ামক নয়, চরিত্রও অংশতঃ ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী। "ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড"-এ বাথশেবার চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য—তার রূপের অভিমান এবং রূপের প্রশংসার প্রতি দুর্বলতা এবং তৎসহ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস—তার জীবনের ট্র্যাজিক পরিণামের জন্য কম দায়ী নয়। তেমনি বোল্ডউডের স্বভাবের ভারসাম্যহীনতা, উদ্দাম প্রক্ষোভের একান্ত বশীভূত হবার দুর্বলতা, তার জীবনের ভয়ঙ্কর পরিণতির অন্যতম কারণ। তবে ওকের আর্থিক সর্বনাশ নিতান্ত দৈব ঘটনারই ফল। ফ্যানির গীর্জার নাম ভুল করাও প্রায় তদ্রূপ। অবশ্য শেষের দিকের উপন্যাসগুলিতে প্রতিকূল দৈব-যোগের বড়বেশী সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত শোকাবহ হলেও সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে না। টেস্ যেভাবে অ্যালেক ডারবার-ভিলের লালসার শিকার হলো এবং ফলে তার বাকী জীবনটাই ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে গেল—এটাও, একদিকে যেমন দৈবের চক্রান্ত বলা চলে, তেমনি অপরদিকে, টেসের বাপ-মার নির্বুদ্ধিতা ও বড়লোকের দুশ্চরিত্র ছেলের পারস্পরিক সমবায়ের যোগফলও বলা যায়। টেস্‌রা যে বড়বংশ—প্রাচীন ডারবারভিল্ বংশ—এ পুরাতাত্ত্বিক সত্যটি তাঁদের গীর্জার পাদ্রী সাহেব টেসের বাবাকে না বললে, টেসের জীবনের ও তাদের পারিবারিক জীবনের অনেক দুর্ঘটনাই হয়তো ঘটতো না। কিন্তু পুরাতত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসু পাদ্রী সাহেবের পক্ষে তাঁর এই আবিষ্কারটি জানানোও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু টেসের বাবার চরিত্র ঐ রকমটি হওয়ায় এই বংশগৌরবের অভিমানটী সর্বনাশের কারণ হলো। পর পর যা ঘটলো তা প্রায় সবই চারিত্রমূল। একটু আধটু দৈবের ছোঁয়া লেগেছে কিন্তু মানবচরিত্রের টানাপোড়েনের যোগফলও উপেক্ষণীয় নয়। এবং এই কারণেই 'টেস' একটি মহৎ উপন্যাস। অদৃষ্টের নির্মম কৌতুকক্রীড়ার কথা হার্ডি স্বয়ং অত খেদের সঙ্গে বললেও, শিল্পী হার্ডি কিন্তু মানবচরিত্রের ভূমিকা গৌণ করেন নি। দুয়ের মধ্যে তিনি ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করেছেন। 'জুড দি অব্‌স্কিওর' উপন্যাসেও প্রায় তাই। তবে এখানে অদৃষ্টের নির্মমতা ও চারিত্রিক ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে মিলেছে প্রেমহীন বিবাহবন্ধনের নির্মম সামাজিক অনুশাসন।

হার্ডির শিল্প প্রকর্ষের বয়নে কোন্ কোন্ তত্ত্ব ও বর্ণের সমাবেশ ঘটেছে পণ্ডিত এবং রসিক ব্যক্তিরা তা নিয়ে অনেক আলোচনা ও আলোকপাত করেছেন। তার একটি উপাদান যে কাব্যরস সে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। এ কাব্যরসের উৎস হার্ডির কবিকল্পনার বৈভবে। হার্ডি মূলতঃ কবি এবং উপন্যাসে তিনি কখনোই খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি। তাঁর প্রত্যেক কাহিনীর মর্মমূলে রয়েছে কাব্যপ্রেরণা ; সেই কাব্যরসের আবেদনেই তাঁর কল্পনা কাহিনীর অবয়ব নির্মাণে স্ফূর্তি লাভ করেছে। এবং যেখানেই, কাহিনীর যে-দৃশ্যে, কাব্যিক আবেদন বেশী সেখানে তাঁর কল্পনাও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে সেই দৃশ্যকে গভীরতম বেদনা ও ব্যঞ্জনায়, এবং অপরূপ তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে। কাব্যময়তায় এসব দৃশ্য প্রায় প্রতীকধর্মী হয়ে উঠেছে। 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউডে' রোগজীর্ণ অশক্ত মুমূর্ষু ফ্যানি ক্যাষ্টারব্রীজ ওআর্কহাউসের পথে আশ্রয়ের আশায় চলেছে। তার চলার শক্তি নাই। শেষে সেই অন্তহীন অন্ধকার পথে দেখা দিল এক কুকুর। সেই কুকুরকে জড়িয়ে ধরে, কুকুরবাহিত হয়ে সে তার শেষ আশ্রয়ে এসে পৌঁছালো। অমানব জগতের করুণার প্রতীক সেই অজ্ঞাত কুকুর যেন তার হৃদয়ের আর্ত প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে পথে-মরার লজ্জা থেকে তাকে বাঁচালো। সমস্ত দৃশ্যটি যেন আগুনের রেখায় আঁকা। হার্ডির উদ্দীপ্ত কল্পনার উত্তাপ আমরা যেন অনুভব করি এখানে। দৃশ্যটি অপরূপ প্রতীকধর্মিতা লাভ করেছে। এমনি আরেকটি দৃশ্য (ঐ উপন্যাসেই) সেই ঝড়ের দৃশ্য, যেখানে নিবিড় নিশীথ অন্ধকারকে ছিন্ন ভিন্ন করছে বিদ্যুৎ বাহিনী, গাছের মাথা দগ্ধ করে বাজ পড়ছে, আর সেই প্রলয় দুর্য্যোগের মধ্যে দুটি প্রাণী, ওক আর বাথশেবা, শস্যস্তূপের চূড়ায় বসে। কী কল্পনা, কী ব্যঞ্জনা! আবার ঈর্ষার জ্বালায় ছটফট্ করতে করতে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালিনী বাথশেবা ফ্যানির শবাধার খুলে দেখছে, ফ্যানির সঙ্গে তার সদ্যোজাত মৃত সন্তানও সেখানে শায়িত কি না—এই দৃশ্যটিও অনুরূপ। ঈর্ষা ও শুভ বুদ্ধির দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বাথশেবার হৃদয় নীরবে যখন আর্তনাদ করছে এমন সময়ে সেই দৃশ্যে, সেই গভীর রাত্রির নিভৃতে, সেই শবাধারের সম্মুখে আবির্ভাব হলো ট্রয়ের। তারপর সমস্ত পরিস্থিতি সম্যক অনুধাবন করে, প্রচণ্ড অনুতাপে উদভ্রান্ত ট্রয় কর্তৃক মৃত ফ্যানির মুখচুম্বন এবং বাথশেবার ঈর্ষাজর্জ্জর আকুতি : ট্রয় তবে আমাকেও চুম্বন করো, এবং ট্রয়ের ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও বাথশেবাকে নিষ্ঠুরতম অপমানে বিদ্ধকরা এবং বাথশেবার দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই

অন্ধকার রাত্রিতে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া—এ দৃশ্যের পরিকল্পনা ও রূপায়ণে কল্পনার যে শক্তি ও ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত তা মহত্তম কাব্যগুণের অধিকারী। এমনই সব উপন্যাসেই। একটা কথা কিন্তু ভুললে চলবে না যে, কল্পনার রসে উজ্জ্বলতম দৃশ্যগুলিও প্রতিটি রেখায়, প্রতিটি অনুপুঙ্খে বাস্তব। হাডির বাস্তব দৃষ্টি ও তাব কবিকল্পনা একই সঙ্গে কাজ কবে চলেছে। ক্যাষ্টারব্রীজের পথেব অন্ধকাব রূপ ফ্যানিব ক্রমক্ষীয়মান শক্তিব প্রাণান্তিক প্রয়াসের ক্রমিক ছবিগুলিতে—একটি তুলিব টানেও ভুল নেই, সব যথাযথ বাস্তবায়িত, সম্ভাব্যতা ও বিশ্বাস্যতার মাত্রা অনুপুঙ্খেব যথাযথ সমাবেশে সুনিশ্চিত। কবি-কল্পনা ও বাস্তব কল্পনাব এই যুগলবন্দী কাজ হাডির উপন্যাস শিল্পের অন্যতম মহৎ বৈশিষ্ট্য।

হাডির উপন্যাস-জগৎ অন্য যে গুণটিব জন্য বিশেষরূপে চিহ্নিত ও সমৃদ্ধ তা এর হাস্যরস। এ হাস্যবস যাকে wit বলে, সেই বুদ্ধিদীপ্ত আলাপন প্রসূত নয়। সবলপ্রাণ গ্রামীণ মানুষদেব বাগধারায় এব জন্ম, কিন্তু এ কেবল মাত্র বাগভঙ্গি সর্বস্ব নয়। এই মাটিব কাছাকাছি থাকা মানুষগুলি অচেতন ভাবেই স্মরণাতীত কাল-উপচিত এক জাতীয় প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত—যার মূল উপাদান মাটির মতোই সহনশীলতা, জীবনেব কাছে বেশী কিছু প্রত্যাশা না করে' যাই আসুক তাকেই সহজে স্বীকাব করে নেওয়া। এরা কেউ আত্মসচেতন নয়, এরা ব্যক্তিত্বেও বিশেষিত নয়। এরা সমষ্টিগত ভাবেই কথা বলে, কাজ কবে, অবসব বিনোদন করে, উৎসবে আনন্দ করে, পরস্পরকে ধারণ করে থাকে। নায়ক নায়িকা বা কেন্দ্র চবিত্রগুলিব পাশে এরা ছায়ার মণ্ডলীর মতো বিরাজ কবে। তাবা সঙ্গুপ্ত, অস্থিব, কিন্তু এরা অচঞ্চল, নির্বিকার, চিরন্তন। ভূমি-লক্ষ্মীর অঙ্ক-আশ্রিত এই মানব শিশুগুলি চিবসহিষ্ণু পৃথিবীমাতার অচেতন প্রজ্ঞায় সম্পন্ন। এদের অশিক্ষিত ভাষার মধ্যে দিয়ে এই প্রজ্ঞার বিচিত্র প্রকাশ এক আশ্চর্য হাস্যরসের আধার। হাডির এই গ্রাম্য চরিত্রগুলিকে শেকস্‌পীয়রের গ্রাম্য চবিত্রগুলিব সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এদের মাধ্যমে সৃষ্ট হাস্যরসও ঐ শেকস্‌পীয়বীয় হাস্যবসের সমগোত্রীয়।

হার্ডির এই গ্রাম্য চরিত্রগুলিকে গ্রীক নাটকের কোরাস (chorus) এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গ্রীক নাটকে যেমন, নায়ক নায়িকার বেদনা-বিদ্যুৎ-বহ্নি-বলয়িত সর্বনাশা জীবননাট্যেব পরিধিতে, দ্রষ্টা, স্রষ্টা ও ভাষ্যকার রূপে নিয়ত উপস্থিত রয়েছে কোরাস—তেমনি হাডির উপন্যাসেও কেন্দ্রবর্তী চরিত্র-

গুলির বেদনাবিদ্ধ হৃদয়নাট্যের দর্শক ও ভাষ্যকাররূপে দেখতে পাই এই মূর্খ নিরক্ষর গ্রাম্য লোকগুলিকে। তারা কোরাসের মতোই কিছুটা বিবিক্ত, তবে তাদের মতোই তারাও বৃহত্তর সমাজের প্রতিভূ এবং তাদের অস্তিত্বও সমষ্টিগত। এই গ্রামবাসীরা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী এবং সহজ প্রজ্ঞায়, এই কেন্দ্রবর্তী নাট্যলীলা এবং এর পাত্র পাত্রীদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করে চলে, তা গ্রীক নাটকের কোরাসের মতোই তাৎপর্যময়। এবং এই গ্রাম্য কোরাসের পরিপ্রেক্ষণীধৃত হয়ে কেন্দ্রস্থ তীব্রবেগ নাটকটিও উজ্জলতর হয়ে ওঠে এবং বৃহত্তর ব্যঞ্জনা লাভ করে।

হার্ডির উপন্যাসের চরিত্রগুলিও গ্রীক নাটকের পাত্রপাত্রীর মতোই বৃহদায়তন, larger than life ; প্রাত্যহিক জীবনের পরিমাপে তাদের ব্যক্তিত্বের আয়তন যথেষ্ট বড়। ওক, বাথশেবা, বোল্ডউড, টেস, জুড, হেঙ্কার্ড, ইউষ্ট্যাসিয়া—এরা সকলেই অসামান্য, অমিতপ্রাণ। হৃদয়-সম্পদে অথবা ইচ্ছার দুর্দম বেগবত্তায় কিম্বা ব্যক্তিত্বের সাত্ত্বিক সৌষম্যে এরা প্রত্যেকেই অসাধারণ। এদের জীবন নাট্য তথা ট্র্যাজেডি তাই সাধারণ আটপৌরে সুখদুঃখের কাহিনী অপেক্ষা অনেক বেশী তীব্র ও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এরা বড় মাপের বলেই অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রামে এদের তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয় মনে হয় না। এরা অসামান্য বলেই এদের মধ্যে দিয়ে আমরা মানব অদৃষ্টের ভয়ঙ্করতা এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি।

অবশ্য হার্ডি তাঁর পাত্রপাত্রীদের সঙ্কীর্ণ দেশকাল বদ্ধ নাটককে আরও নানা উপায়ে বিশ্বরঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে' তার সুবৃহৎ তাৎপর্য্য ও সুবিপুল বেদনা সর্বমানবলোকে প্রসারিত করেছেন। এ জাতীয় একটি পদ্ধতি হলো, ঘটনা কিম্বা পাত্রপাত্রী সম্পর্কিত বর্ণনার অনুষঙ্গে শিল্পসাহিত্য সভ্যতার দূরবিসর্পী ইতিহাসের কোনো তথ্য বা ইঙ্গিত, কিম্বা মহাবিশ্বব্যাপারের কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের তির্যক উল্লেখ। এর দ্বারা ঐ বর্ণনীয় বিষয় তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করে' বিশ্ব সত্যের প্রেক্ষিতে ফুটে ওঠে। যা ছিল গণ্ডীবদ্ধ ও খণ্ডিত তা মুহূর্তের মধ্যে অনন্ত বিশ্ব ও মানব সমাজের সাথে সাঙ্গীকৃত হয়ে অসীম ব্যঞ্জনা লাভ করে। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ও ব্যাপক, স্থানিক ও বিশ্বজাগতিক, বিশেষিত ও নির্বিশেষ, এই দ্বিবিধ পরিপ্রেক্ষণী ব্যবহার করেছেন হার্ডি তাঁর উপন্যাসে।

হার্ডির যে গদ্যশৈলী বহু নিন্দালাঞ্ছিত, যে তার শ্রী নাই লালিত্য নাই, তার

চলন ভারী, চাল জবরজঙ্গী, দুরূহ কর্কশ শব্দের যোজনায় তা —তাঁর ঐ বিশিষ্ট ভাষাশৈলীর মাধ্যমেও হার্ডি এই বিবিধ পরিপ্রেক্ষণীর প্রতিস্থাপনা সাধিত করেছেন। একান্ত স্থানিক, উপভাষিক শব্দের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতী শব্দের ব্যবহার তাঁর শৈলীর যা অন্যতম লক্ষণ, এই উদ্দেশ্য সাধনেই নিয়োজিত। আশ্চর্য্য নয় যে, হার্ডি তাঁর ষ্টাইলের প্রসাধনে কখনোই আগ্রহী হন নি।

হার্ডির মুখ্য উপন্যাসগুলি বাংলায় অনুবাদের এই উদ্যম অত্যন্ত শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। সকল সুধী ব্যক্তিই একে নিঃসন্দেহে অভিনন্দিত করবেন। হার্ডি কেবল মহৎ ঔপন্যাসিকই নন, তিনি একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি, একটি আত্মিক অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ না করলে আমাদের আধুনিক মানবিকতা অপূর্ণ থাকবে। বাংলাসাহিত্য এখন অনুবাদের গ্রন্থি-বন্ধনে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে উৎসুক হয়েছে। হার্ডি যদি এই অনুবাদ প্রয়াসের মাধ্যমে আমাদের আত্মাব আত্মীয় হয়ে ওঠেন তবে সে হবে বাংলাসাহিত্যের পক্ষে পরম আশীর্বাদ।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল

ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড

ফার্মার ওকের হাসিটা ঠিক প্রথম ভাগের সূর্য্যিমামার মত— হাসলে তার ঠোঁটের দু'প্রান্ত দু'কানের গোড়ায় গিয়ে ঠেকে, আর চোখ দুটো কুঁচকে ছোট্ট একটুখানি হয়ে যায়।

পুরো নাম তার গ্যাব্রিয়েল ওক। সপ্তাহের ছ'টা কাজের দিনে সে একদম ফিট ফাট কর্মব্যস্ত পুরুষ, কিন্তু রবিবারটি এলেই তাকে চিনতে পারা মুস্কিল— ছাতি মাথায়, জমকালো জোব্বায় বন্দী, দীর্ঘসূত্রী রহস্যময় এক ভদ্রলোক। গীর্জাতে গিয়ে, পাদ্রীদের উপদেশামৃত শুনতে শুনতে সে নিরালম্বভাবে হাই তোলে আর ভাবে খাওয়ার সময় কখন হবে। গ্রামের আর পাঁচজনের চোখে তার ভাল-মন্দর কোনও বিশেষত্বই নেই-- নেহাৎই দোষে গুণে গড়া এক কর্মঠ যুবক।

নীচু কেন্টের টুপি মাথায়, আর ডঃ জনসনের মত কোট গায়ে —তার জুতো দু'খানা পেল্লায় সাইজের— পায়ে দিয়ে সারাদিন নদীর চরে দাঁড়িয়ে থাকলেও ড্যাম্প লাগার কোন ভয় নেই। মিষ্টার ওকের ঘড়িটা দেয়ালঘড়ির একটা ছোট সংস্করণ। যন্ত্রটি তার ঠাকুর দাদার থেকেও বয়সে কয়েক বছরের বড়— তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাই তার পছন্দ— আর চলতে আরম্ভ করলে দৌড়ুত একেবারে ঘোড়ার মত। দিনমানে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে আর রাত্তিরে আকাশের তারা দেখে সে তার ঘড়ি মেলাত। হাঁটুর কাছাকাছি এমন একটা পকেটে ঘড়িটা থাকত, যে কূয়ো থেকে জলের বালতি তোলার মত রীতিমত মাজা নীচু করে ঘড়িটা বার করতে হত তাকে।

কিন্তু, এই লোকটিই ঠাণ্ডার আমেজমাখা, রোদ ঝলমল কোনও হেমন্তের প্রভাতে যখন তার খামার-এর ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াত— ভাবুকের

তাকে মনে হত অন্য জগতের মানুষ। তার মুখশ্রীতে যৌবন ছুঁই ছুঁই মনুষ্যত্বের ছাপ, তা'হলেও শৈশবের স্মৃতি সেখান থেকে একেবারে হারিয়ে যায়নি। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, মিলিয়ে তার চেহারায় গৌরব ছিল। একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এমন সাবলীল তার চলাফেরা, যে কখনই তাকে চেহারার থেকে পোষাক সম্পর্কে বেশী সচেতন মনে হত না।

ওককে দেখলে মনে হয়, সে জীবনের এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে, যখন 'ইয়ং' উপসর্গ টি 'ম্যান'এর থেকে আস্তে আস্তে খসে পড়ছে— তার পৌরুষের ঔজ্জ্বল্যে আবেগ এবং বিচার বুদ্ধি স্বতঃই পৃথক হয়ে যাচ্ছে— কিন্তু এখনও এমন বয়স হয়নি যে স্ত্রী-পুত্র বা আপন জনের টানে সেগুলো আবার সংস্কার আকারে মিলিত হতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে ওকের বয়স আঠাশ এবং এখনও কুমার।

আজকের এই সকালে, যে প্রান্তরে ওক হেঁটে বেড়াচ্ছিল, সেটা গড়ান হয়ে নরকুম্ব হিলের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এক বড় রাজপথ এই প্রান্তরের বুক চিরে চক্ নিউটন আর এম্মিনিষ্টার এর মধ্যে বিস্তৃত। বেড়ার উপর দিয়ে ইতস্ততঃ তাকাতে তাকাতে ওক একটা চকচকে হলুদ রঙের জুড়ি গাড়ী দেখতে পেল— গাড়োয়ান হাতে একটা চাবুক নিয়ে পাশে পাশে হাঁটছে। গাড়ীটার মধ্যে ডাঁই করা গৃহস্থালীর আসবাব-পত্র, টবে করা জানালার শোভা লতাপাতা— আর সব কিছুর উপরে বসে এক সুন্দরী তন্বী যুবতী। দেখতে দেখতে গাড়ীটা ঠিক গ্যাব্রিয়েলের চোখের সোজাসুজি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গাড়োয়ান বলল— মিস্' মনে হচ্ছে গাড়ীর পেছনের বোর্ডটা খুলে পড়ে গেছে।

—হ্যাঁ, আমারও একবার মনে হয়েছিল —মেয়েটি মৃদুস্বরে জবাব দিল —টিলার ওপরে ওঠার সময় অমন একটা শব্দ শুনেছিলাম বটে।

—আমি একবার দেখে আসি।

ঘোড়াদুটো অভ্যস্ত ভঙ্গিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। গাড়োয়ানের পদশব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল দূরে। স্তূপীকৃত তৈজসপত্রের ওপরে একটা মেনি বেড়াল দুটো আধবোজা চোখে তাকিয়েছিল খাঁচাভর্তি ক'টা পাখির দিকে। চতুর্দিকের নৈঃশব্দের মধ্যে পাখীগুলোর এই দাঁড় থেকে ওই দাঁড়ে ছুটোপুটি করে উড়ে বসা ছাড়া আর কোনও আওয়াজ

শোনা যাচ্ছিল না। মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর নীচের দিকে তাকিয়ে কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট তুলে নিল। গাড়োয়ান দূরে চলে গেছে দেখে, সে প্যাকেটটি আস্তে আস্তে তার কোলের উপরে নিয়ে খুলল এবং ছোট্ট একটি আয়না বার করে নিজের প্রতিবিম্ব খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে একবার ফিক করে হেসে ফেলল।

প্রভাতী সূর্যের আলোর ছ'টায় মেয়েটির সিঁদুররঙের জ্যাকেট কালো চুল আর উজ্জ্বল মুখশ্রীতে এক দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্যাকটাস আর মার্টলের সজীব শ্যামলিমা— এই ঘোড়া, গাড়ী, গাড়োয়ান, জিনিষ-পত্রের পরিবেশে অসময়ে নিয়ে এসেছিল নব বসন্তের শোভা। কতকগুলি শালিখ, টুনটুনি আর অদৃশ্য ফার্মার ওকের মনোহারী এই সুন্দর হাসির কি ছিল প্রেরণা—কেউ তা বলতে পারবে না। মেয়েটি যতই নিজের হাসির প্রতিবিম্ব দেখছিল— ততই আরও হেসে ফেলছিল খুশীর জোয়ারে।

অবিন্যস্ত কেশভার সুসজ্জিত করার ইচ্ছায় নয় বা মাথার উপরে টুপিটাকে নেড়েচেড়ে বসানোর জন্যেও নয়— সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে এই যুবতী মুকুরে নিজের প্রতিফলন দেখে হয়তো ভাবছিল যে, প্রকৃতি তাকে নারীত্বের কি অপরূপ কমনীয়তা দান করেছেন— তার মধুমাখা হাসিতে সে চির-বিজয়িনী— পুরুষের হৃদয় সেখানে বিনা আয়াসে বন্দী। এ সবটাই অবশ্য অনুমান। ঘটনাটা এতই স্বাভাবিক যে এখানে ওরকম উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান করা বৃথা।

গাড়ীর চালকের ফিরে আসার শব্দ পেয়ে মেয়েটি আয়নাটাকে পুনরায় মুড়ে যথা স্থানে রেখে দিল।

গাড়ীটা এগিয়ে গেলে, গ্যাব্রিয়েল বেড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে পথে নামল এবং গাড়ীটার পিছু পিছু অগ্রসর হল। প্রায় বিশ পা দূরে থাকতে গ্যাব্রিয়েল রাস্তার ট্যাক্স আদায়ের চৌকির কাছে একটা বচসার আঁচ পেল। —এই হারামজাদা, —তোকে যা দিয়েছি— তাই অনেক— আর এক কড়িও পাবি না। মিসেস্-এর ভাগ্নী ঐ উপরে বসে আছে— আর এক পেনিও দেবেনা বলে দিয়েছে— গাড়োয়ানটার এই সদালাপ গ্যাব্রিয়েলের কানে গেল। চৌকিদার তখন গেটটা বন্ধ করে বলে দিল— থাক শালা দাঁড়িয়ে। মিসেস্-এর ভাগ্নীকে আর যেতে হবে না। ওক তখন দু'জনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে এবং মাত্র দু'টো পেনির অকিঞ্চিৎকর মূল্য চিন্তা করে এগিয়ে এল।

—এই নাও —বলে সে দুটো পেনি চৌকিদারকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল— ভদ্র-মহিলাকে যেতে দাও। তারপরে মেয়েটির দিকে তাকাল— মেয়েটি তার কথা শুনে চোখ নীচু করে বসেছিল।

যাওয়াব আগে সে একবার গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকিয়ে, গাড়োয়ানকে বলল গাড়ী চালাতে। হয়তো তার দৃষ্টিতে একটা ধন্যবাদের ভাষা ছিল কিন্তু মুখে তেমন কিছু বলল না— অথবা হয়তো এজন্য সে মোটেই উপকৃত বোধ করেনি। কারন গ্যাব্রিয়েল তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তদ্বির করলেও, তাব জিদের উচিৎ মর্য্যাদা দেয়নি। আর মেয়েরা এটাকেই সবচেয়ে বেশী দাম দেয়।

চৌকিদার দূরে মিলিয়ে যাওয়া গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে ওককে বলল—

—মেয়েটি সুন্দরীই বটে।

—কিন্তু নিঁখুত নয়। গ্যাব্রিয়েল উত্তর দিল।

—ঠিক বলেছ, ফার্মার।

—সব থেকে বড দোষ হল—

—মানুষকে হেয় করা। তাই না?

—উঁহু।

—তবে?

গ্যাব্রিয়েল এক উদাসীন পথিকের দৃষ্টিতে, বেড়ার ধারে, যেখানে মেয়েটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, সেই দিকে একটু তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল—

—দেমাক।

॥ ২ ॥

সেদিন ছিল 'সেন্ট টমাস ইভ'— বিশে ডিসেম্বর, বছরের সবথেকে ছোট দিন। মাঝরাত থেকেই এক ঝড়ো উত্তুরে হাওয়া নরকুম্ব হিল উলট-পালট করে বেড়াচ্ছিল। নরকুম্ব হিল চকপাথর আর মাটির পাহাড়। দেখলে মনে হবে পৃথিবীর অন্যসব গিরিপর্বতের মতই অবিনাশী ও গ্রানাইটের মত শক্ত।

সে রাত্রির স্বচ্ছ আকাশে, নক্ষত্রের কম্পমান আলোয় কি এক অখণ্ড অনুভূতি! মনে হচ্ছিল সমস্ত বিশ্ব-সংসার একই নাড়ীর স্পন্দনে স্পন্দিত— এই উত্তুরে হাওয়া যেন কোন সুদূর মেরুপ্রান্ত থেকে বয়ে আসছে, আর সন্ধ্যাবেলা থেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল পূবাকাশে পড়েছে ঝুঁকে। ইংল্যাণ্ডের আকাশে

যা সচরাচর অনুভব করা যায় না, আজ রাত্রে নক্ষত্রের বর্ণ যেন অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল। ধ্রুবতারা আলোয় আলোময়, লুব্ধককে হলুদ দেখাচ্ছিল, আর কালপুরুষ এবং মহাসপ্তর্ষি এক আগ্নেয় রক্তিমাভা নিয়ে জ্বলজ্বল করছিল। মধ্যরাত্রির স্বচ্ছ আকাশের তলায়, কোনও পাহাড়ের উপর একাকী দাঁড়িয়ে মনে হয় বিশ্বজগৎ যেন গতিশীল একটি সত্তা এবং ক্রমাগতই পূর্বের দিকে এগিয়ে চলেছে। গতিশীলতা একটা কাব্যিক অলঙ্কার কিন্তু এ'র মহাকাব্যিক অনুভূতি সম্ভব এইরকম রাত্রির মধ্যযামে, সভ্যতাগর্বী মানবতার থেকে অনেক দূরে, এই গিরিকন্দরে। প্রকৃতির রূপের এই মহাপ্রদর্শনীতে বাস্তবচেতনার অনুপ্রবেশ একেবারেই অসঙ্গত।

হঠাৎ দূরে, এই বায়ু প্রবাহ ও প্রকৃতির থেকে বেশী ছন্দোময় এবং সুকুমার এক ধ্বনি শোনা যেতে লাগল, সেটা হ'ল ফার্মার ওকের বাঁশী। আওয়াজটা কেঁপে কেঁপে ভেসে আসছিল, দূরে বেড়ার ধারের এক অন্ধকার উৎস থেকে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যায় যে ওটা একটা মেষপালকের কুঁড়ে। অপরিচিত লোকের কাছে কুঁড়েটার ঐ রকম জায়গায় অবস্থান একটা দুর্বোধ্য ব্যাপার। কুঁড়েটার তলায় চারটে ছোট ছোট চাকা, তাই মেঝেটা মাটি থেকে বিঘৎ খানেক উপরে। ভেড়াদের যখন বাচ্চা দেওয়ার সময় আসে শেফার্ডকে তখন বাধ্য হয়ে অহোরাত্র মাঠের মধ্যে থাকতে হয়, কুঁড়েটাকে টেনে নিয়ে যেতে হয় হেথা হোথা।

অতি সম্প্রতিই গ্যাব্রিয়েল লোকমুখে 'ফার্মার ওক' বলে পরিচিত হতে শুরু করেছিল। গত বারোটি মাসের অপরিসীম অধ্যবসায় ও তিল তিল পরিশ্রমে সে নরকুম্ব হিলের এই ছোট্ট 'শীপ ফার্ম' গড়ে তুলেছে মাত্র দু'শোটি ভেড়া নিয়ে। এর আগে সে অল্প কিছুদিনের জন্যে 'বেলিফ'-এর কাজ করেছে আর তারও আগে ছিল একজন সাধারণ 'শেফার্ড'। ছেলেবেলা থেকে তার বাবার মৃত্যু পর্যন্ত বাবার পাশে পাশে থেকে বড় বড় মালিকের ভেড়ার পালকে দেখাশুনা করেছে।

সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়, গ্যাব্রিয়েল ভেড়াগুলো ধার করে এই যে ফার্ম গড়ে তুলেছিল, তার দায়িত্ব এবং বিপদাপদ সম্পর্কে সে খুব সতর্ক থাকত। তার উন্নতির প্রথম সোপান ছিল এই ভেড়াগুলোর বাচ্চা হওয়ার সীজন। ছোটবেলা থেকেই সে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। তাই মাইনে করা লোক না রেখে নিজেই সব দেখাশোনা করত।

বাতাস সোঁ সোঁ করে বইতে থাকলেও বাঁশীর আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কুঁড়েটার পাশে একটা চতুষ্কোণ আকৃতির আলো দেখা গেল, পাশে দাঁড়িয়ে ফার্মার ওকের মত একটি চেহারা, তার হাতে একটা লণ্ঠন, দরজাটা বন্ধ করে সে মাঠের এই দিকটাতে এসে খুব ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল, অন্তঃত বিশ মিনিট যাবৎ আলো আঁধারিতে কখনও তাকে দেখা যাচ্ছিল, কখনও যাচ্ছিল না। শরীরেব 'ফিটনেস'ই সুশ্রীতার প্রথম লক্ষণ। গ্যাব্রিয়েলের চলাফেরা এবং নীচু হয়ে ভেড়াগুলো দেখার মধ্যেই তার সু-স্বাস্থ্য ফুটে উঠছিল।

এই আবছা আলোতেও ভাল করে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায়, গ্যাব্রিয়েল ওক এবারের এই শীতে নরকুম্ব হিলের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। এখানে ওখানে ছোট ছোট খড়ের চাল— আর তার তলায় কোমল, পেলব— সাদা বা মেটে রংয়ের কতকগুলি করে মেষ। গ্যাব্রিয়েল আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদেব গলার ঘণ্টাগুলো টুং টুং করে বেজে উঠছিল, শব্দটা কিন্তু যত না স্পষ্ট তার থেকে বেশী মধুব ; গলার চারদিকে পশমের আবরণে ঘণ্টাগুলো ঢাকা পড়ায় আওয়াজটা অস্পষ্ট হয়েই ভেসে আসছিল। তার চলে যাওয়া পর্যন্ত এই শব্দ শোনা যেতে লাগল। গ্যাব্রিয়েল যখন কুঁড়েতে ফিবে এল তখন তার হাতে একটা সদ্যোজাত মেষশাবক, বাচ্চাটার পাগুলো শরীবের তুলনায় অনেক লম্বা।

এই ছোট্ট প্রাণস্পন্দনটুকু গ্যাব্রিয়েল একটা খড়ের আঁটির উপর রাখল, পাশেই একটা ষ্টোভে একটু দুধ ফুটছে। এই ছোট্ট গৃহবাসে, মেঝের অর্দ্ধেকটাই গমের বস্তায় ঢাকা, গ্যাব্রিয়েল তার উপরেই শরীরটাকে এলিয়ে দিল, আস্তে আস্তে চোখ দুটো বুঁজে এল তার। শারীরিক পরিশ্রমে অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের কোন দিকে ফিরে শোয়া যায় এইটুকু ভাবতে যতটা সময়, তার মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। এখন এই ঘরের ভেতরটা ঠিক ছবির মত দেখাচ্ছিল। আগুনের লাল আভা যেখানে যেখানে ঠিকরে পড়েছে, সবটাই মনে হচ্ছিল শোভন ও সুন্দর। এক কোনায় একটা তাকের ওপর কতকগুলো বোতল, তার মধ্যে কোনটায় একটু আলকাতরা, কোনটায় বা ক্যাষ্টর অয়েল ইত্যাদি— সবই এই অসহায় জীবগুলোর চিকিৎসাব সরঞ্জাম। আর এক কোনে একটা তেপায়া শেলফে কিছু রুটি চীজ আর একটা কাপে কিছু পানীয়। তার পাশে দাঁড় করানো এই একঘেয়ে পাহারার ক্লান্তি হরণকারী সেই বাঁশীটা। ঘরটার

দু'পাশে উপরের দিকে দু'টো গোল আকারের গর্ত— ভেন্টিলেটর— কাঠের ঢাকনি টেনে বন্ধ করা যায়।

মেষশাবকটি উষ্ণতার স্পর্শে চাঙ্গা হয়ে উঠল; ব্যা ব্যা করে ডাকতে শুরু করল। এই অভ্যস্ত আওয়াজ গ্যাব্রিয়েলের কানে এবং মস্তিস্কে এত দ্রুততার সঙ্গে প্রবেশ করল, যে মুহূর্তের মধ্যে গ্যাব্রিয়েল তার গভীর নিদ্রা থেকে অতন্দ্র সতর্কতায় জেগে উঠল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ছোট কাঁটাটা আবার অবাধ্যতা করছে। তখন সে টুপি মাথায় দিয়ে, বাচ্চাটিকে দুই হাতে করে অন্ধকারে বেরিয়ে এল। বাচ্চাটিকে তার মায়ের কাছে দিয়ে গ্যাব্রিয়েল অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল— স্বগতঃ ভাবে বলল, একটা বাজে। জনবসতির থেকে দূরে, রাত্রির এই সবাক নির্জনতায় গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো— এই দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার পৃথিবীতে সেই একমাত্র সচেতন প্রাণী, বাকী সকলেই পৃথিবীর যে অর্দ্ধ এখন দিবালোকে আলোকিত সেখানকার বাসিন্দা।

এই সব ভাবতে ভাবতে— বাগিচার প্রান্তে যে আলোকবিন্দুটিকে সে এতক্ষণ একটা নীচুতারা বলে মনে করছিল— সেটিকে কোনও মানব বসতির লক্ষণ বলে বুঝতে পারল। ফার্মার ওক আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল, বেড়া ফাঁক করে ওপারে গিয়ে তার মনে হ'ল— এটা একটা ঘর, পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কেটে করা হয়েছে। সেইজন্যে চালের নীচের দিকটা পেছনদিকে প্রায় মাটির সঙ্গে ঠেকেছে—ঘরটার সামনের দিকে পেরেক দিয়ে আঁটা কাঠের বেড়া, গায়ে আলকাতরার পোঁচ। গ্যাব্রিয়েল পেছন দিকে উঠে গিয়ে, ছাদের একটা ফুটো দিয়ে ঘরের ভিতরে দেখার চেষ্টা করল।

ঘরটার মধ্যে দু'টি মহিলা এবং দু'টি গাইগরু। গরু দু'টোর পাশে জাবনা দেওয়া দুটি নাদা। মহিলাদের একজন মধ্যবয়স্কা, অপরজন যুবতী, কিন্তু মেয়েটিকে যেহেতু সে ঠিক ওপর থেকে দেখল, যেমন মিল্টনের স্যাটান স্বর্গকে দেখেছিলেন, তাই তার রূপ সম্পর্কে সে পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারল না। মেয়েটি একটি বড় ঢিলে ঢালা ক্লোক পরিহিতা। বয়স্কা মহিলা যুবতীকে বললেন, চল্ এখন বাড়ী যাওয়া যাক্। ওঃ! ডেইজির জন্যে আমি এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—এখন মনে হয় গরুটা আস্তে আস্তে সেরে উঠবে।

মেয়েটির চোখের পাতা যেন শ্রান্তিতে জুড়ে আসছিল— যাতে বেশী পরিশ্রম না হয়, এমনভাবে সে ছোট্ট করে ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে হাই

তুলল। গ্যাব্রিয়েলও যেন তার প্রতি সহানুভূতিতে হাই তুলল। মেয়েটি বলল— আহা; এইসব দেখাশুনা করার জন্যে যদি আমরা একটা লোক রাখতে পারতাম!

—সে সামর্থ্য যখন নেই, তখন নিজেদেরই দেখতে হবে। তুই এখানে থাকলে আমার অনেক সাহায্য করতে পারবি।

— আমাব টুপিটা কিন্তু হারিয়ে গেছে। এত হাল্কা বাতাসে কি করে যে বেড়ার ওপারে গিয়ে পড়ল।

গাইগরু দু'টো ভিভন জাতের— একটা পুরো লাল রংয়ের, আর একটা ছাই ও সাদা রংয়ের ছিট ছিট। দ্বিতীয়টির পাশে দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট বাছুর, বোধহয় গতকালই হয়েছে— বোকার মত কখনও মেয়েলোক দু'টির দিকে কখনও বা লণ্ঠনটিকে চাঁদ মনে করে তার দিকে তাকিয়েছিল।

বয়স্কা মহিলাটি বললেন—ভূষি আনতে হবে, ছোলাও ফুরিয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, পিসি, ভোর হলেই আমি চলে যাব আনতে।

কর্ম্মব্যস্ত মা যেমন নানা কাজের মধ্যেও ফুরসৎ করে তার সন্তানকে হাসিখুশী রাখেন, প্রকৃতিব তেমনি এক খেয়ালী যোগাযোগ ঘটে গেল। মেয়েটি তার লম্বা ক্লোক খুলে ফেলতেই—তার কুচ্‌কুচে কালো অলকরাশি বক্তবর্ণ জ্যাকেটের উপবে বিছিয়ে পড়লো। মুহূর্তেই ওক তাকে সেই হলদে গাড়ী, ক্যাক্টাস আব আয়নার নায়িকা বলে চিনতে পারল, গল্প করে বলতে গেলে, এই মেয়েটিই গ্যাব্রিয়েলেব কাছে দু-পেন্সের ঋণী।

গো-বৎসটিকে তার মায়ের কাছে রেখে তারা লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এল এবং পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে দূরে মিলিয়ে গেল। গ্যাব্রিয়েল ফিরে এল তার ভেড়ার পালের মধ্যে।

॥ ৩ ॥

পরের দিন সকাল হ'লযেন নিতান্ত আলস্যভরে। গত রাত্রির ঘটনা মনে পড়ায়, ওক এক অজ্ঞাত আকর্ষণে সেই বাগিচার দিকে হাঁটতে শুরু করল। ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে সে পাহাড়েব দিকে ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পেল এবং একটু পরেই দেখতে পেল সেই গোয়ালঘরটার পাশ দিয়ে একটি মেয়ে এক পিংলা রংয়ের টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে এদিকেই আসছে। মেয়েটি গত রাত্রির সেই যুবতী। তৎক্ষনাৎ তার সেই হারিয়ে যাওয়া টুপিটার কথা মনে পড়ল,— গ্যাব্রিয়েল এক লাফে নর্দমা পার হয়ে ওপারে গয়ে বেড়ার ঝোপঝাড়ের মধ্যে

একটু খুঁজতেই টুপিটা পেয়ে গেল। তার মনে হল মেয়েটি হয়তো টুপি খুঁজতেই এদিকে আসছে। তখন সে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে চুপিচুপি ঘুলঘুলি দিয়ে চেয়ে রইল মেয়েটির পথের পানে।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি বেড়ার কাছাকাছি পৌঁছুতেই এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। গ্যাব্রিয়েল ছুটে যাচ্ছিল—তাকে হারানো জিনিস ফিরিয়ে দিতে—কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তাটা এখানে এসে বাগিচার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। সাধারণ পায়েচলা পথ—তাই মাথার উপর ডালপালা এসে পড়েছে—ঘোড়ার পিঠে সোজা হ'য়ে বসে এই পথে যাওয়া দুঃসাধ্য। মেয়েটির পরনে ঘোড়ায় চড়া পোষাকও ছিল না, মুহূর্তে চারিদিকে তাকিয়ে তার মনে হ'ল—সমস্ত মানব জগতের সে দৃষ্টির অগোচর—মাছরাঙার মত ক্ষিপ্রতায় সে ঘোড়ার পিঠে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল—মাথাটা ঘোড়ার লেজের উপর আর পা দু'খানা ঘোড়ার গলার কাছে। গ্যাব্রিয়েল ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই, সে এই জায়গাটা অতিক্রম করে গেল—ঘোড়াটা মনে হল এইরকম ভঙ্গিতে চলায় ভালই অভ্যস্ত। আস্তে আস্তে সে এগিয়ে গেল টিউনেল মিলের দিকে।

কাণ্ডকারখানা দেখে ওকের বেশ মজা লাগল—কিছুটা বিস্মিতও হ'ল। টুপিটাকে ঘরে ঝুলিয়ে রেখে সে তার ভেড়ার পালের মধ্যে ফিরে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মেয়েটিকে ফিরতে দেখা গেল—তার সাথে তখন ঘোড়ার পিঠে এক বস্তা ছোলা—গোয়ালঘরটার কাছে যেতেই একটা ছোকরা একটা দুধ দোওয়া বালতি নিয়ে এগিয়ে এল—এবং বালতিটা নামিয়ে রেখে, ঘোড়াটিকে নিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চ্যাং চ্যুং চ্যাং চুং গরুদোয়ার শব্দ শোনা গেল। গ্যাব্রিয়েল হারিয়ে যাওয়া টুপিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটির ফেরার পথের দিকে তাকিয়ে।

দুধের বালতিটা এক হাতে নিয়ে মেয়েটি যখন বেরিয়ে এল—তার বাঁ-হাত তখন ভারসাম্য রাখার জন্য অন্যদিকে প্রসারিত। ওক মনে মনে ভাবল—আহা, এটা গরমকাল হ'লে তার সুললিত বাহুমূলের আরও কিছুটা অনাবৃত দেখা যেত। মেয়েটির চলার ধরণ এমন দৃপ্ত যে, এ হেন পরিবেশে তার উপস্থিতি যেন আদৌ বিস্ময়ের নয়—কিন্তু তাকে বিস্মিত করেই বেড়ার ওপর থেকে গ্যাব্রিয়েলের মুখটা চন্দ্রোদয়ের মত আস্তে আস্তে প্রকাশ হ'ল।

গ্যাব্রিয়েলকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, যুবতী তার মুখশ্রী ও অঙ্গাবরণ সম্পর্কে যে সচেতন হ'য়ে পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু তার এই সচেতনতা এত বেশী নয় যে, তাকে রূপগর্বিতা বলে মনে হয় আবার এত কমও নয় যে, সে মর্য্যাদাবোধ সম্পর্কে নিতান্তই উদাসীন। এই রকম গ্রাম্য পরিবেশে, পুরুষের দৃষ্টিপাতে, যে কোনও কুমারীর মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। যুবতী হাত দিয়ে তার মুখ মুছলো—যেন গ্যাব্রিয়েলের স্পর্শলেগে তার গোলাপী আভা মলিন হ'য়ে গেছে—তার পদক্ষেপ অনেক মার্জিত হ'য়ে এল। প্রথমে হাসি দেখা দিল কিন্তু পুরুষেরই মুখে—যুবতীর ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হ'ল না।

ওক বলল—এই টুপিটা আমি এখানে পেয়েছি। যুবতী তার সৌজন্যবোধ প্রকাশে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু হেসে উত্তর দিল—ওটি আমার, কাল রাত্রে উড়ে গিয়েছিল।

—কাল রাত একটার সময় ?

—হ্যাঁ তাই, কিন্তু তুমি কি করে জানলে ?

—আমি এখানেই ছিলাম।

—ও, তুমিই ফার্মার ওক, তাই না ?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারো—আমি খুব সম্প্রতিই এখানে এসেছি।

মেয়েটি চারদিক একবার দেখে নিয়ে তার এলিয়ে পড়া চুলগুলো পিঠের উপর সরিয়ে দিয়ে বলল—তোমার ফার্ম খুব বড় ?

—না, এমন কিছু না—শতখানেক হবে (গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ এই সব মাপের কথা বলার সময়ে 'একর'এর উল্লেখ বাহুল্য মনে করে)।

—টুপিটা আজ সকালে আমার বিশেষ দরকার ছিল—একবার টিউনেল মিলে যেতে হয়েছিল তাই—

—হ্যাঁ, আমি জানি।

—কি করে ?

—আমি তোমাকে দেখে ছিলাম।

—কোথায় ?—প্রশ্নের সাথে সাথে মেয়েটির সমস্ত পেশী যেন সঙ্কুচিত হয়ে এল।

—এইতো এখানে, এই ঝোপের ভিতর দিয়ে, পুরো পাহাড়টা তোমায় নেমে যেতে দেখেছি—ফার্মার ওক দূরে পথের উদ্দেশ্যে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল।

কিন্তু তক্ষুণি তাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হ'ল যেন সে চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। সকালের বিচিত্র ঘটনা এবং তার চলার ভঙ্গি মনে পড়াতে মেয়েটির মুখ রাগে ফেটে পড়তে লাগল—হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল তার—গ্যাব্রিয়েল সেই সিঁদুর রঙের তেজ সহ্য করতে না পেরে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হ'ল।

এই সরল ও সহানুভূতিপ্রবণ লোকটি অন্যদিকে তাকিয়ে ভাবছিল, কখন এই মহিলা তার স্বাভাবিক কোমল রূপটি ফিরে পাবে। এমন সময়ে তার কানে ভেসে এল—বাতাসে শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি। দৃষ্টি ফিরিয়ে সে দেখল—মেয়েটি চলে গেছে।

উৎসাহ ও সঙ্কোচের দোলায় ইতস্ততঃ করতে করতে গ্যাব্রিয়েল কাজে ফিরে গেল। দীর্ঘ পাঁচটা দিন কেটে গেল তারপর। মেয়েটি দু' বেলাই গাই দোয়াতে এবং অসুস্থ গরুটাকে দেখতে আসে—কিন্তু একবারও ওকের দিকে ফিরে তাকায় না—ওকের বোকামিতে সে খুব দুঃখ পেয়েছিল—তার দেখে ফেলার জন্যে নয়, বোকার মত যা দেখেছিল তাই আবার তার কাছে বলাতে। আইনের অনুশাসন ছাড়া যেমন অন্যায় বলে কিছু নেই—তেমনই লোকচক্ষুর অন্তরালে হলে কোন কিছুই অশ্লীল নয়, গ্যাব্রিয়েলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাওয়ায় মেয়েটি খুব লজ্জিত বোধ করছিল—আর গ্যাব্রিয়েলের অনুক্ষণ চিন্তার বিষয় ছিল এই একটাই।

এ পরিচয় হয়তো একদিন বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যেত, সেই সপ্তাহের শেষের দিকেই একটা আকস্মিক ঘটনা না ঘটলে। একদিন বিকালবেলা থেকেই তুষারপাত শুরু হয়েছিল—আর সন্ধ্যে হওয়ার সাথে সাথে আবহাওয়া আরও ভারী হয়ে এল। এমন জমাট বাঁধা ঠাণ্ডায় ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে নিঃশ্বাস ফেললেও তা জমে যায়—আর ড্রয়িংরুমে ফায়ারপ্লেসের সামনে চেয়ারে বসে যারা আগুন পোয়াচ্ছিল—তাদের মুখটা আগুনে গনগনে থাকলেও, চেয়ারের পেছনটা তখন জমে বরফ। সে রাত্রে বহু পাখী কুলায়ে ফিরেছিল অভুক্ত অবস্থায়।

গাই দোয়ার সময় হ'তে ওক রোজকার মত গোয়ালঘরটার দিকে তাকিয়েছিল। প্রচণ্ড শীতলতাবোধে সে আসন্ন প্রসবা ভেড়াগুলোর গায়ে আরও কিছু চটের বিছানা চাপা দিয়ে ঘরে ফিরে এল। উনুনটাতে আরও কিছু কাঠ চাপিয়ে দিয়ে সে দেখল, ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে দরজা ও ভেন্টিলেটর পথে ঘরের মধ্যে ঢুকছে। ওক জানত যে ঘরের মধ্যে আগুন জেলে দরজা বন্ধ করে রাখলে একটা অন্ততঃ ভেন্টিলেটর খুলে রাখতে হয়। সে একটা ভেন্টিলেটর খুলতে

গিয়েও ভাবল দু' এক মিনিটের মধ্যে ঘরের ভেতরের উত্তাপটা আর একটু বৃদ্ধি পেলে, ওটা খুলে দেবে—এই ভেবে সে বসে পড়ল।

গত দুই তিন রাত্রি ভাল ঘুম হয় নি। ওকের মনে হ'ল তার মাথাটা খুব ধরে আছে। সে ভাবল—ভেন্টিলেটরটা এইবার খুলে দিয়ে একেবারে শুয়ে পড়বে। কিন্তু প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পন্ন করার আগেই সে গভীর ঘুমের জগতে পৌঁছে গেল।

কতক্ষণ যে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল, সে জানেনা। আবছা চেতনায় তার মনে হ'ল, কেউ তাকে টেনে বার করে আনছে—তার কুকুরটা চীৎকার করছে—আর কেউ একজন হাত দিয়ে, তার গলাবন্ধের বাঁধনটা আলগা করে দিচ্ছে। ওক চোখ খুলে দেখল, সেদিনের সেই মেয়েটি যার তেলাকুচোর মত ঠোঁট আর মুক্তোর মত দাঁত—তার দিকে তাকিয়ে আছে; আরও বিস্ময়কর হল, ওকের মাথাটি তার কোলে এবং তার আঙুলগুলি ওকের জামার সব বোতাম খুলে দিচ্ছে। ওকের কাঁধ গলা মুখ খুব ভিজে ভিজে লাগল।

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে?

মেয়েটি মনে হ'ল ঠিক মজা না পেলেও, একটু কৌতুক অনুভব করল। বলল—না, এখনও কিছু হয়নি, তবে হতে পারত। তুমি এখনও বেঁচে আছো এটাই আশ্চর্যের কথা।

—ওঃ হো, এই কুঁড়ে ঘরটা—গ্যাব্রিয়েল বিড়বিড় করে বলল—দশ পাউণ্ড দিয়ে ওটা আমি কিনেছিলাম—নাঃ এবার ওটা বিক্রী করে দিয়ে এই খড়ের চালের তলায় বসে কাটিয়ে দেব। আরও একদিন এইরকম হতে যাচ্ছিল।

—কুঁড়েটার আর কি দোষ? তোমার উচিত ছিল, ঘুমোবার আগে ঐ দুটো খুলে রাখা—মেয়েটি উত্তর দিল। তার কথা বলার ভঙ্গিটা এমন, যেন কি বলতে হবে তা আগে থেকেই ভেবে রাখা আছে।

ওক উদাসভাবে উত্তর দিল—হাঁ, কথাটা ঠিক।

এই সমস্ত ঘটনা পারম্পর্য্যের থেকে, এক বিচিত্রসুন্দর অনুভূতিতে সে তখন আচ্ছন্ন—তার মাথা যার কোলে রয়েছে, সেই নারীর কাছে, সে তার অনুভূতির প্রকাশ করতে পারছিল না। সে ভাবল, তার স্থূল ভাষা এই রূপদানে অক্ষম—তাই চুপ করে থাকল।

মেয়েটি তাকে উঠিয়ে বসাতে, ওক তার মুখটা একবার মুছে নিয়ে, অনেকটা আমসনের ভঙ্গিতে হাত-পাগুলো নেড়ে চেড়ে নিল, অবশেষে অকৃত্রিম লজ্জায়,

আরক্ত আননে কৃতজ্ঞ ভাবে বলল—আমি কি বলে তোমাকে ধন্যবাদ দেব ?

—তাতে কি আছে।—মেয়েটি হাসি-হাসি মুখে উত্তর দিল।

—তুমি কি করে আমায় দেখতে পেলে ?

—আমি যখন দুধ দোয়াতে আসি, ভাগ্যিস্ ডেইজি এখনও দুধ বন্ধ করে নি, হয়তো সামনের হপ্তা পরে আর দুধ দেবেনা, দেখি, তোমার কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে চিল্লাচ্ছে আর দরজায় অনবরত আঁচড কাটছে। কুকুরটা আমায় দেখে যেন লাফ দিয়ে পডল আর আমার স্কার্ট ধরে টেনে নিয়ে এল। তোমার ঘরের চারদিক লক্ষ্য করে দেখি, ভেন্টিলেটরের ঢাকনিগুলো বন্ধ। আমার কাকারও এমন একটা কুঁড়ে আছে—আমি দেখেছি, তিনি তাঁর শেকার্ডকে সব সময় বলেন—ঐ ঢাকনি একটা খুলে রেখে ঘুমুতে। দরজা খুলে দেখি তুমি মড়ার মত পড়ে আছ। হাতের কাছে জল ছিল না বলে, পুরো দুধটাই আমি তোমার মুখে ঢেলে দিলাম—ভুলেই গিয়েছিলাম, যে দুধটা তখনও গরম।

গ্যাব্রিয়েল মৃদুকণ্ঠে স্বগতঃ ভাবে বলল—তাই নাকি. প্রায় মরেই গিয়েছিলাম ?

—না, তা নয়।—মেয়েটির উত্তরে মনে হলো সে অত করুণ একটা পরিণতি সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না।

—মিস্—তুমি আজকে আমার জীবন বাঁচিয়েছো। তোমার পিসিকে আমি জানি বটে কিন্তু তোমার নামটি আমার জানা নেই।

—নাম না জানলেও তোমার চলবে, আমাকে তোমার কখনও প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না।

—তবুও জানলে খুশী হতাম।

—তুমি বরং আমার পিসিকেই জিজ্ঞেস ক'রো—তিনি বলে দেবেন।

—আমার নাম হ'ল গ্যাব্রিয়েল ওক্।

—অ! মনে হচ্ছে তোমার নামটি তুমি অন্যকে জানিয়ে বেশ আনন্দ পাও, গ্যাব্রিয়েল ওক্ ?

—নিজস্ব বলতে আর তো কিছু নেই, নামটিই আছে—তাই আনন্দ পাই।

—আমার তো সর্বদা মনে হয় আমার নামটা কেমন বিশ্রী।

—তাহলে তোমার নতুন নাম নেওয়া উচিত।

—বেশ বলেছ। আরও কিছু উপদেশ দেবে নাকি? আরও অনেককেই বুঝি এরকম পরামর্শ দিয়ে থাক তুমি?

—মাপ করো মিস্—আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো যুক্তিটা পছন্দ করবে। অতশত ভেবে বলি নি আমি—আর তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমি কথায় পেরে উঠব না। যাই হোক—অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে। তোমার হাতটা একটু বাড়িয়ে দেবে?

তাদের এই হাল্কা কথোপকথনকে ওক প্রাচীন ঢঙে ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে দেওয়ায় মেয়েটি যেন একটু নিরুৎসাহ হ'ল। একবার ইতস্ততঃ করে সে হাতটা এগিয়ে দিল, ঠোঁট চেপে বলল—নিশ্চয়ই। পাছে নিজেকে খুব বেশী আগ্রহী দেখায়, তাই ওক্ আলতোভাবে তার আঙুল ক'টা স্পর্শ করে বলল—আমি দুঃখিত।

—কেন?

—এত তাড়াতাড়ি তোমার হাত ছেড়ে দেওয়ার জন্যে।

—ইচ্ছে করলে তুমি আবার ধরতে পার—বলে সে আবার তার হাত এগিয়ে দিল।

এবারে ওক অ-নেক-ক্ষ-ণ তার হাত ধরে রাখল, বলল—আহা কি নরম! এই শীতেও একটু খস্‌খসে হয় নি।

মেয়েটি হাত না সরিয়ে নিয়েই বলল—নাও, অনেকক্ষণ হ'ল। তুমি বোধ হয় এই হাতে একবার মুখ ঠেকালে খুব খুশী হ'তে? ইচ্ছে করলে এই হাতে একবার চুমু খেতে পার।

গ্যাব্রিয়েল সরলভাবে বলল—না, ঠিক সেরকম কিছু ভাবছিলাম না,—তবু দাও।

—না। তাহলে দরকার নেই।—সে তার হাত ছিনিয়ে নিল।

গ্যাব্রিয়েল নিজের বুদ্ধিহীনতায় মনে মনে আর একবার ধিক্কার দিল নিজেকে।

—এবারে আমার নাম জানবার চেষ্টা কোর।—সদম্ভে কথা ক'টি বলে মেয়েটি চলে গেল।

॥ ৪ ॥

পুরুষের থেকে নারীর যদি কিছু শ্রেষ্ঠত্ব থেকে থাকে, তবে সেটা স্পষ্টতঃ বিচার সিদ্ধ নয়—কিন্তু যখন সেটা গৌরবে সর্বব্যাপী অবরোধ নিয়ে হাজির হয় তখন পুরুষ নারীর অধীনস্থ হয়ে পড়ে। এই সুদর্শনা ও শ্রীময়ী মহিলা তরুণ ফার্মার ওকের আবেগের জগতে ইতিমধ্যেই গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

ওকের কুকুরটা দুবেলা খাওয়ার সময়ে যেমন আগ্রহভরে তাকিয়ে থাকত, মেয়েটির পথের দিকে একই আগ্রহে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গ্যাব্রিয়েলের দিন কাটছিল। তার আসার সময় হলেই ওক বেড়ার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে—এইভাবে তার আকর্ষণ গভীর থেকে গভীরতর হল। অপর পক্ষের কিন্তু পরিপূরক কোনও অনুভূতি জন্মায়নি। খোঁজখবর নিয়ে সে জানতে পারল—মেয়েটির নাম বাথশেবা এভার্ডিন, আরও জানল যে গাইগরুটা আর বড়জোর সাত দিন দুধ দেবে। অষ্টম দিনের কথা চিন্তা করে গ্যাব্রিয়েলের মুখ শুকিয়ে গেল।

অবশেষে অষ্টম দিন এল। গরুর দুধ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাথশেবা এভার্ডিন আর এ পথে আসত না। যে কথা গ্যাব্রিয়েল কিছুদিন আগেও চিন্তা করতে পারত না—এখন যেন তার জীবন অর্থহীন হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ কোনও আনন্দের মুহূর্তে সে শিস্ না দিয়ে মনে মনে বলত 'বাথশেবা।' শত প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রেম মানুষের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করে। আর বিবাহের ফলে মানুষ যতই বোকা বোকা হয়ে পড়ুক না কেন—এর প্রধান সার্থকতা হ'ল, বিবাহ জীবনে নিয়ে আসে একটা অবলম্বন, ওক্ এইসব কথা ভাবত আর মনে মনে বলত—"ওকে আমি বিয়ে করবই, না হ'লে আমার জীবনটাই মিছে।" এতদিন যাবৎ সে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছিল না, কোন ছুতোনাতায় একবার বাথশেবার পিসির বাড়ীতে বেড়াতে যাবে।

একদিন একটা ভেড়া একটা ছোট্ট বাচ্চা রেখে মারা গেল। জানুয়ারী মাসের সেই ঠাণ্ডা সকালে গ্রীষ্মকালের মত কড়া রোদ উঠেছিল—খুশী-খুশী লোকেরা ভাবে এইরকম নীল আকাশ আর তেজী রোদ্দুর রোজ হ'লে কি মজাই না হতো। ওক্ বাচ্চাটিকে একটা সুন্দর স্যানডে-বাস্কেটের মধ্যে চাপিয়ে বাথ-

শেবার পিসি, মিসেস্ হার্ষ্ট-এর বাসার দিকে যাত্রা করল—পিছন পিছন গম্ভীর চালে চলল তার কুকুর জর্জ—কুকুরটা যেন এই সমস্ত গেঁয়ো ব্যাপার স্যাপারে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

এর আগে একদিন এক সন্ধ্যেবেলা ওক্ হঠাৎ চিমনি পথে বেরোনো ধোঁয়ার উৎস খুঁজতে খুঁজতে মিসেস্ হার্ষ্ট এর বাসা আবিষ্কার করে ফেলেছিল—সে দিন বাথশেবা দাঁড়িয়েছিল তার পিসির বাড়ীর আঙ্গিনায়। আজকে গ্যাব্রিয়েল খুব যত্ন করে সাজগোজ করেছে—তার জামা-কাপড় আজ ঝকমকে এবং বাহারীও বটে। গ্যাব্রয়েল আজ ঘড়ির চেন পরিষ্কার করেছিল—জুতোয় নতুন ফিতে লাগিয়েছিল আর কাপড়ের বাক্সের তলা থেকে বার করেছিল একটা কাজ করা রুমাল। তার শুকনো কোঁকড়ানো চুলগুলো আজ সুন্দরভাবে পাট করা।

চতুর্দিকের নিঃস্তব্ধতার মধ্যে ছাদের আলসেতে বসা কতকগুলি চড়ুই পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছিল—ঠিক যেন এই ছাদের আশ্রয়ে যারা বাস করে তাদের স্বভাবসুলভ পরচর্চা ও পরনিন্দার মত এরাও কোনও গুজব নিয়ে মেতে উঠেছে। লক্ষণটা খুব ভাল মনে হলনা, ওক এগিয়ে বাসার কাছাকাছি যেতে তার কুকুর জর্জকে দেখে একটা বিড়াল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ধনুকের মত বেঁকে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল। জর্জের কিন্তু সেদিকে মোটেও মন ছিল না—কারণ তার এই পরিণত বয়সে বৃথা চীৎকার পণ্ডশ্রম বলে মনে হত। সত্যি সত্যিই ভেড়ার পাল পাহারা দেওয়ার সময়ে সে কর্তব্যের খাতিরে বিপদ আপদ থেকে সতর্ক করার জন্যেই ঘেউ-ঘেউ করে উঠত—এছাড়া বৃথা শক্তিক্ষয় করত না।

বিড়ালটা দৌড়ে লরেল গাছের ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। সেখান থেকে কে যেন একজন বলে উঠল—আয় মেনি। কোন জানোয়ার কুকুরটা তোকে তাড়া করেছে রে?—আহা মেনি আমার।

ওক্ সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরকে লক্ষ্য করে উত্তর দিল—জর্জ তো কিছুই করেনি, যাকগে, তবুও ঘাট মানছি আমি।

কেউ কিন্তু ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলনা। ওকের ভ্রু কুঁচকে উঠল কিছু একটা আশঙ্কায়, মনে মনে সে যে রকম মহড়া দিয়ে এসেছিল—ঘটনা অন্য-রকম ঘটে গেল। লজ্জিত মুখে ওক মিসেস হার্ষ্টের দরজায় পা দিল।

বাথশেবার পিসি বাড়ীতেই ছিলেন। ওক বলল—দয়া করে মিস্ এভার্ডিনকে একটু বলবেন, যে এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়, (গাঁয়ের দিকে কেউ নিজের নাম না প্রচার করে, ভদ্রলোক বললে তাতে তার শিক্ষার অভাব

বোঝায় না, বরং শহরে আত্ম প্রচার লিপ্ত লোকদের মধ্যে এই ভদ্রতা ও বিনয়ের অভাব আছে)।

বাথশেবা বাড়ীতে ছিল না। তখনকার সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর ছিল তারই।

—মিঃ ওক্! তুমি কি ভিতরে এসে বসবে?

গ্যাব্রিয়েল ভদ্রমহিলার সাথে অগ্নিস্থলী পর্যন্ত এগিয়ে এল। বলল—ধন্যবাদ, ম্যাডাম। আমি মিস্ এভার্ডিনের জন্য এই বাচ্চাটা নিয়ে এলাম—মনে হয় তার পছন্দ হবে—মেয়েরা তো অনেকেই পুষতে চায়।—হাঁ, তা হতে পারে—মিসেস্ হার্স্ট আস্তে আস্তে বললেন—তবে ওতো এখানে বেড়াতে এসেছে—বেশী দিন থাকবে না, তুমি যদি একটু অপেক্ষা কর—বাথশেবা এসে পড়বে এখুনি।

গ্যাব্রিয়েল বসে পড়ে বলল—ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করছি। তাছাড়া শুধু বাচ্চাটার জন্যেই আমি আসি নি, মিসেস্ হার্স্ট! আমি শুধু একটু জানতে চাই, সে বিয়ে করতে আগ্রহী কিনা।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, সে রাজী থাকলে আমি ভারী খুশী হব তাকে বিয়ে করতে। আপনি কি বলতে পারেন সে কোনও যুবকের বাগদত্তা কিনা?

—দাঁড়াও, ভেবে বলছি। মিসেস্ হার্স্ট বিনাকারণে অগ্নিস্থলীর আগুনটা একটু উস্কে দিলেন—দেখ, ফার্মার ওক। ওকে এত সুশ্রী দেখতে—আর এত গুণীমেয়ে যে—আমি—যদিও কাউকে আমি এখানে আসতে দেখিনি—আমার মনে হয় তা' ডজন খানেক ছেলে বন্ধু আছে ও'র।

ওকের মনে হ'ল যেন পাথরের মেঝেতে ফাটল দেখা দিচ্ছে, মাথা নীচু করে সে বলল—আমার দুর্ভাগ্য! আমি তো নিতান্তই সাধারণ—ভেবেছিলাম প্রথম হাজির হওয়ার সুবাদে যদি আমার সুযোগ হয়···যাক্ গে, আমি আর বসব না। এই জন্যেই এসেছিলাম আমি, অন্য কিছু নয়। চলি—

গ্যাব্রিয়েল বেরিয়ে, প্রায় দুশো গজ মত এগিয়ে গেলে দূর থেকে সুরেলা গলায়, তার পিছনে ডাক শুনতে পেল—এই!···এ···ই! পেছন ফিরে দেখল একটি মেয়ে রুমাল ওড়াতে ওড়াতে দৌড়ে আসছে।

ওক দাঁড়িয়ে পড়ল। বাথশেবাকে দেখে সে রক্তিম হয়ে উঠল আর মেয়েটির চেহারা আগেই আরক্ত হয়ে উঠেছিল—আবেগের আতিশয্যে নয়, দৌড়নোর

পরিশ্রমে—ফার্মার ওক। আমি· · বলে সে মাজায় হাত দিয়ে, ঘাড়টা পিছন দিকে কাৎ করে একটু দম নিল।

সে আর কিছু বলার আগেই, গ্যাব্রিয়েল বলল—তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছিলাম।

—হ্যাঁ, আমি জানি। বাথশেবার মুখটা তখন নেয়রে ভেজা গোলাপের পাঁপড়ির মত লাল আর ভিজে ভিজে—কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি যে তুমি আমাকে বিয়ে করার কথা বলতে এসেছিলে। তাহলে আমি তখনই বাগান থেকে চলে আসতাম। এতটা দৌড়ে আমাকে আসতে হ'ল, শুধু এইটুকু জানাতে যে, আমার পিসি তোমাকে ঠিক কথা বলেন নি।

গ্যাব্রিয়েল লম্বা করে শ্বাস নিল, বলল--তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত,—তার গলার স্বর তখন স্নেহসিক্ত—দাঁড়াও, একটু জিরিয়ে নাও।

বাথশেবা বলে চলল--পিসি তোমাকে ভুল কথা বলেছে, আমার কোন প্রেমিক নেই—আর কখনও ছিলও না। পিসি তোমাকে মিছিমিছি ফিরিয়ে দিয়েছে বলে আমি লজ্জিত।

—আমি সত্যিই খুশী হলাম শুনে—খুশীতে ডগমগ হয়ে ফার্মার ওক তার বিশিষ্ট লম্বা একটা হাসি হাসল—হাত বাড়িয়ে দিল তার হাত ধরার জন্যে। বাথশেবার হাত তখন কোমর থেকে তার বুকের উপর উঠে এসেছে—দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসে বারবার বুক ওঠানামা করছে। গ্যাব্রিয়েল তার হাত ধরতে গেল। সুড়ুৎ করে হাতটা টেনে নিয়ে পেছনে দিয়ে বাথশেবা দাঁড়াল।

গ্যাব্রিয়েল যতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে হাতটা ধরতে গিয়েছিল, তার অর্দ্ধেক নিশ্চয়তা নিয়ে বলল—আমার ছোট একটি সুন্দর খামার আছে।

—আমি দেখেছি।

—যদিও একজনের থেকে ধার করে করতে হয়েছে আমাকে, কিন্তু দেনাটা আমি শিগ্‌গিরই শোধ করে দিতে পারব—অতি সাধারণ লোক হলেও ছোটবেলা থেকেই আমি অল্প কিছু সঞ্চয় করেছি।—গ্যাব্রিয়েল 'অল্প কিছু' কথাটা এমন আত্মতুষ্টির সঙ্গে বলল—যে মনে হ'ল 'বেশ কিছু।' সে বলে চলল—আমি নিশ্চিত,—আমাদের বিয়ে হ'লে, এখনকার থেকেও আমি দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে পারব।

এগিয়ে গিয়ে সে আবার তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। চলতে চলতে তারা এমন একটা সঙ্কীর্ণ জায়গায় এসে পড়েছিল যে, বাথশেবার মনে হ'ল গায়ে গায়ে

ঠেকে যাবে—তাই সে চট করে একটা ঝোপের পাশে সরে গেল। চোখদুটো বড় বড় করে ঝোপের ওধার থেকে বলল—কিন্তু ফার্মার ওক! আমি তো একবারও বলিনি, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

ওক অবিশ্বাসের সুরে উত্তর দিল—হ্যাঃ, বাজে কথা, একটা লোকের পিছনে এতটা ছুটে এসে কেউ বলতে পারে যে, সে তাকে চায় না।

বাথশেবা ঘটনার গতিপ্রকৃতি অত চিন্তা না করে, ব্যস্ত হয়ে বলল—আমি স্রেফ এইটুকুই তোমাকে বলতে এসেছিলাম যে, আমার পিসি যা বলেছে, তা ভুল—আমি এখনও কারও প্রেমিকা হইনি—নিজেকে কোনও পুরুষের সম্পত্তি বোধ করতে আমি হেয় মনে করি।—অবশ্যি তাই হয়তো আমাকে হতে হবে একদিন—কিন্তু একটা মিথ্যে ধারণা ঠিক করে দেওয়ার জন্যে দৌড়ে আসতে তো কোনও ক্ষতি নেই।

—না, না, ক্ষতি কি?—গ্যাব্রিয়েল কিন্তু ব্যাপারটাকে এত আন্তরিক ভাবে নিয়েছিল যে, সায় দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সত্য কথাটি বেরিয়ে পড়ল—কিন্তু সত্যিই কি একদম ক্ষতিকর নয়?

—আমি সত্যি বলছি, তুমি টিলাটা পেরিয়ে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিলে যে আমি দৌড়োবার আগে বিয়ে করা-না করার কথা একেবারেই চিন্তা করি নি।

গ্যাব্রিয়েল একটু সামলে নিয়ে বলল—ঠিক আছে, মিস এভার্ডিন!—এখন দুয়েক মিনিট চিন্তা করে নাও। আমি অপেক্ষা করছি। আমি সত্যি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি—আমাকে বিয়ে করো বাথশেবা।

—আচ্ছা, চিন্তা করে দেখব। এখন এই পরিবেশে আমার পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব না।

—তাহলেও একটা আভাস দিতে পার।

—আমাকে তবে সময় দাও।—বাথশেবা চিন্তিত মুখে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

গ্যাব্রিয়েল তার পিছন দিকে দাঁড়িয়েছিল, বলল—আমি তোমাকে সুখী করতে পারব, অন্যান্য ফার্মারের গিন্নীদের মত তোমাকে দুয়েক বছরের মধ্যেই আমি একটা পিয়ানো কিনে দেব। আর সন্ধ্যেবেলা তোমার সঙ্গে আমিও বাজাব আমার বাঁশী।

—হুঁ, ব্যাপারটা ভাবতে ভালই লাগছে।

—আর বাজার থেকে ফুল নিয়ে আসব—কিছু পাখীও—অর্থাৎ মুরগী—কারণ

মুরগী আমাদের আয় দেবে —গ্যাব্রিয়েল কবিত্ব আর বাস্তব চেতনা মিশিয়ে কথাগুলি বলল।

—সত্যি ভাল লাগছে।

—আর বিয়ের পরে, আমরাও খবরের কাগজে বিবাহিতদের তালিকায় আমাদের নাম ছাপিয়ে দেব।

—আমার খুব পছন্দ—

—সকলের যেমন হয়, আমাদেরও সন্তান হবে—ঘরের মধ্যে ফায়ার প্লেসের পাশে বসে তুমি যেদিকে তাকাবে, আমাকে দেখবে, আমিও যেদিকে তাকাব তোমাকে দেখব।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।—মুখ গোমড়া ক'রে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। গ্যাব্রিয়েল ততক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতকগুলো সোঁদাল বনফুল হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। বাথশেবা হঠাৎ দৃঢ় হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—না, অসম্ভব। আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না।

—আর একটু ভেবে দেখ।

—এতক্ষণ আমি মনে মনে অনেক ভেবে দেখেছি। বিয়েটা একরকম ভালই —লোকে বলবে, বাঃ মেয়েটার একটা গতি হয়ে গেছে—আর আমি নিজেকে বিজয়িনী ভাবব, কিন্তু—তুমি যেমন বললে—সবসময়ে সামনে একজন পতিদেবতা দাঁড়িয়ে থাকবে—

—হ্যাঁ, ঠিক তো, সে তো আমিই।

—আসলে আমি যা বলতে চাই—আমি বিয়ের কনে হ'তে রাজি আছি, যদি ঐ পতিদেবতা ছাড়া বিয়ে করা যায়। কিন্তু যেহেতু সেটা সম্ভব নয়— অতএব আমি বিয়ে করব না—অন্ততঃ এখনই নয়।

—একটা খুবই আজগুবি কাহিনী শোনালে তুমি।

বাথশেবা এই সমালোচনায় আরও গম্ভীর হয়ে কিছুটা সরে দাঁড়াল।

—আমি বিশ্বাস করি না, কোনও মেয়ে এত বোকা হতে পারে।—ওক একটা সরল দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—কিন্তু আমাকে তোমার ভাল না লাগার কি কারণ থাকতে পারে?

—কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি না।

—বেশ! কিন্তু......

বাথশেবা ছোট একটুখানি হাই তুলল, বলল—আমার ভাল লাগে না তোমাকে।

—কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালবাসি। আর আমার তরফ থেকে অন্য কিছু দরকার নেই, শুধু তুমি পছন্দ করলেই যথেষ্ট।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু তার ফলে, তোমার মনেও একদিন অবিশ্বাস আসবে।

—কক্ষণো না,—এতটা আবেগের সঙ্গে ওক কথাগুলো বলল যেন মনে হ'ল সে ঝোপ পেরিয়ে সোজা বাথশেবার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হতে চায়—আমি জীবনে চিরদিন তোমাকে ভালবাসব, তোমাকে চাইব এবং আমৃত্যু তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। এখন তার কণ্ঠস্বর এক অব্যক্ত দুঃখে ভেঙে পড়ছিল—লম্বা বাদামী রঙের হাতদুটো ঠকঠক করে কাঁপছিল।

বাথশেবা একটু বিব্রত হয়ে বলল—তুমি এতটা এগিয়ে গেছ যে, তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া কষ্টকর। ইস্, তখন যদি তোমার পিছনে না দৌড়োতাম।—পরিস্থিতিকে হাল্কা করে আনার জন্যে সে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল—মিঃ ওক, তুমি পারবে না, আমি এত বেশী অবাধ্য এবং বন্য যে, আমাকে পোষ মানানোর মত কাউকে চাই—আমি জানি, তুমি পারবে না।

ওক্ তর্ক করা বৃথা বুঝে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল, বাথশেবা খুব স্পষ্ট- এবং অপ্রগলভ ভাবে বলল—তুমি আমার থেকে অনেক বেশী সঙ্গতিপন্ন। আমার এক পেনিও সঞ্চয় নেই। জীবনধারণের জন্যে এই পিসিই আমার ভরসা, শিক্ষাদীক্ষায় তুমি আমার থেকে পিছিয়ে আছ এবং আমি তোমাকে ভালবাসি না—এই হ'ল আমার তরফে যুক্তি। আর তোমার দিক দিয়ে বলতে গেলে—তুমি নূতন ফার্মিং শুরু করেছ, কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন লোকে বলবে, তোমার বিয়ে করতে হ'লে (যদিও তোমার এখনই বিয়ে করা উচিত নয়) কোনও সঙ্গতিপন্ন মহিলাকে বিয়ে করা উচিত—যাতে তোমার ফার্ম আরও বড় হয়।

গ্যাব্রিয়েল কিঞ্চিৎ বিস্ময় এবং অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে তার দিকে তাকাল—সরলভাবে বলল—ঠিক এই কথাটাই আমিও ভাবছিলাম।

গ্যাব্রিয়েলের চরিত্রে ক্রীশ্চান গুণাবলী এতবেশী ছিল যে, তার এই অতিরিক্ত সততা ও বিনয়ে বাথশেবা চটে গেল, রাগতঃভাবে বলল—তাহলে আমাকে বিরক্ত করতে এসেছিলে কেন?

—আমি যেটাকে ঠিক উচিত মনে করি, তা করতে পারি না।

—এতক্ষণে তুমি সত্যিকথা বলেছ মিঃ ওক্!—বাথশেবা চীৎকার করে উঠল —অবজ্ঞার ভারে তার মাথা তখন দুলছিল—এর পরেও, মনে কর, আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি।

গ্যাব্রিয়েল আবেগে ভেঙে পড়ল—আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে একটিও সাজানো কথা বলিনি। তোমার যে আমাকে ভাল লাগেনি সেজন্যে আমি নিরুপায়। এখানকার লোকে সকলেই জানে যে তোমার চালচলন বিত্তবতী মহিলার মতই, আর আমি শুনেছি, ওয়েদার বেরীতে তোমার কাকার বিরাট বড় ফার্ম আছে। আমি কি সন্ধ্যেবেলা আবার আসব?—বা রবিবারে তুমি যদি আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোও। তুমি ইচ্ছা না করলে, আমি এখনই তোমাকে মনস্থির করতে বলছি না।

—না, না অসম্ভব, তুমি আমাকে আর বোলোনা, আমি পারব না। আমার পক্ষে তোমাকে ভালবাসা একেবারেই হাস্যকর—বাথশেবা হেসে বলল।

কোন লোকই তার অন্তরতম আবেগের মুহূর্তে অন্যের উপহাস সহ্য করতে পারে না। সন্ন্যাসীর মত দার্ঢ্য ও নিরাসক্তির সঙ্গে ওক্ বলল—ঠিক আছে, তাহলে, আ—র তোমাকে আমি বলব না।

॥ ৫ ॥

বাথশেবা এভার্ডিন যে এ পাড়া ছেড়ে চলে গেছে সে খবর একদিন গ্যাব্রিয়েলের কানেও পৌছল। প্রেমে পড়াটা যত সহজ, এ'র থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তাটা তেমন নাকবরাবর নয়। বাথশেবা স্থানান্তরে চলে যাওয়ায়, এই বিরহ ওকের হৃদয়ে তার স্মৃতিকে গভীরতর ও মধুরতর ব্যঞ্জনায় রঙীন করে রাখল।

বাথশেবার পিসির সঙ্গে ওকের সবে-শুরু-করা বন্ধুত্বের অসময়োচিত অবসান হওয়ায়, ওককে সমস্ত খবরই আর পাঁচজনের মুখে মুখে জানতে হয়েছিল। সে জেনে ছিল যে, বাথশেবা বিশমাইল্ তফাতে ওয়েদারবেরী গ্রামে চলে গেছে—কিন্তু বেড়াতে গেছে কি একেবারে চলে গেছে—এ ব্যাপারে কেউ সঠিক সংবাদ দিতে পারে নি।

গ্যাব্রিয়েলের দুটো কুকুরের মধ্যে বড়টি—জর্জ ছিল পাঁশুটে সাদা বা ছাই-ছাই রঙের—কিন্তু সর্বক্ষণ ভেড়ার পালের মধ্যে থাকতে থাকতে তার গায়ের রঙ প্রায় বাদামী হয়ে গিয়েছিল—আর গায়ের লোমগুলোও যেন পশম বলে ভুল হত, এ'র আগে কুকুরটা ছিল এক রাগী, গোঁয়ার শেফার্ডের কাছে—ফলে মনিবের

মেজাজ বুঝে নিতে তার একটুও দেরী হত না। শেফার্ডের বিভিন্ন ইঙ্গিতের গূঢ় অর্থ সে অনায়াসেই ধরে ফেলত—বুড়ো হয়ে গেলেও কুকুরটা এখনও কর্মক্ষম এবং নির্ভরযোগ্য।

দ্বিতীয় কুকুরটা—জর্জেরই ছেলে—কিন্তু সে বোধ হয় মায়ের ধারা পেয়েছিল। তাই জর্জের সঙ্গে তার কোনও মিল ছিল না। জর্জ মারা গেলে সে যাতে সহজেই কাজ চালিয়ে নিতে পারে, তাই সে এখনও এই বিদ্যায় শিক্ষানবীশ। কিন্তু কোনও কাজ ভালভাবে শেষ করা আর অতিরিক্ত ভাল ভাবে শেষ কবার মধ্যে তফাতটা সে এখনও বুঝে উঠতে পারে নি। এই বাচ্চা কুকুরটা—(তাকে এখনও বিশেষ কোনও নামও দেওয়া হয় নি) এত বেশী নিষ্ঠাবান কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ যে তাকে যদি একবার ভেড়াগুলোকে একদিক থেকে তাড়িয়ে এক জায়গায় জড় করবার ইশারা করা হয়, সে খুব খুশী মনে সারাদিন ধরে তাড়িয়ে তাদের একদম জেলার বাইরে বার বরে দিতে পারে, যদি না তাকে আবার থামবার ইঙ্গিত করা হয়।

নবকুম্বহিলেব উল্টোদিকে ছিল বিরাট এক চক্-পিট—পুরুষানুক্রমে সেখান থেকে চক পাথর খুঁড়ে নিয়ে লোকে নিকটবর্তী কারখানায় যোগান দিত। গর্তের উপরে দুধারের ঝোপঝাড V আকারের এক জায়গায় এসে শেষ হয়েছে —কিন্তু পুরোপুরি মিলিত হয় নি। এই ফাঁকাটুকু লোকে বাঁশ, বুনো গাছ গাছড়ার রেলিং দিয়ে ঘিরে রেখেছিল।

একদিন রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে, ফার্মার ওক কুকুরদুটোকে খুব ডাকা-ডাকি করল—কিন্তু বুড়ো জর্জ ছাডা অপরটার সাডা পাওয়া গেল না। গ্যাব্রিয়েলের তখন মনে পড়ল—সে আগের দিনের একটা মরা ভেড়া কুকুর দুটোকে খেতে দিয়েছিল—বোধ হয় ছোটটা এখনও খাওয়া শেষ করতে পারে নি—এই ভেবে সেদিন রাতের বিলাসী নিদ্রায় ওক নিজেকে সঁপে দিল।

ভোর হওয়ার আগেই যেন ভীষণ পরিচিত অথচ অস্বাভাবিক এক পৌনঃ-পুনিক আওয়াজে ওকের ঘুম ভেঙে গেল। একজন সাধারণ লোক ঘড়ির টিকটিক আওয়াজে যত অভ্যস্ত—একজন শেফার্ডের কাছে ভেড়ার গলার ঘণ্টা ধ্বনি তার চেয়েও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। দূর থেকে এই টুং টাং আওয়াজ শুনেই শেফার্ড বুঝতে পারে ভেড়ার দল সব ঠিকঠাক আছে কিনা। প্রত্যুষের গাম্ভীর্য্যময় পরিবেশে ওকের মনে হল—আওয়াজটা খুব বেশী জোর এবং বেমানান —আগের অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝতে পারল যে ভেড়ার পাল তীব্রবেগে কোনও

একদিকে ছুটে চলেছে।

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে, জামাটা গায়ে দিয়েই সে পাহাড়ে গিয়ে উঠল। তার ভেড়ার দলে, দুশোটি ভেড়া ছিল আসন্নপ্রসবা—তাদের আলাদা একটা দলে রাখা হত—আর বাকী গোটা পঞ্চাশের বাচ্চা হয়ে গিয়েছিল—তারা থাকত একটা দলে। ওক চারিদিকে ভাল করে লক্ষ্য করেও দুশো ভেড়ার দলটিকে দেখতে পেল না। শেফার্ডের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সে ডাক দিল—ওভে, ওভে, এ এ।·· কিন্তু কোন ভেড়ার ডাক শোনা গেল না। বেড়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওক দেখল—সেখানে কিছুটা ভাঙা—আর আশেপাশে ভেড়ার ক্ষুরের দাগ। ওক ভাবল—তবে কি ঐ বাগিচার ভিতরে আইভিলতার যে বুনো জঙ্গল হয়ে আছে সেই সুখাদ্যের লোভে তার ভেড়ারা এই বাধা ভাঙার শক্তি পরীক্ষায় নেমেছে?—ওক আবাব ডাকল—দূরেব পাহাড় আর উপত্যকা থেকে তার প্রতিধ্বনি ফিরে এল। গাছপালা—জঙ্গল ছাড়িয়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে সে সেই চকপিটের দিকে এগিয়ে গেল—সেখানে গর্তটার মুখে—আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার ছোট কুকুরটা—ঠিক যেন সেণ্ট হেলেনায় নির্বাসিত, স্তব্ধ, বিষন্ন সম্রাট নেপোলিয়ন।

ওকের শরীরে একটা ভীতির স্রোত বয়ে গেল। অনেকটা অচেতন শরীরে সে এগিয়ে গিয়ে দেখল রেলিংয়ের একটা জায়গা ভাঙা—আর তার আশে-পাশে ভেড়ার পায়ের ছাপ। কুকুরটা পেছন পেছন এসে ওকের হাত চাটছিল—যেন কোন এক অসাধারণ কৃতিত্বের জন্যে সে পুরস্কারের প্রত্যাশী। ভয়ঙ্কর গহ্বরের কিনারে দাঁড়িয়ে ওক দেখল—তার গর্ভিনী ভেড়াগুলো, তারই পায়ের নীচে গর্তের মধ্যে মরে পড়ে আছে—একটার পর একটা। গুনতিতে তারা মাত্র দুশো হলেও, এই মুহূর্তে তাদের অনেক, অনেকগুণ বেশী মনে হচ্ছিল।

ওক ছিল অত্যন্ত কোমলপ্রাণ—তার লক্ষ্মী ভেড়াগুলো আর তাদের অজাত শাবকদের অকাল মৃত্যুতে ওকের একটিই মাত্র অনুভূতি হল—এক মূক ভাষা-হীন বেদনা। পরমুহূর্তেই তার মনে পড়ল যে ভেড়াগুলো বীমা করা ছিল না, তার সারাজীবনের কৃচ্ছ্র তার সঞ্চয় ও স্বাধীন ফার্মার হওয়ার সাধ নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আঠার থেকে আঠাশ—এই দশ বছরে গ্যাব্রিয়েলের উত্তম, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের এত পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল যে এখন আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। সে মাথায় হাত দিয়ে এক জায়গায় বসে পড়ল।

বিষাদ চিরকাল থাকে না। ফার্মার ওকের বিষাদ কেটে গেলে যে কথাটি

সে প্রথম উচ্চারণ করল—তা একান্তই তার চরিত্রগত অনুভূতি—সে আস্তে আস্তে বলল—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি বিয়ে করি নি, আমার এই দুর্দশায় 'সে' কি বিপদেই পড়ত।

ওক মাথা তুলে চারিদিক ভাল করে দেখল, যতদূর বোঝা গেল—বেচারী ছোট কুকুরটার এখনও দৃঢ় বিশ্বাস—যে যেহেতু ভেড়া তাড়ানোই তার কাজ, অতএব সে যতই তাদের তাড়াবে ততই ভাল। মরা বাচ্চাটাকে দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন সমাপ্ত করে সে নূতন উদ্যম আর উৎসাহে, এই গর্ভিনী ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে এক কোণায় জড় করে। তারপর ঐ ভীতু জানোয়ার-গুলো বেড়া পেরিয়ে একে একে এসে এই গর্তের সামনে হাজির হয়—আরও তাড়া খেয়ে তারা পচা রেলিং ভেঙে এক এক করে লাফ দিয়ে পড়ে এই মৃত্যু-গহ্বরে।

কুকুরটা প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অতিরিক্ত প্রমাণ করেছিল নিজেকে—তাই সেই দিনই দুপুরবেলায়, দুঃখজনক হলেও, তার জন্যে বন্দুকের একটা গুলী খরচ করতে বাধ্য হল ওক।

ভাগ্যের এমনই পরিহাস নেমে আসে—কুকুর এবং অন্যান্য দার্শনিকদের উপর—যারা নানা ভুল আর আপোসে—ভরা এই দুনিয়াকে সর্বদা যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে চায়।

গ্যাব্রিয়েলের চরিত্র এবং কর্মক্ষমতা দেখে এক ব্যবসায়ী তাকে এই ফার্ম করার প্রয়োজনীয় মূলধন ধার দিয়েছিলেন। হিসেব করে দেখা গেল যে অবশিষ্ট ভেড়া আর যা কিছু সম্পত্তি ও যন্ত্রপাতি বিক্রী করে ওক দেনা শোধ করে দিতে পারবে—বাকী থাকবে খালি তার বর্তমান পরণের পোষাকটা—তাই নিয়ে তাকে নতুন করে জীবনের পথে যাত্রা শুরু করতে হবে।

॥ ৬ ॥

দু'মাস কেটে গেল। ফেব্রুয়ারী মাসে জেলা শহর ক্যাষ্টারব্রিজে এক বিরাট মেলা বসে।

পথের একপ্রান্তে বসেছিল প্রায় দু' তিনশো শ্রমিক। তাদের কেউ গাড়োয়ান, মাথায় টুপির সাথে জড়ানো চামড়ার ছপটি—ঘরামিদের টুপিতে খানিকটা খড় জড়ানো আর শেফার্ডদের হাতে একখানা করে শীপ-ক্রুক-ভেড়া—

তাড়ানোর মাথা বাঁকানো ডাণ্ডা। এদের পোষাকে এদের বৃত্তি নির্দিষ্ট-তাই যারা লোকের খোঁজে আসে তাদের কোনও অসুবিধা হয় না।

এই ভীড়ের মধ্যে সুঠাম শরীর এক যুবক ঘোরাফেরা করছিল—তাকে দেখে অন্যদের থেকে পৃথক বলে মনে হয়। এমনকি অনেকে তাকে 'ফার্মার' মনে ক'রে—'মশাই' বলে সম্বোধন করছিল—খোঁজখবর নিচ্ছিল। সকলকেই সে একই উত্তর দিচ্ছিল—আমি নিজেই একটা বেলিফের কাজ চাই। তেমন খবরটবর আছে নাকি?

গ্যাব্রিয়েলের চেহারা এখন অনেক মলিন। তার চোখ দুটো ক্লান্ত আব মুখের অভিব্যক্তিতে দুঃখের ছাপ, দৈন্যের তপস্যায় সে যত আহুতি দিয়েছে তার থেকে ফিরে পেয়েছে বেশী। তাব চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এখন এক মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আর ভাগ্য সম্পর্কে নিরাসক্তি। এই চরম ঔদাসীন্যের ফলে মানুষ অনেক সময় দুশ্চরিত্র নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে—আবাব সাধুসন্তও হয়ে যায়। যাই হোক—গ্যাব্রিয়েল এখন অনেক বেশী পরিণত—তার সমূহ ক্ষতিতেও সে লাভবান।

সকালবেলা এই শহরের মধ্য দিয়ে এক অশ্বারোহী-বাহিনী চলে গেছে—তাই এখানে ওখানে এক সার্জেন্ট সৈন্যদলে নাম লেখানোর জন্যে প্রচার করে বেড়াচ্ছিল। সন্ধ্যে হয়ে এল—কোনও কাজের ব্যবস্থা হল না দেখে ওক একবার ভাবল—সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। বাজারে সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে, পরিশ্রান্ত গ্যাব্রিয়েল অবশেষে ভাবল বেলিফ ছাড়া অন্য কাজের চেষ্টা করবে।

সব ফার্মাররাই মনে হচ্ছিল শেফার্ডের খোঁজ করছে। মেষপালন কাজটি ওকের আগাপাস্তলা জানা। একটা ছোট রাস্তা পেরিয়ে এক সরু গলি দিয়ে সে এক কামারের দোকানে এসে হাজির হ'ল—

—একটা শেফার্ডের ক্রুক তৈরী করতে কত সময় লাগবে?

—বিশ মিনিট।

—কত দিতে হবে?

—দু শিলিং।

গ্যাব্রিয়েল একটা বেঞ্চিতে বসল, ক্রুকটা তৈরী হয়ে গেলে সেটা নিয়ে গেল এক জামা-কাপড়ের দোকানে। যন্ত্রটা তৈরী করতেই তার যথা সর্বস্ব ব্যয় হয়ে গিয়েছিল, তাই সে তার ওভারকোটা বদলে একটা শেফার্ডের আলখাল্লা

নিল। তারপব তাড়াতাড়ি আবাব বাজারে ফিরে গেল—'শেফার্ডের' পোশাকে দাঁড়িয়ে থাকল রাস্তার ধাবে।

ওক যেহেতু এখন 'শেফার্ড' হযে এসেছিল—মনে হ ল এখন বেলিফের চাহিদা বেড়ে গেছে। যাই হোক দু'চাবজন ফার্মাব তাকে দেখে এগিয়ে এল এবং আলাপ করতে লাগল—কোথা থেকে আসছ ?

—নরকুম্ব।

—সে তো অনেকদূব।

—পনেরো মাইল।

—আগে কাব ফার্মে কাজ কবতে ?

—আমার নিজেব।

উত্তবটা কলেরা মড়কেব দুঃসংবাদেব মত ছড়িযে পড়ল। আলাপচারী ফার্মার তখন পাশে সরে গিযে সন্দেহেব চোখে ভ্রূ কুঁচকে মাথা নাড়তে লাগল। গ্যাব্রিযেল তাব কুকুবেব মতই সৎ ছিল—সে বেশী আব কিছু বলল না।

পবিকল্পনা কবে সুযোগেব জন্য অপেক্ষা করার থেকে সুযোগ পেলে তাকে কাজে লাগানো অনেক বেশী নিবাপদ। গ্যাব্রিয়েল ভাবল, তার উচিত ছিল যে কোনও কাজের জন্যেই প্রস্তুত হযে মেলায় আসা। অন্ধকার হয়ে এল। কিছুলোক গানবাজনায মেতে ছিল। ওক তার আলখাল্লাব পকেট থেকে বাঁশিটাকে বাব করল এবং বাজাতে শুরু করল—"জকি টু দি ফেয়ার"—যেন জীবনে কোনদিন সে দুঃখ কষ্টেব দেখা পায়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বেশ দু' চার পেনি বোজগাব হযে গেল। জিজ্ঞাসাবাদ করে ওক জানতে পারল যে পরের দিন শর্টসফোর্ড বলে একটা জায়গায় মেলা বসবে।

—হ্যাঁগো, শর্টসফোর্ড কতদূর ?

—ঐ তো—ওয়েদাববেরী থেকে মাইল দশেক !

ওয়েদাববেরী। যেখানে বাথশেবা চলে গেছে মাস দুই আগে—কথাটি যেন ওককে মধ্যরাত্রির অন্ধকাব থেকে মধ্যাহ্নের খররৌদ্দুরে পৌছে দিল।

—ওয়েদারবেরী কতদূর হবে ?

—এই মাইল পাঁচ ছয়।

বাথশেবা হয়ত এতদিনে ওয়েদারবেরী ছেড়ে চলে গেছে—তাহলেও ওক ভেবে দেখল তার পক্ষে পরেব দিনের শর্টসফোর্ডের মেলায় হাজির হওয়াই উচিত—কারণ জায়গাটা ওয়েদারবেরীর থেকে খুব বেশী দূরে নয়। তাছাড়া

ওয়েদারবেরীর লোকগুলোও খারাপ নয়—যতদূর শুনেছে সে, এই জেলার অন্যান্য লোকদের মতই তারাও কর্মঠ, খোশমেজাজী, সঞ্চয়ী এবং পাজী। ওক ঠিক করল শটসফোর্ডের পথে ওয়েদারবেরীতে সেদিন সে রাত কাটাবে।

শটসফোর্ডের রাস্তায় পরপব কতকগুলো খাল পড়ে—আর দুধারে বিস্তৃত বিল জমি। রাস্তার ধাবে ইতঃস্তত: কিছু কিছু গাছ—পাখীর কলকাকলি—সব কিছু মিলে প্রকৃতির অপরূপ শোভা। ওক ইয়ালবেবীর বন পার হয়ে গেল। কতকগুলো গাঙশালিক—'কু—আক—কাক্' করে মোটা গলায় ডাকছিল—আর এখানে ওখানে কিছু কাদাখোঁচা—বা ঘুঘু বা টিয়া উডে উড়ে এসে বসছিল গাছের ডালে। প্রায় তিন চার মাইল হেঁটে আসার পরে, আদিগন্ত বিস্তৃত হয়ে নেমে এল কালো অন্ধকারের পর্দা—ওক ইয়ালবেরী হিল থেকে নামতে নামতে দেখল—সামনে কিছুটা আগে এক বিশাল গাছের তলায় একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে এসে সে দেখল—গাড়ীব সঙ্গে, বা কাছাকাছি, ঘোড়ার কোন চিহ্নই নেই—জায়গাটা নির্জন। বেশ বোঝা গেল, যে রাত্রিব মত কেউ গাড়ীটাকে সেখানে ফেলে গেছে, কারণ এক বোঝা বিচুলি ছাডা গাডীতে আর কিছু নেই। ওক গাড়ীর মাচার ওপরে খানিকক্ষণ বসে চিন্তা করল—সাবাদিনে সে অনেক হেঁটেছে। সকাল থেকে বেরিয়ে তিলার্দ্ধও বিশ্রাম পায়নি—আবাব হেঁটে ওয়েদার বেরীর গ্রামের মধ্যেও যেতে ইচ্ছে করছিল না তার। —সেখানে আবার রাত্রি কাটানোব জন্যে কিছু পয়সাও খরচা করতে হবে—ওক ঠিক করল, এই গাড়ীটার উপরেই বিচুলিব বিছানা করে শুয়ে পড়বে।

অল্প কিছু খাবার দাবার ওক সঙ্গে করে এনেছিল, তার সদ্ব্যবহাব করে সে ফাঁকা গাড়ীটায় চডে বসল বিচুলির অর্দ্ধেক দিয়ে বিছানা পেতে, বাকী অর্দ্ধেক যথাসাধ্য যত্ন করে লেপের মত মুড়ি দিয়ে, সে ভাবল—জীবনে কোনদিন এত সুখে নিদ্রা যায়নি। আন্তবিক বিষণ্ণতা বা দুঃখ বিলাসিতা তার মত লোকের পোষায় না। শুয়ে শুয়ে সে তার পেশা ও ভালবাসার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পডল। এই সমস্ত 'মাটির মানুষরা' ঘুমের দেবতাকে স্মরণ কবলেই পেয়ে যায়—তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলো. সে জানে না—হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখে গাড়ীটা চলছে। গতিবেগও মোটামুটি ভালই—যেজন্যে তার মাথাটা একবার এদিক একবার ওদিক নড়াচড়া করছিল। তারপব তার মনে হল—গাড়ীটার সামনের দিকে

দু'জন লোক কথাবার্তা বলছে। দুর্ভাগ্য মানুষের ব্যক্তিগত ভয়ভীতি সব হরণ করে নেয়—ওক ভয় পেল না—বিচালির মধ্যে থেকে মুখ বার করে সে প্রথম দেখতে পেল—আকাশভরা ফুট ফুটে তারা—লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডলের সঙ্গে ধ্রুবতারা লম্বভাবে রয়েছে—অর্থাৎ রাত প্রায় ন'টা বাজে। ঘাড় ফিরিয়ে সে কাদের হাতে পড়েছে এইটা দেখতে দেখতেই ওক সময়টা আন্দাজ করে নিল—এজন্য তাকে কোন গণনা করতে হল না।

আলো আঁধারিতে বোঝা গেল, গাড়ীর সামনের দিকে দু'জন লোক দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তাদের একজন গাড়ী চালাচ্ছিল। গ্যাব্রিয়েল বুঝতে পারল—তার মত এরাও ক্যাষ্টার ব্রিজের মেলা থেকে ফিরছে। একজন বলছিল—যাই বলো বাপু, দেখতে শুনতে ভাল হলে কি হবে, মেয়েটার ভেতরটা একদম লুসিফারের মত গর্বে ভরা। —হ্যাঁ হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই—বিলি স্মলবেরী কথাটা ঠিকই।—যে লোকটা লাগাম ধরে ছিল, সে কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দিল—এখানে তো সব্বাই বললে, মেয়েটার ভারী গুমোর—

—বটে—বটে—আমার তো এত লজ্জা করে আমি ও'র মুখের দিকে তাকাতেই পাবি না।

—শুনলাম নাকি, শুতে যাওয়ার সময় সে আয়নায় নিজের রূপ দেখে—

—তাও তো এখনও বিয়ে হয় নি গো। কি বলো?

—আবার এত সুন্দর পিয়ানো বাজাতে পারে যে, বেটাছেলেকে নাচিয়ে দেবে।

—আচ্ছা। আমাদেব কপাল তাহলে খুলে গেল হে! তা কিরকম কি মাইনে পত্তর দেবে?

—সে আমি বলতে পারি না—মাষ্টার পুয়োর-গ্রাস।

এমন ধারা কথোপকথন শুনে গ্যাব্রিয়েলের মনে হ'ল এরা বাথশেবার কথাই আলাপ করছে। এরকম ভাবার অবশ্যি কোনও যুক্তি ছিলনা—কারণ এই গাড়ীটা ওয়েদারবেরীর দিকে যাত্রা করলেও, হয়তো ওয়েদারবেরী ফেলে এসেছে—আর যে মহিলার কথা এরা আলোচনা করছিল, তিনি মনে হ'ল অনেক সম্পত্তির মালিক। যাই হোক্ গ্যাব্রিয়েল বক্তাদের অলক্ষ্যে গাড়ীর পেছনে দিক দিয়ে টুপ করে নেমে পড়ল।

ওক ভাবছিল, গ্রামের মধ্যে কোথাও অল্প পয়সায় রাতটা কাটানো যায় কি না। অথবা একেবারে নিখরচায় কোন খড়ের গাদা বা গমের গোলার নীচে

শুয়ে থাকলে কেমন হয়। গাড়ীর কঁ্যাচকঁ্যাচ আওয়াজটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। হঠাৎ গ্যাব্রিয়েল দেখতে পেল—তার বাঁদিকে, প্রায় আধ মাইলটাক দূরে—একটা ভয়ানক রকমের উজ্জ্বল আলো—আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে—নিশ্চয় কোথাও আগুন লেগেছে।

রাস্তার ধারের বেড়া পার হলে সামনে চষাক্ষেত। তার মধ্য দিয়ে, ওক প্রাণপণে দৌড়তে লাগল—যেদিকে আগুন দেখা যাচ্ছিল সেইদিকে। আগুনের লেলিহান বিস্তার ছড়িয়ে পড়ছে—আগুন লেগেছিল একটা খামার বাড়ীতে। গ্যাব্রিয়েলের ক্লান্তমুখে তখন কমলা আভা, তার লম্বা আলখাল্লার সামনের দিকটা কাঁটায় কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত আর শীপ—ক্রুকের ধাতব আগাটা রূপোর মত চকচক করছে। কেউ কোথাও নেই—ওক দাঁড়িয়ে একটু দম নিল।

আগুনটা ছড়িয়ে পড়ছিল এক খড়ের গাদা থেকে—সেটাকে তখন বাঁচানোর আর কোন উপায় নেই। দমকা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলগা খড়বিচালিগুলো হু হু করে পুড়ে যাচ্ছিল—পুঞ্জীভূত ধোঁয়া তখন মেঘের আকারে আকাশে উঠে যাচ্ছে—একটা হুস হুস আওয়াজ হচ্ছে—বড় বড় খড়ের আঁটিগুলো গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে—আর আগুনের শিখা যেন ক্রমেই আকাশ ছুঁয়ে ফেলে এমন অবস্থা। ওক আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না—ব্যাপারটা সে যা ভেবেছিল তার থেকেও গুরুতর—পাশেই রয়েছে সব গমের গোলা,—একটার পর একটা—খামারবাড়ীর সমস্ত সম্পদ পুড়ে ছাই হয়ে যেতে একটুও সময় লাগবে না—এতক্ষণ সে ভেবেছিল ক্ষয়ক্ষতি কেবল খড়ের গাদাতেই সীমিত থাকবে।

আরও খানিকটা এগিয়ে সে খামারবাড়ীর এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ল—দেখল, আরও অনেকে এগিয়ে আসছে। প্রথমে যে লোকটাকে সে ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখল, মনে হচ্ছিল, সে যেন তার চিন্তার দ্রুততার সঙ্গে শরীরটাকেও বৃথা টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে—ওরে! আগুন লেগেছে রে! ও মার্ক ক্লার্ক! ছুটে আয়! বিলি স্মলবেরী, মেরিয়ান মানী তোমরাও এসো, আরে এই জ্যান কোগান, আর ম্যাথু—কে কোথায় আছো—

সকলেই একে একে এগিয়ে গেল—গ্যাব্রিয়েল দেখল, সে মোটেই একা নয়—অনেক লোক—তাদের ছায়াগুলো, কায়াধারীর ইচ্ছায় নয়, আগুনের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে নাচছে। সমাজের এই শ্রেণীর লোকেরা সহজেই কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

—গমের গোলার নীচে ঐ খড়ের আঁটিটা আগে নিভিয়ে দাও—গ্যাব্রিয়েল চেঁচিয়ে বলল। আর একটু হলেই মহাসর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল।—তাড়াতাড়ি একটা ত্রিপল নিয়ে এসো তো।—

একটা ত্রিপল এনে এই দুয়ের মধ্যে ঝুলিয়ে দেয়া হল—তার ফলে আগুনের হল্কা আর গমের গোলার দিকে যেতে পারল না। গ্যাব্রিয়েল এক জনকে বলল—এখানে এক বালতি জল নিয়ে দাঁড়াও, এটাকে সব সময় ভিজিয়ে রাখবে।

আগুন এখন উপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করল। গোলার চাল প্রায় ধরে আর কি। গ্যাব্রিয়েল চীৎকার করে বলল—একটা মই চাই। মই এই খড়ের গাদার গায়ে ছিল—পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে গেছে—ধোঁয়ার মধ্যে থেকে একজন উত্তর দিল।

গ্যাব্রিয়েল কোনরকমে ঐ পোড়া মইতেই পা দিয়ে, কখনও বা তার শীপ-ক্রুকে ভর দিয়ে, অপূর্ব শারীরিক কৌশলে গোলার চালে গিয়ে উঠল—এবং যেখানে যেখানে আগুন ধরেছিল, নিভিয়ে দিতে লাগল। চীৎকার করে সে জল, একটা মই আর একটা গাছের ডাল চাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে বিলি স্মলবেরী (যে গাড়ীতে একজন আরোহী ছিল) একটা মই খুঁজে নিয়ে এল, মার্ক ক্লার্ক এক বালতি জল নিয়ে উঠে গেল—কিন্তু পলকা জোয়ান মার্ক ক্লার্ক সমস্ত জলটাই দিলে গ্যাব্রিয়েলের মুখে ছুঁড়ে। গ্যাব্রিয়েল তখন এক হাতে এক লম্বা গাছের ডাল আর এক হাতে শীপক্রুক দিয়ে পোড়া খড়ের গাদার মাথায় পেটাচ্ছে—আগুনের ফুলকি আর উপরে উঠতে পারল না।

নীচে ততক্ষণ সমস্ত গ্রামের লোকে আপ্রাণ চেষ্টা করছে এই ভয়াল দহনকে দমন করতে—যদিও বিশেষ কিছু করতে পারছিল না। সব থেকে বড় গোলাটার পাশে (ঠিক আগুনের সামনাসামনি নয়) এক টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বসেছিল এক যুবতী। তার সঙ্গে মাটিতে দাঁড়িয়ে আর একটি মেয়ে—ঘোড়াটা যাতে চঞ্চল না হয় তাই তারা আগুনের কাছে যায়নি।

—লোকটা মনে হচ্ছে একজন শেফার্ড—মাটিতে দাঁড়ানো মেয়েটি বলল—হাঁ ঠিক ধরেছি—ঐ দেখো। ওর ক্রুকটা পেটানোর সময় কেমন চকচক করছে। ওর জামাটাতেও দুটো জায়গা পুড়ে গেছে—ওঃ অদ্ভুত সাহসী, ম্যাডাম্!—ও কার ফার্মে কাজ করে? অপরজন প্রশ্ন করল।

—জানি না তো—

—আর কেউ বলতে পারে না ?

—কেউ জানে না, ম্যাডাম ! আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

যুবতী এবার ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এসে চারিদিকে দেখতে লাগল, উদ্বিগ্ন-ভাবে, বলল—গোলাটা কি বাঁচানো গেছে ?

—গোলাটা কি বাঁচানো গেছে ? ওহে জ্যান কোগান !—দ্বিতীয় মহিলা নিকটস্থ পুরুষকে প্রশ্নটা এগিয়ে দিল।

—হ্যাঁঃ, আব কোনও ভয় নেই—ঐ সাহসী শেফার্ডের জন্যেই সব বেঁচে গেল—ঐ যে উপরে বসে আছে—আর হাওয়া কলের মত হাত দু'খানা অনবরত চলেছে।

যুবতী তার পশমী পর্দার ভেতর থেকে গ্যাব্রিয়েলকে দেখে বলল—লোকটা সত্যিই খেটেছে। আমার ইচ্ছা ও এখানে শেফার্ড হয়ে থাকুক—তোমরা কেউ কি ওর নাম বলতে পার ?

—না, ওকে তো কখনও দেখি নি আগে, নামও শুনি নি তো।

আগুন নিভে এসেছিল। গ্যাব্রিয়েল উপর থেকে নেমে আসার ব্যবস্থা করছিল।

—মেরিয়ান ! যুবতী বলল—যাও, ও নেমে এলে বলবে, ফার্মার ওকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

ওক নেমে এলে মেরিয়ান বার্তাটি পৌঁছে দিল। গ্যাব্রিয়েল তাকে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় তোমার কর্তা ? কোন দিকে—মনে মনে সে ভাবছিল যদি এখানে একটা কাজ পাওয়া যায়।

—শেফার্ড ! কর্তা নয় কর্ত্রী—

—মেয়েছেলে-ফার্মার।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ আবার ধনীও বটে—পাশের থেকে একজন বলে উঠল—সম্প্রতি এসেছে গো এখানে—কাকার সম্পত্তি পেল কিনা ! লোকে বলে—ক্যাস্টার ব্রিজের সমস্ত ব্যাঙ্কে ওর টাকা আছে। তোমার আমার মত ব্যাঙের আধুলি নয় হে শেফার্ড।

মেরিয়ান বলল—ঐ তো বসে আছে ঘোড়ার পিঠে, মুখটা পশমের কাপড়ে ঢাকা—

ওকের মাথায়, মুখে, তখন ছাই আর কালি, জামায় অনেকগুলো ফুটো হয়ে গেছে আর জলে ভিজে। বিপন্ন দৃষ্টিতে সে অশ্বারোহিনীর সামনে

গিয়ে দাঁড়াল। সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে সে, মাথা থেকে টুপিটা খুলে, দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বললে—ম্যাডাম! আপনার কি শেফার্ডের দরকার আছে?

যুবতী মুখ থেকে তার উলের পর্দা সরিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। গ্যাব্রিয়েল এবং তার অনাগ্রহী প্রিয়া মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বাথশেবা কোনও কথা বলল না। গ্যাব্রিয়েল লজ্জিত এবং দুঃখিত স্বরে বলল—

—আপনার কি শেফার্ড চাই? ম্যাডাম!

॥ ৭ ॥

বাথশেবা ঘরের দিকে ঘোড়া ফেরাল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে আনন্দিত হবে না বিচলিত হবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। ঘাবড়িয়ে সে অবশ্যই যায় নি। নরকুম্বে থাকতে গ্যাব্রিয়েলের সেই প্রেমের শপথ মনে করার চেষ্টা করে দেখল যে, সে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল।

একটু গম্ভীর চালে সে আস্তে আস্তে বলল—হ্যাঁ। গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকানোর সময়ে তার চিবুক একটু রক্তাভ হ'ল—হ্যাঁ, আমার একজন শেফার্ড চাই।

—এই হচ্ছে চৌকস লোক, ম্যাডাম—একজন গ্রামবাসী শান্তস্বরে বলল। বিশ্বাস সংক্রামক, তাই আরও একজন বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক। ওস্তাদ লোক।—তৃতীয়জন বলে উঠল আন্তরিকতার সঙ্গে।

বাথশেবা বলল—তাহ'লে ওকে বেলিফের সঙ্গে কথা বলতে বল। সবকিছু আবার গন্ধময় হয়ে গেল।

বেলিফের সঙ্গে গ্যাব্রিয়েলের দেখা করিয়ে দেওয়া হলে—বেলিফ বুঝতে পারল—গ্যাব্রিয়েলের বুক ধড়ফড় করছে, উত্তেজনায় বা আশঙ্কায় যে কোন কারণেই হোক। সে তখন গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা পাকা করতে খামার বাড়ীর অন্য একদিকে সরে গেল।

আগুন অনেকক্ষণ নিভে গিয়েছিল। বাথশেবা বলল—শোন হে, তোমাদের এই অতিরিক্ত খাটুনির জন্যে কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। তোমরা একবার বাড়ীর দিকে আসবে?

ওদের মধ্যে একজন মুখপাত্র বলল—মিস্! আপনি ও'টা ওয়ারেনের সরাই-

খানায় পাঠিয়ে দিলে, আমরা এক মজার ভোজ লাগিয়ে দিতাম।

বাথশেবা তারপর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলে, সকলে একে একে চলে গেল—শুধু ওক আর বেলিফ রয়ে গেল খামার বাড়ীতে।

—তাহলে তুমি আসছ। বেলিফ বলল—এই কথাবার্তাই পাকা রইল। আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি। গুড নাইট, শেফার্ড।

গ্যাব্রিয়েল জিজ্ঞাসা করল—আমার রাত্রিতে থাকার কোনও ব্যবস্থা হয়?

—ওটা আমি পারব না,—বেলিফ চলে যেতে যেতে বলল—তুমি ওয়ারেনের সরাইখানায় গেলে সকলের সঙ্গে দেখা হবে। ওরা কেউ তোমাকে সন্ধান দিতে পারবে, তা'লে গুড নাইট।

ওক আস্তে আস্তে গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল। বাথশেবার সঙ্গে এইভাবে পুনর্মিলনে এখনও তার বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি। তার কাছাকাছি থাকতে পেরে গ্যাব্রিয়েল নিজেকে খুব খুশী মনে করল আর নরকুঞ্জের সেই অনভিজ্ঞা বালিকা যে কিভাবে, কত দক্ষতায়, এই পরিণত, শান্তমহিলায় উত্তীর্ণ হয়েছে সেই কথা ভেবে প্রশংসায় পরিতুষ্ট হ'ল তার মন।

গ্যাব্রিয়েল গীর্জার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। গাছের মধ্যে অন্ধকারে তার মনে হ'ল একটা গুঁড়ির আড়ালে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ওক এগিয়ে যাচ্ছিল—একটা পাথরে হোঁচট খাওয়ার শব্দে সেই অদৃশ্য ব্যক্তি একটু নড়েচড়ে উঠল। গ্যাব্রিয়েল কাছে এসে দেখল—একটা রোগা স্বল্পবাস-পরিহিতা মেয়ে—আন্তরিকতার সঙ্গে সে তাকে বলল গুড নাইট।—গুড নাইট—মেয়েটি বলল।

তার গলার স্বর খুব মিষ্টি—কোমল এবং মধুর—বর্ণনা করা সহজ হলেও সচরাচর এমন দেখা যায় না।

—বলতে পার আমি ওয়ারেনের সরাইখানার দিকে যাচ্ছি কিনা?—

গ্যাব্রিয়েল যেন সেই মধুর স্বর আবার শোনার জন্য প্রশ্ন করল।

...হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ টিলাটার পেছন দিকে। গ্যাব্রিয়েলের আন্তরিকতায় আকৃষ্ট হয়ে, মেয়েটি যেন দ্বিধা জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করল—

—আচ্ছা বাকস হেড এর সরাইখানা অনেক রাত্রিতে খোলা থাকে?

—আমি তো ঠিক বলতে পারছি না।

তুমি কি এখন সেখানে যাবে?

হ্যাঁ। বলে মেয়েটি চুপ করে থাকল। চুপি চুপি কোন কাজ করতে হলে

যেমন বহু কষ্টে উদ্দেশ্য গোপন করতে হয়—তেমনিভাবে মেয়েটি বলল—তুমি তাহলে এখানকার লোক নও।

—না, আমি নতুন শেফার্ড। সবে এসেছি।

—শেফার্ড? কিন্তু তোমাকে দেখে তো ফার্ম্মার বলে মনে হয়।

—না, সাধারণ শেফার্ড। বলে ওক পুরনো কথা চিন্তা করতে করতে মাটির দিকে চেয়ে থাকল। সেখানে মেয়েটির পায়ের কাছে একটা ছোট বোঁচকা। তার দৃষ্টি লক্ষ্য করে, মেয়েটি অনুরোধের স্বরে বলল—তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে এখানে দেখেছ, এ'কথা গ্রামে বোল না—অন্ততঃ আগামী দু' একদিন। —তুমি না চাইলে নিশ্চয়ই বলব না।—ওক বলল।

—ধন্যবাদ। আমি খুবই গরীব, আমি চাই না, আমার সম্পর্কে কেউ কিছু জানুক—বলতে বলতে মেয়েটি কাঁপছিল।

—কিন্তু এই ঠাণ্ডায় তোমার বাইরে থাকা উচিত না—অন্ততঃ একটা ক্লোক গায়ে দিয়ে বেরুনো উচিত ছিল।····· তুমি মনে হচ্ছে বেশ বিপদে পড়েছ—আমার থেকে এই একটু সাহায্য তুমি নেবে কি—এই এক শিলিংই আছে আমার কাছে। অপরিচিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই সাহায্য গ্রহণ করল।

তারা পরস্পর করমর্দন করল। কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের মনে হ'ল মেয়েটির নাড়ীর স্পন্দন যেন খুব বেশী—ভেড়ার বাচ্চাগুলো খুব খানিকটা দৌড়ে এসে যেমন হাঁপায় তেমনি। মেয়েটির চেহারা দেখে কিন্তু তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছিল না।

—কি ব্যাপার?

—কিছু না।

—না কিছু একটা হয়েছে।

—সত্যি, সত্যি না। তুমি যে আমাকে দেখেছ একথা গোপন রেখ।

—ঠিক আছে, তাই হবে। গুড্ নাইট।

—গুড্ নাইট।

অপরিচিতা বালিকা সেই রাত্রে সেই গাছের নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল—আর গ্যাব্রিয়েল আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল গ্রামের দিকে। এই কোমল চঞ্চল বালিকার মধ্যে এক গভীর দুঃখের আবছায়া আভাস দেখতে পেল সে। কিন্তু এ সব অর্দ্ধজ্ঞাত বিষয়ে মাথা ঘামানো নিরর্থক ভেবে, সে আর চিন্তা করল না।

আট

ওয়ারেনের সবাইখানা চারিদিকে পুরনো এক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা—পাঁচিলের গায়ে আইভিলতার ঝোপ। এই অন্ধকারে বাড়ীটার সম্পর্কে বিশেষ কোনও আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল না। চারিদিকের দেয়াল থেকে ঢালু খড়ের চাল উঠে গেছে মাঝখানের একটা কেন্দ্রে যেখান থেকে একটা মৃদু লণ্ঠন ঝোলানো আছে ঘরের মধ্যে। সামনের দিকটায় কোনো জানালা নেই—কেবলমাত্র দরজায় একটা চার কোণা ফোকর-কাঁচ দিয়ে ঢাকা-সেই পথে লাল নরম আলো এসে পড়েছে বাইরে আইভিলতার ঝোপে। ঘরের ভেতরে কথা বার্তা শোনা যাচ্ছিল।

ওক অন্ধকারে দরজা হাতড়াতে হাতড়াতে একটা কাঠের ছিটকিনি উঠে গেল আর দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। ঘরের মধ্যে ফায়ারপ্লেসের লাল আগুনের গনগনে আভা। আবছা আলোয় সমবেত সুধীজনের বিচিত্র সব মুখের ছায়া পড়েছে ঘরেব মেঝেতে। দরজার সোজাসুজি ঘরের এক প্রান্তে পেল্লায় আঁচ, আর এক কোনে একটা চৌকি ও তার উপরে বিছানা। সরাইওয়ালা প্রায় সর্বক্ষণ এই এক চৌকিতেই বসে থাকে। এই বৃদ্ধেব পাকা চুল দাড়ি যেন ন্যাড়া কোনও আপেল গাছের গায়ে ধূসর শ্যাওলা। চাপা পায়জামা ও ফিতে-বাঁধা জুতো পবা এই বুড়ো ঠিক আগুনের দিকে তাকিয়ে বসেছিল।

গ্যাব্রিয়েলের নাকে এক টাটকা পানীয়ের গন্ধ প্রবেশ করল। আলাপ-আলোচনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাদের কপালে বলীরেখা দেখা দিল-তিযক দৃষ্টিতে, চোখ ছোট ছোট করে তারা ওকের দিকে তাকাল যেন হঠাৎ কোন আলোর দিকে তাকিয়ে তাদের চোখ ঝলসে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে কেউ কেউ স্বগতঃভাবে বলে উঠল-ও! এতো আমাদের নতুন শেফার্ড বলে মনে হচ্ছে। আর একজন বলল—আরে এস, এস, শেফার্ড! মোষ্ট ওয়েলকাম—তোমার নামটা যদিও আমরা জানি না এখনও।

—আমার নাম হল গ্যাব্রিয়েল ওক। প্রাচীন সরাইওয়ালা এতক্ষণে হঠাৎ ঘুরে বসল।

—তুমি নিশ্চই ঐ নরকুম্বের গ্যাবিল ওকের নাতি নও? কি গো ছোকরা? —সে একটু বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে বলল। অন্য কেউ এ কথায় বিশেষ পাত্তা দিল না। আমার বাবা এবং ঠাকুরদাদা—সকলের নামই ছিল গ্যাব্রিয়েল।

বিনা উত্তেজনায় সে উত্তর দিল।

—ও! খড়ের গাদার উপরে দেখেই আমার মনে হয়েছিল—মুখটা আমার চেনা চেনা। তা এখন কোথায় কি করছ হে?

—ভাবছি এখানে থেকে যাব, মিঃ ওক উত্তর দিল।

—আরে তোমার ঠাকুদ্দাকে আমি ভালই চিনতাম। কথাগুলো দম দেওয়া পুতুলের মত যেন আপনা থেকে বেরিয়ে আসছিল।

—ও! তাই নাকি?

—তোমার ঠাকুরমাকেও।

—আচ্ছা।

—তোমার বাপকেও ছোটবেলায় দেখেচি। কেন ঐ তো আমার ছেলে জ্যাকব আর তোমার বাপ ছিল ন্যাংটা বেলার বন্ধু। তাই না জ্যাকব?

—ঠিক ঠিক। উত্তর দিল তার পঁয়ষট্টি বছরের যুবক ছেলে জ্যাকব। মাথার আধখানা টাক। আর বাঁদিকের উপরের মাড়িতে একখানা মাত্র দাঁত মাইলস্টোনের মত শোভা বর্দ্ধন করছে।—কিন্তু জো'র সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশী। আমার ছেলে উইলিয়ামই বোধ হয় একে নরকুণ্ডে দেখে থাকতে পারে। তাই না বিলি?

চল্লিশ বছরের শিশু, জ্যাকবপুত্র বিলি বলল,—না, এ্যাণ্ডু জানতে পারে। ওক উত্তর দিল—হ্যাঁ, এ্যাণ্ডুকে আমার মনে পড়ছে। আমি তখন ছোট ছিলাম।—ওঃ এইতো সেদিন আমি আমার ছোট মেয়ে লিডির সাথে নাতির অন্নপ্রাশনে গিয়েছিলাম—বিলি বলে যাচ্ছিল—আমরা অনেকক্ষণ তোমাদের পরিবারের কথা আলাপ করলাম।

—এসো শেফার্ড! নাও, গলাটা একটু ভেজাও। আর ভাল মাল তো আমাদের দেবার মত নেই। সরাইওয়ালা তার টকটকে লাল চোখছুটো তুলে বলল—দেখো তো জ্যাকব! গড—ফরগিভ-মিটা তোলো, গরম হল কিনা?

গড-ফরগিভ মি হল একটা লম্বা, তুই হাতা ওয়ালা মগ—ছাইয়ের মধ্যে বসানো ছিল। আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে—বিশেষ করে তুই হাতার চার পাশে এত ছাই জমে শক্ত হয়ে আছে যে হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে দিবা-লোকের সঙ্গে তার সংস্পর্শ ঘটেনি। কিন্তু সেজন্যে পানকার্য্যের কোনও ব্যাঘাত ঘটার কথা নয়—কারণ ভেতরটা বেশ পরিষ্কার। ওয়েদারবেরী ও নিকটবর্ত্তী এলাকায় এই ধরনের মগকে কেন ঐ নামে ডাকা হয়—তার কারণটা

অনিশ্চিত, সম্ভবতঃ কোনও মাতাল এতে করে পান করার সময় যাতে ভগবানের কথা বিস্মৃত না হয়ে যায়।

আদেশ পেয়ে জ্যাকব থার্মোমিটারের মত তার তর্জনীটা ডুবিয়ে দিল মগের মধ্যে। ঠিক ঠিক গরম হয়েছে বুঝে সে মগটাকে আস্তে আস্তে তুলল—তারপরে, ওক নবাগত বলে, খুব সভ্যভাবে মগের তলায় ছাইটাই তার জামা দিয়ে মুছে বলল—শেফার্ডের জন্যে পোষ্কার কাপ।

গ্যাব্রিয়েল খুব বিনীতভাবে বলল—না না দরকার নেই। আমি ও সব নিয়ে কিছু মনে করি না। মগটা নিয়ে সে পানীয়ের ইঞ্চি খানেক পান করে অপরকে এগিয়ে দিল।

—খুব বিবেচক লোক দেখছি।—বলল জ্যাকব।—ঠিক! ঠিক! একটুও বাড়িয়ে বল নি—বলল একজন যুবক। তার নাম মার্ক ক্লার্ক। বেড়াতে বেরিয়ে তার সঙ্গে দেখা হওয়া মানে আলাপ করতে হবে—আলাপ করা মানে পান করতে হবে—আর পান করা মানে, দুর্ভাগ্যবশতঃ খরচটাও বহন করতে হবে।

—এই নাও, শেফার্ড! মালকিনের পাঠানো রুটি আর মাংস এখনও কিছুটা আছে। শক্ত কিছু খেলে তবেই মালটা ভাল লাগবে। বেশী চিবিয়ে খেও না—মাংসটা আনার সময়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল—তাই ধুলো-বালি লেগে আছে। হয়তো চিবুতে গেলে দাঁতে লাগবে। তবে—পোষ্কার নোংরা। আর তুমি তো কিছু মনে কর না, না কি গো?—না, না, ঠিক আছে। ওক বন্ধুভাবে বলল।

—দাঁতে দাঁত লাগতে দিও না—তাহলেই বালি লাগবে না। হ্যাঃ হ্যাঃ বুদ্ধি থাকলে সব হয়।

—একেবারে ঠাকুদ্দার নাতি। ওর ঠাকুদ্দাও ঠিক এইরকম খোলামেলা লোক ছিল। সরাইওয়ালা বলল।

—আরে কি হল হেনরি ফ্রে নাও—খুব আড়ম্বরের সঙ্গে বলল জ্যান কোগান। হেনরির দৃষ্টি তখন প্রায় মধ্য বাতাসে ভাসছে, সে প্রত্যাখ্যান করল না। তার বয়স প্রৌঢ়ত্ব ছাড়িয়ে গেছে, ভ্রু দুটো কপালে তোলা—দুনিয়ার বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে তার শতেক অভিযোগ। তার নামের সে সর্বদা বানান করে Henery এবং কোনও স্কুল মাস্টার দ্বিতীয় e টা সম্পর্কে আপত্তি করলে বলে চার্চে আমার যেমন নামকরণ হয়েছে—আমি অন্যভাবে আমার নাম লিখব না।

হেনরির দিকে যে লোকটি কাপটা এগিয়ে দিল, মিঃ জ্যান কোগান তার নাম, ওয়েদারবেরী এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলোর ম্যারেজ-রেজিষ্টারে বহুবার উঠেছে কারণ গত বিশবছরে সে বহুবিবাহের প্রধান সাক্ষী।

—নাও, নাও, মার্ক ক্লার্ক! ব্যারেল এখনও প্রায় ভর্তি। জ্যান বলল। —হ্যাঁ নিচ্ছি। এই তো আমার একমাত্র ওষুধ। মিঃ ক্লার্ক উত্তর দিল। জ্যান কোগানের মতই একই সমাজে সেও মেলামেশা করে।

মিঃ কোগান তারপরে পেছনের দিকে একটা লাজুক লোকের দিকে কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল-আরে জোসেফ পুয়োরগ্রাস! —তুমি একটুও নিচ্ছ না —ওর স্বভাব এত বিনয়ী—বলল জ্যাকব স্মলবেরী-শুনলাম তুমি নাকি আমাদের মিস্ট্রেসের মুখের দিকে তাকাতে পার না।

সকলের কৃপা ও তিরস্কার মিশ্রিত দৃষ্টি জোসেফের উপর গিয়ে পড়ল।—না, আমি ওঁর দিকে কোনদিন তাকাই নি। উত্তর দেওয়ার সময়ে জোসেফের শরীরটা আরও কুঁকড়ে গেল-যেন তাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।—তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই, আমার কেমন লজ্জা করে।

মিঃ ক্লার্ক বলল, বেচারা!

—মানুষের বিচিত্র স্বভাব। —বলল জ্যান কোগান।

জোসেফ পুয়োর গ্রাস-এই লজ্জিত হওয়াটা তার একটা দুরারোগ্য দোষ বলে জানলেও, এখন এ'টা এদের আলোচনার বিষয় হওয়াতে একটা মৃদু আত্মতুষ্টি অনুভব করল, বলল-হ্যাঁ, কেন জানি না, উনি আমার সঙ্গে কথা বললে, আমার প্রতি মুহূর্তে ভয়ানক লজ্জা লজ্জা মনে হয়।........

জ্যাকব অনেক চিন্তা টিন্তা করে বলল—এটা তোমার পক্ষে খুব খারাপ, বুঝলে জোসেফ! দেখ শেফার্ড, মেয়েদের পক্ষে এটা ভাল হতে পারে কিন্তু কিন্তু পুরুষের পক্ষে খুব ক্ষতিকর।

গ্যাব্রিয়েল যেন এক গভীর চিন্তা থেকে উঠে বলল—হ্যাঁ ক্ষতিকরই বটে। —আর ও খুব ভীতুও বটে। বলল জান কোগান। একদিন ইয়ালবেরী থেকে কাজ করে ফেরার পথে ও বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

—না, না, সে কথা এখন থাক। জোসেফ তার লজ্জা ঢাকবার জন্ত জোর করে মুখে হাসি এনে বলল।

—সত্যি সত্যিই ও নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। জ্যানকোগান খুব স্বাভাবিকভাবে বলে যেতে লাগল, যেন ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহের

অবকাশ নেই।—মাঝ রাত্তিরে আসতে আসতে ও এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে বনের মধ্যে বলতে লাগল—একটা লোক হারিয়ে গেছে, একটা লোক হারিয়ে গেছে—সেই সময়ে গাছের ডালে বসে এক পেঁচাও চেঁচাচ্ছিল—হু, হু হু! পেঁচারা যেমন ডেকে থাকে। এখন বুঝলে শেফার্ড! (গ্যাব্রিয়েল মাথা নাড়ল) জোসেফ ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল—

স্যার, আমি ওয়েদারবেরীর জোসেফ পুয়োর গ্রাস, স্যার! আমি ওয়েদারবেরীর জোসেফ।

—না, না না—এ তুমি অনেক বাড়িয়ে বলছ। ভীতু লোকটা মুহূর্তে যেন খুব সাহসী হয়ে উঠল—আমি কক্ষনো স্যার বলিনি। সত্যি যেটা সত্যি—আমি কক্ষনো পাখিটাকে স্যার বলি নি, কারণ আমি ভাল করেই জানতাম যে ঐ জায়গায় ঐ রাত্তিরে কোনও ভদ্রলোক যেতে পারে না। আমি ওয়েদারবেরীর জোসেফ পুয়োর গ্রাস।

—যাইহোক্ তুই খুব ভিতু। জোসেফ! কেন আর একবার তুই ল্যাম্বিং ডাউন গেটের কাছে হারিয়ে গিছলি না?

হ্যাঁ। এই উত্তরটাও সে খুব বিনীতভাবে দিল।

—সেও মাঝরাত্তিরে। যতই চেষ্টা করে গেট তো কিছুতেই খোলে না-শেষপরে ও ভাবল এ ঠিক ডেভিলের কাজ—আর অম্নি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

—হ্যাঁ। আগুনের তাপে, পানীয়ের উত্তেজনায় আর এতক্ষণ গল্প শুনে জোসেফ যেন একটু আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে-আমি তো তখন ভেতরে ভেতরে মরে গেছি। হাঁটু গেড়ে বসে আমি তখন বাইবেল থেকে একে একে আবৃত্তি করে গেলাম। টেন কম্যাণ্ডমেণ্ট পর্য্যন্ত করেও গেট খোলে না তখন আরম্ভ করলাম—'ডিয়ারলি বিলাভেড ব্রেথরেন'—আমি ভাবছি এইতো শেষ, আর তো আমার মুখস্থ নেই আমি তো তাহলে শেষ। সেয়িং আফটার মি 'পর্য্যন্ত' যখন এসেছি-গেটটা খুলে গেল-একদম সবটা—

কিছুটা সময় চুপচাপ কেটে গেলে পর, গ্যাব্রিয়েলই নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করল—আচ্ছা তোমাদের জায়গাটা বাস করার পক্ষে কেমন, আর এই মিষ্ট্রেসই বা কেমন? প্রশ্নের গূঢ় অর্থ যেহেতু অন্য ছিল, সকলের অলক্ষ্যে গ্যাব্রিয়েলের বুক ধুক ধুক করতে লাগল।

—আমরা ওঁর সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি—কিছুই না। ওই তো কাকার

অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লে উনি এখানে এলেন—ডাক্তারে কিছু করতে পারলে না। তবে আমার মনে হয় ও ফার্ম চালাতে পারবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফ্যামিলিটা ওদের খুব ভাল, জ্যান কোগান বলল—আমি তো সারা জীবনই ওদের কাজ করলাম। ওর কাকাও ছিলেন ভারী ভদ্দর লোক, তুমি চিনতে নাকি শেফার্ড? এক ব্যাচিলার ভদ্দর লোক?

—না।

—আমার প্রথমা স্ত্রী শার্লট ওঁর বাড়ীতে গরু দোয়াতো—তা আমি প্রায়ই দেখা করতে যেতাম আর গেলেই যত খুশী মদ খেতাম, অবশ্যি এই পেটে করে ছাড়া আনতে দিত না। ভারী স্থন্দর তার সোয়াদ—আমিও অভদ্রের মত খালি বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে খেতাম না—ভদ্দর লোকের উদারতার দাম দেওয়ার জন্যে একেবারে পেটটি ভরে।

—হ্যাঁ ঠিকই করতে মিঃ কোগান। মার্ক ক্লার্ক সায় দিল!

—তাই আমি বেশ কিছু নোনতা মাছ খেয়ে একেবারে চুনো পাথরের মত শুকনো হয়ে গিয়ে হাজির হতাম—মদটা যখন গলা দিয়ে নামত—একেবারে মিষ্টি যেন মধু, আহা সে সব স্থখের দিন ছিল। মনে পড়ে জ্যাকব তুমিও মাঝে মাঝে যেতে আমাব সাথে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব। জ্যাকব উত্তর দিল।—আর একদিন আমরা দু'জনে সেই বাক্স হেড এ মনে পড়ে—

—ওঃ সে কি খিস্তিরে ভাই—

—খিস্তি খেউরেরও দরকার আছে জীবনে। সরাইওয়ালা বলল—মাঝে মাঝে ও সব না হলে মজুরের স্বভাব চরিত্র ঠিক থাকে না।

—শার্লট কিন্তু একটিও খিস্তি পছন্দ করত না! ও হো হো মরে হয়তো সে স্বর্গে হয়তো বা নরকেই গেছে, বেচারী।

গ্যাব্রিয়েল আলোচনার গতি পাল্টানোর জন্যে বললে—তোমরা কেউ মিস এভার্ডিনের বাবা মাকে দেখেছ?

—আমি একটু একটু জানতাম। বলল জ্যাকব স্মলবেরী—ওঁরা শহরে থাকতেন। এখানে কখনও বাস করেন নি—বহুদিন হল মারা গেছেন, আচ্ছা বাবা! কি রকম লোক ছিলেন ওঁরা?

—ঐ কেমন আর। সরাইওয়ালা বলল—ওর বাবাকে দেখতে বিশেষ ভাল ছিল না—কিন্তু ওঁর মা খুব স্থন্দরী ছিলেন। ভদ্রলোক স্ত্রীকে ভালবাসতেন খুব।

—আমি শুনেছি যে দিনে কয়েকশ বার নাকি চুমু খেত। বলল জান কোগান। আর রাতে তিনবার অন্ততঃ বাতি জ্বালিয়ে তার রূপদর্শন করত।

—অপরিসীম প্রেম। বিশ্ব সংসারে এমন দেখা যায় না—জোসেফ পুয়োর গ্রাস তার নীতি বোধের জন্যে একটু ভারী ভারী কথা বলতে ভালবাসত…

গ্যাব্রিয়েল প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের জন্য বলল—আপনার ছেলেরাও যখন এত বুড়ো হয়ে গেছে তখন সরাইওয়ালা নিশ্চয়ই খুব প্রাচীন লোক।

—বাবার এত বয়স হয়েছে যে উনি নিজেই ওঁর বয়স জানেন না, তাই না বাবা? বলল জ্যাকব স্মলবেরী—শেফার্ডকে তোমার বংশ পরিচয়টা একবার শুনিয়ে দাও।—হ্যাঁ, বলুন। গ্যাব্রিয়েল যেন কয়েক মাস ধরে এই গলা শোনার জন্য অপেক্ষা করে আছে—আচ্ছা কত হবে আপনার বয়স?

সরাইওয়ালা খুব ভাল করে গলা খাঁকারি দিল—অনেকক্ষণ ছাইদানের দিকে তাকিয়ে থাকল। ভাল গল্প শুনতে গেলে এসব কিছু কিছু কায়দা কানুন সহ্য করতে হয়। তারপরে বলল—আমার ঠিক কবে জন্ম হয়েছে বলতে পারব না! তবে আমি কোন জায়গায় কতবছর কাটিয়েছি তা বলতে পারি। উত্তরের দিকে দেখিয়ে বলল, ঐতো আপার লং পাডলে ছিলাম আমি এগারো বছর বয়স পর্যন্ত (তারপব পূর্বের দিকে তাকিয়ে) কিংস বিয়ের সাত বছর—ওখানেই সেই শিখলাম মদ তৈরী। তারপর গেলাম নরকুম্বে—সেখানে বাইশ বছর মদ তৈরী করেছি—আর খামারেব কাজ করেছি। মাস্টার উক! তোমার জন্মের বহু বছর আগে আমি সেখানে কাটিয়ে এসেছি। (ওক একটু সরল বিশ্বাসের হাসি হাসল) তারপর চার বছর ছিলাম ডার্ণওভারে আর চোদ্দ বার এগার মাস করে ছিলাম মিল পণ্ড সেণ্ট জুডস এ কারণ বুড়ো টুইলস কখনও আমাকে এগার মাসের বেশী কাজ দিত না। তারপব তিন বছর মেলষ্টকে আর একত্রিশ বছর আছি এই এখানে—কত হল?

—একশ সতের। আর একজন বুড়ো পেছন থেকে বলে উঠল। সে এতক্ষণ কথা বার্তায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করে নি। মানসাঙ্ক কষে মুহূর্তে বলে দিল বয়স।

—তাহলে ঐ হ'ল আমার বয়স। বলল সরাইওয়ালা।—না বাবা! তুমি খামারে কাজ করেছ গরমকালে আর মদ তৈরী করেছ শীতকালে তাহলে ওটা ডবল ধরলে হবে কেন?

—বাঃ রে। তাহলে গরমকালে আমি বেঁচেছিলাম তো নাকি? এই কথার উত্তর দাও। এর পরে তো বলবে আমার মোটেই বয়স হয় নি।

—না, নিশ্চয়ই না, গ্যাব্রিয়েল তাকে আশ্বস্ত করল।

—না, না, তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। জ্যান কোগান সায় দিল। আর এই বয়সেও তোমার শরীর এখনও বেশ শক্ত। তাই কিনা?

সরাইওয়ালা এবার খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে স্বীকার করল যে ঐ মদের কাপটা তার থেকেও বয়সে তিন বছরের বড়।

কাপটা দেখতে দেখতে, গ্যাব্রিয়েলের পকেটে বাঁশিটা দেখা গেল। হেনরি ফ্রে অমনি বলে উঠল—ক্যাষ্টারব্রিজের মেলায় আমি নিশ্চয় তোমাকেই দেখেছি বাঁশি বাজাতে।

—হ্যাঁ। গ্যাব্রিয়েল লজ্জার সঙ্গে বলল। আমি এ কাজও করেছি। সময়টা এখন খুব খারাপ যাচ্ছে। এত গরীব আমি ছিলাম না কখনও।

—আরে সেজন্য কি আছে। মার্ক ক্লার্ক বলল, ও তে কখনও ঘাবড়াবে না। আবার ভাল সময় আসবে। কিন্তু তুমি যদি খুব ক্লান্ত না হ'ও তাহলে আমরা তোমার বাঁশি একটু শুনতাম।

ওক তখন খুব যত্ন করে জকি টু দি ফেয়ার বাজাল—শরীরটা কখনও সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে আর পায়ে তাল দিতে দিতে।

—সত্যি খুব ভাল বাজাতে পারে। বলল একজন—তার নিজের কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না তাই, লোকে তাকে সুসান টলের বর বলে ডাকত।

—লোকটা সত্যি গুণী লোক। আমরা যে এই রকম একজন শেফার্ড পেয়েছি—এ আমাদের ভাগ্য। আস্তে আস্তে বলল জোসেফ পুয়োরগ্রাস।

হেনরি ফ্রে বলল—তোমার মুখটা আমার এখন বেশ মনে পড়ছে। ক্যাষ্টারব্রিজে তোমাকেই বাজাতে দেখেছিলাম—মুখটা এতবড় ফোলান—আর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে—

—সত্যি বাঁশি বাজানোর সময়ে মানুষের মুখটা যে এত বিশ্রী দেখায়—এটা একটা দুঃখের কথা—বলল মার্ক ক্লার্ক।

জোসেফ গ্যাব্রিয়েলের কানে কানে বলল—তুমি কিছু মনে করলে না তো, ওরা তোমাকে এইভাবে ভেংচি কাটল।

—না, না, একটুও না। ওক উত্তর দিল।

—তোমার স্বভাবটা খুব সুন্দর। জোসেফ পুয়োরগ্রাস খুব মধুমাখা স্বরে বলল।

—হ্যাঁ শেফার্ড। সত্যি তাই। সকলে একবাক্যে স্বীকার করল।

ওক তাদের ধন্যবাদ দিল আর মনে মনে ভাবল বাথশেবার সামনে সে কোনদিন বাঁশী বাজাবে না।

সুসান টলের বর বলল—তুমি এখন আর বাজিও না, শেফার্ড! তাহলে আমি শুনতে পাব না। আমি খুব দুঃখ পাব তাহলে।

—কেন তোমার এত তাড়া কিসের লাবান ? তুমি তো আগে অনেকক্ষণ থাকতে। প্রশ্ন করল জ্যান কোগান।

—আমি নতুন বিয়ে করেছি না। তাই—

—এখন বুঝি নতুন প্রভু, নতুন আইন।

সুসান টলের বর এই ঠাট্টায় কিছু মনে না করে হা হা করে হাসল। তারপর উঠে চলে গেল।

তারপর উঠে গেল হেনরি ফ্রে। জ্যান কোগান গ্যাব্রিয়েলকে রাত্রে শোয়ার জায়গা দিতে চেয়েছিল। তারাও উঠে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে বাকী যারা ছিল তারা যখন উঠতে যাচ্ছে, তখন ফ্রে দৌড়ে ফিরে এল। সে চারিদিকে দেখে জোসেফ পুয়োরগ্রাসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মুখে আঙ্গুল দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জোসেফ প্রশ্ন করল—কি হয়েছে, কি হয়েছে হেন্‌রি ?

জ্যাকব আর মার্ক ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার হেন্‌রি ?

—আমি আগেই বলেছিলাম, বেলিফ বেটা পেনিওয়েজ—

—কি হয়েছে। কিছু চুরি করেছে ?

—চুরিই করেছে। মিস্ এভার্ডিন শোয়ার আগে ঘুরতে গিয়ে দেখেন যে ও ও আধমনটাক বার্লি নিয়ে একটা গোলা থেকে নেমে আসছে···উনিও ঠিক বিড়ালের মত পিছু তাড়া করেছেন, দরজা সব বন্ধ তো—উনি যদিও সাধারণতঃ এরকম করেন না—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর—

—তারপর ওকে তাড়া করে ধরে ফেলেছেন। বেটা স্বীকার করেছে সে আরও পাঁচ বস্তা সরিয়েছে। এখন কথা হ'ল এরপরে কে বেলিফ হবে ?—বলে সে এক কাপ মদ শেষ করে ফেলল। এমন সময়ে সুসান টলের বর এল ছুটতে ছুটতে—পাড়ার খবর শুনেছ তোমরা সবাই ?

—বেলিফের ব্যাপারে তো ?

—তা' ছাড়া ?

—না, কিছু না—লাবান টলের বুকের দিকে তাদের দৃষ্টি—যেন পারলে, গলার মধ্য দিয়ে ঢুকে সেই অব্যক্ত সংবাদটা এখনই জেনে নেয়।

—কি ভয়ঙ্কর রাত্রি। জোসেফ পুয়োর গ্রাস বলল।

—মিস এভার্ডিনের কাছে যে বাচ্চা মেয়েটা থাকত সেই ফ্যানি রবিনকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে সে নেই—এখন, ওকে বাইরে রেখে কি করে ওরা দোর দেয়? এমন কিছু ভাবনা করার ছিল না। কিন্তু মেরিয়ান বলছে মেয়েটা নাকি দু'তিন দিন যাবৎ খুব মনমরা ছিল।

—ও পুড়ে গেছে, পুড়ে গেছে। বলল জোসেফ পুয়োর গ্রাস।

—না ডুবে গেছে। বলল টল।

—আমাদের শুতে যাওয়ার আগে, মিস এভার্ডিন আমাদের দু'একজনের সাথে কথা বলতে চান। এই বেলিফ আর মেয়েটার ঝামেলায়, ম্যাডাম-এর মাথা প্রায় খারাপ হওয়ার জোগাড়।

সকলেই তারা খামার বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল—কেবল বুড়ো সরাইওয়ালা লাল, পাণ্ডুর চোখে আগুনেব দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

বাথশেবার শোয়ার ঘরের জানালা দিয়ে সাদা পোষাকপরা অবস্থায় তার মাথা দেখা যাচ্ছিল। সে মুখ বাড়িয়ে বলল—তোমাদের মধ্যে আমার লোকজন কেউ আছে নাকি?

—হ্যাঁ, ম্যাডাম, আমরা সবাই আছি। সুসান টলের বর উত্তর দিল।

—কাল সকালে আশেপাশের গ্রামে, তোমাদের মধ্যে দুতিনজন খবর নেবে, তারা কেউ ফ্যানি রবিনকে দেখেছে কিনা? বেশী হৈ চৈ করো না—এখনও ভয় পাওয়ার মত কিছু হয় নি, আমরা যখন আগুন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তখনই বোধহয় সে কেটে পড়েছে।

—আচ্ছা, ম্যাডাম, এই পাড়ার কোনও ছেলের সঙ্গে ও আজকাল মেলামেশা করছিল কি?—জিজ্ঞাসা করল জ্যাকব স্মলবেরী।

—আমার তো জানা নেই,—বাথশেবা উত্তর দিল।

—না সে রকম কিছু আমরা শুনি নি—দুতিনজনে বলল।

—না সেরকম হলে—বাথশেবা বলে চলল—ছেলেটা নিশ্চয়ই একবার, দুবার এখানে আসত। যেটা ভয় পাওয়ার মত ব্যাপার তা হলো মেরিয়ান তাকে কেবলমাত্র ঘরেপরা কাপড়জামা পরে বাইরে যেতে দেখেছে—এমনকি একটা চাদরও নেয় নি।

—হ্যাঁ. বুঝতে পেরেছি। আপনি বলতে চান, কোন মেয়েই ভাল পোষাক না পরে ছেলে বন্ধুর সাথে দেখা করতে যায় না—জ্যাকব স্মলবেরী তার অতীত অভিজ্ঞতা মনে করার চেষ্টা করল—ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম।

পাশের এক জানালা থেকে, আর একটি গলা শোনা গেল, বোঝা গেল মেরিয়ানের—আমার মনে হ'ল ওর সঙ্গে একটা বোঝা ছিল—আমি ঠিক দেখতে পেলুম না। কিন্তু এখানে ওর কোনও ছেলে বন্ধু নেই। সে একজন আছে ক্যাস্টারব্রিজে—এক সোলজার।

বাথশেবা জিজ্ঞাসা করল—তার নাম কি ?—

—জানি না তো, ও কোনদিনও বলত না।

—আমি ক্যাষ্টারব্রিজে ব্যারাকে গেলে হয়তো খুঁজে বের করতে পারব—বলল উইলিয়াম স্মলবেরী।

—ঠিক আছে। কালকেও যদি না ফেরে তাহলে তুমি ক্যাষ্টারব্রিজে গিয়ে সেই লোকটিকে খুঁজে বের করে, তার সঙ্গে দেখা করবে। আমার ভয় হয় মেয়েটার আত্মীয়স্বজনকে কি বলব—আশা করি কোনও বদলোকে তার সর্বনাশ করে নি।—তারওপর আবার এই বেলিফের ঝামেলা—থাক আমি আর এখন কথা বলতে চাই না। তাহলে যেমন বললাম, কর—বলে বাথশেবা তার জানালা বন্ধ করে দিল।

—ঠিক আছে মিস্ট্রেস, তাই হবে। বলে সকলে চলে গেল।

সেই রাত্রিতে, কোগানের বাড়ীতে, নিমীলিত চোখে গ্যাব্রিয়েল ওক কল্পনার পাখা মেলে দিয়েছিল—বরফ ঢাকা নদীর তলা দিয়ে যেমন অবিরত ধারা বয়ে যায়, চোখ বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে কত কথাই ভাবছিল গ্যাব্রিয়েল। রাত্তিরেই সে বাথশেবার কথা চিন্তা করত বেশী—এখন এই অলস অনুভূতিতে তার মানস প্রতিমা গড়ে তুলল মনে মনে। কল্পনার আনন্দ অবশ্যই অনিদ্রার বেদনার পরিপূরক নয়—কিন্তু আজ রাত্রে ওকের মনে হচ্ছিল, বাথশেবার সঙ্গে পুনরায় দেখা হয়েছে এতেই সে তার সব দুঃখ ভুলে যেতে পারে।

এখন সে সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে ফেলল—নরকুম্ব থেকে তার টুকিটাকি জিনিষপত্র ও বইগুলো নিয়ে আসতে হবে। ইয়ং ম্যানস্ বেষ্ট কম্প্যানিয়ন, ফারিয়রস্ শিওর গাইড, দি ভেটেরিনারি সার্জন, প্যারাডাইস লস্ট, পিলগ্রিমস প্রগেস, রবিনসন ক্রুশো, অ্যাশ এর ডিকশনারি এবং ওয়াকিং গেমের পাটীগণিত—এই নিয়েছিল তার লাইব্রেরী। এই বই কটা পড়েই কিন্তু তার

যথার্থ জীবনবোধ গড়ে উঠেছিল, যা অনেক এক মাইল লম্বা লাইব্রেরীওয়ালার নেই।

॥ ৯ ॥

সকাল হলে মনে হ'ল গ্যাব্রিয়েলের নতুন মনিব বাথশেবা এভাডিনের বাড়ীটা পুরনো ধাঁচের, আদপেই খামার বাড়ীব মত তৈরী নয়। আসলে বাড়ীটা আগে অন্য উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হ'ত—কিন্তু পবে কেউ এটাকে কিনে খামার বাড়ী করে রূপ দিয়েছেন।· ·

এই সকালেই ওপরের তলায় একটা ঘরে খুব প্রাণবন্ত কিছু কথোপকথন শোনা যাচ্ছিল। ভাল শক্ত ওক কাঠের সিঁড়ি—পুরনো হ'লেও বোঝা যায় যে বাড়ীটার দরজা জানালাও বেশ দামী কাঠের। বাথশেবার সঙ্গে লিডি স্মলবেরীর কথাবার্তা হচ্ছিল, লিডি বাথশেবার বান্ধবীও বটে আবার বেতনভুক কর্মচারীও বটে। তাবা মেঝের উপর বসে--চতুর্দিকে কাগজ, বই. বোতল গৃহস্থালীর নানা এটা-ওটা ছড়ানো। সরাইওয়ালাব নাতির মেয়ে লিডি, বাথশেবার সমবয়সী. মুখখানা তাব সাধারণ গ্রাম্য মেয়ের মত হলেও চলনে বলনে সে বেশ চালাক-চতুর। আধ ভেজানো দরজা দিয়ে বাইরে ঝাঁট দেওয়ার ফবর ফরর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। একখানা গোল চাকার মত মুখ কুৎসিত মেরিয়ান ঝাঁট দিচ্ছিল।

—ঝাঁটাটা একটু থামাও তো, একটা যেন কি শোনা যাচ্ছে—বাথশেবা বলল। মেবিয়ান ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করল।

একটা ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। আওয়াজটা আস্তে আস্তে আঙ্গিনা পার হয়ে ভেতর বাড়ীর দরজায় এসে থামল।

—কি অসভ্য! লিডি আস্তে আস্তে বলল।—একেবারে বাড়ীর মধ্যে চলে এসেছে! হায় ভগবান! টুপি দেখে তো মনে হচ্ছে ভদ্দরলোক!

—চুপ কর। বলল বাথশেবা।

লিডি আর কথা না বলে, অঙ্গভঙ্গী করে ভাব প্রকাশ করতে লাগল।

—মিসেস কোগান! সদর দরজার দিকে যাও না—বলল বাথশেবা। দরজায় আবার ঠক্ ঠক্ ঠক্ আওয়াজ শোনা গেল। বাথশেবা আবার বলল—মেরিয়ান. যাও।

—ও ম্যাডাম, দেখ, জঞ্জাল গাদা হয়ে আছে।—মেরিয়ানের দিকে তাকিয়ে

তার যুক্তিকে অস্বীকার করা গেল না।

—তাহলে লিডি তুই যা।

লিডি দুই হাতে ধুলো ঝেড়ে মিষ্ট্রেসের দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে রইল। বাথশেবা বলল—থাক্, ওই যে মিসেস কোগান যাচ্ছে।

দরজা খোলা হ'লে একটা ভাবিক্কী গলা শোনা গেল,—মিস্ এভার্ডিন কি বাড়ী আছেন?

মিসেস কোগান—আমি দেখছি স্যার—বলে পরমুহূর্তেই ঘরে এসে ঢুকল—কি আপদ! আমি পুডিং তৈরী করতে বসলেই হয় আমার নাক চুলকুবে না হ'লে কাউকে দরজা খুলে দিতে হবে। মিস্ এভার্ডিন! মিঃ বোল্ডউড আপনাকে ডাকছেন।

মেয়েদের পোষাকও যেহেতু তাদের চেহারার অঙ্গ, বাথশেবা তৎক্ষণাৎ বলল—এ অবস্থায় আমি কি করে দেখা করব।

ওয়েদারবেরীর লোকেরা 'বাড়ী নেই' বলতে খুব অভ্যস্ত নয়—তাই লিডি পরামর্শ দিল—বলে দাও তুমি এখন ধুলোবালি ঝাড়ছ। তাই নীচে যেতে পারবে না।

মিসেস কোগান চিন্তা করে বলল—হ্যাঁ সেই ভাল।

—বলে দাও আমি এখন দেখা করতে পারছি না—এই যথেষ্ট। মিসেস কোগান নীচে গিয়ে এই সংবাদ ছাড়াও নিজ দায়িত্বে আরও জুড়ে দিল—মিসেস এখন শিশি বোতল পরিষ্কার করছেন—অতএব—

—ও আচ্ছা, আমি একটু জানতে এসেছিলাম—ফ্যানি রবিনের কোনও খবর পাওয়া গেছে কিনা?

—না স্যার। তবে আজ রাত্রে পাওয়া যেতে পারে, উইলিয়ম স্মলবেরী ক্যাষ্টারব্রিজ গেছে তার ছেলে বন্ধুর কাছে খোঁজ করতে।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

—মিঃ বোল্ডউড কে?—বাথশেবা জিজ্ঞাসা করল।

—লিটল ওয়েদারবেরীর ফার্মার।

—বিবাহিত?

—না মিস্।

—কিরকম বয়েস?

—চল্লিশ হবে বোধ হয়—সুন্দর চেহারা—বেশ শক্ত গড়ন—আর পয়সাও

আছে

—ওঃ এই ঝুলঝাড়া এক ঝঞ্ঝাট। সব সময় একটা না একটা ঝামেলা লেগে আছে। বাথশেবা অভিযোগের স্বরে বলল—কিন্তু তাঁর ফ্যানির খোঁজে কি দরকার?

—কারণ ফ্যানির কেউ ছিল না তো। উনিই মানুষ করেছিলেন—স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। তারপর তোমার কাকার এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন লোকটা খুব দয়ালু, কিন্তু· ·।

—কি!

—মেয়েদের কাছে উনি শুষ্কং কাষ্ঠং। ছ' সাতটা মেয়ে ওঁকে প্রেমনিবেদন করেছিল—সব কটা মেয়েই ভাল, ভদ্র ঘরের। জেন পার্কিনস তো দুমাস ওঁর কাছে দাসীর মত কাজ করেছে—আর টেলররা দুইবোন একবছর করে ঘুরেছে—ফার্মার ইভস এর মেয়েকেও কি উনি কম কাঁদিয়েছেন।

—এমন সময় একটা বাচ্চা ছেলে ছুটতে ছুটতে এদিকে এল। ছেলেটি কোগানদের বাড়ীর। সে সুর করে বলছিল—আমি একটা পেনি পেয়েছি।

—আরে—কে দিল তোকে? টেডি! লিডি বলল।

মিস—টা—র·· বোল্ড ··· উড্! গেট খুলে দেওয়ার জন্যে দিয়েছে আমাকে।

কি বলল?

—বলল—কি হে ভদ্দরলোক কোথায় যাচ্ছ! আমি বললাম—মিস এভার্ডিনের কাছে। তা বলল—উনি খুব লাজুক মেয়ে না? আমি বললাম হ্যাঁ।

—এই দুষ্টু ছেলে—কেন বললি ও কথা।

—উনি আমাকে পেনিটা দিলেন তাই।

—ওঃ! আচ্ছা মুস্কিলেই পড়েছি—বাথশেবা যেন অসন্তুষ্টির সঙ্গে বলল। —যাও মেরিয়ান ঝাঁট দাও গে, না হয় যা খুশী কর। বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ী যাও, আমাকে আর জ্বালিও না।

—হ্যাঁ ম্যাডাম! চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু গরীব বর আমার পছন্দ হ'ল না—আর পয়সা ওলারা আমাকে পছন্দ করল না। তাই আইবুড়ো থেকে গেলাম।

সবাই চলে গেলে লিডি সাহস করে জিজ্ঞাসা করল—তোমাকে কেউ কোন-

দিন বিয়ে করতে চেয়েছে ম্যাডাম! অনেকেই নিশ্চয়ই?

বাথশেবা যেন উত্তর দেবে না ভেবে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। কিন্তু হ্যাঁ; বলার লোভ সামলাতে পারল না। খুব অভিজ্ঞভাবে বলল—একবার একজন চেয়েছিল। বলার সঙ্গে সঙ্গে ফার্মার ওকের চেহারা মনে পড়ে গেল বাথশেবার।

—কি মজা! কিন্তু তুমি তাকে চাও নি?

—সে আমার ঠিক উপযুক্ত ছিল না।

ওঃ, আমারও ইচ্ছে করে। কাউকে এইরকম বলি যে, তোমাকে আমার সঙ্গে মানায় না। অথবা—আমার পায়ে চুমু খেতে পার, মুখে নয়। মিস্ তুমি তাকে ভালবাসতে?

—ন, না—তবে খানিকটা পছন্দ করতাম।

—এখনও কর?

—একদম না···কাদের যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে—

লিডি পিছনের একটা জানলা দিয়ে উঠোনের দিকে তাকিয়ে দেখল, গাঁয়েব সব পুরুষ ও দু'একজন মেয়ে এদিকে আসছে দল বেঁধে। বলল—ভূতগুলো সব এসে পড়েছে।

—ঠিক আছে, মেরিয়ান, ওদেরকে বল হল ঘরে বসতে। আমি জামা-কাপড় ছেড়ে আসছি।

॥ ১০ ॥

আধঘণ্টাটাক পরে বাথশেবা পাট করা পোষাক পরে, লিডির সাথে হলঘরে এসে ঢুকল—তার লোকেরা তখন মেঝেতে ইতঃস্তত বসে। বাথশেবা একটা টেবিলের উপরে বসে, কলম হাতে নিয়ে, হাজিরা খাতা খুলল। ক্যানভাসের একটা ব্যাগ থেকে একগাদা পেনি, সিকি, আধুলি ঢালল টেবিলের উপরে। লিডি পাশে বসে সেলাই করছিল—কখনও বা তার অন্তরঙ্গতা দেখানোর জন্যে একটা আধুলি নিয়ে নেড়েচেড়ে মুদ্রাটির শিল্পগুণ দেখছিল।

—বাথশেবা বলল—শুরু করার আগে, তোমাদের আমি দুটো কথা বলে নিই—বেলিফকে আমি চুরি কবার জন্যে তাড়িয়ে দিয়েছি, আব এর পর থেকে আমি নিজেই সমস্ত কাজ দেখাশুনা করব।

লোকগুলো যেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে শ্বাস নিল।

—আর দ্বিতীয় কথা হল, তোমরা কেউ কি ফ্যানির কোনও খবর পেয়েছ ?

—কিছু পাইনি ম্যাডাম।

—চেষ্টা করেছিলে কি ?

—আমি ফার্মার বোল্ডউডের সঙ্গে দেখা করেছিলাম।—বলল জ্যাকব স্মলবেরী—তাঁর দুজন লোকের সঙ্গে আমি নিউমিলের পুকুরটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।

—আমাদের নতুন শেফার্ড ইয়ালবেরীর কাছে 'বাকস হেডে' গিয়েছিল খোঁজ করতে—কিন্তু কেউ তাকে দেখে নি। লাবান টল বলল।

—উইলিয়ম স্মলবেরী কি ক্যাষ্টারব্রিজে যায় নি ?

—হ্যাঁ ম্যাডাম। এখনও ফেরে নি। ছটা নাগাদ ফিরবে বলেছে।

বাথশেবা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল—ছটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকী। আচ্ছা, তাহলে—সে বই খুলল—জোসেফ পুয়োরগ্রাস, আছে এখানে ?

—হ্যাঁ স্যার··· থুড়ি··· ম্যাডাম· আমার নাম পুয়োরগ্রাস।

—তুমি এখানে কি কর ?

—আমি সারা বছর গাড়ী চালাই—আর বীজ ফেলার সময় হলে পাখী টাখী তাড়াই, শুয়োর খেদাই।

—কত ? তোমার ?

—এই কত আর ! নয় শিলিং, আর যদি একটা আধপেনি দেন—

—এই নাও। আমি নতুন এসেছি, তাই আরও কিছু দিয়ে একেবারে দশ শিলিং।

বাথশেবা জনসমক্ষে তার এই উদারতার জন্যে একটু হেসে ফেলল। হেনরি ফ্রে আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে যেন পুরোটা পর্য্যবেক্ষণ করছিল।

—তুমি কত পাবে ?—ঐ যে ঐ কোণে বসে আছ—কি তোমার নাম ?

—ম্যাথু মুন, ম্যাডাম !—একটা জামা প্যাণ্ট যেন উঠে দাঁড়াল, রোগা লিকলিকে—পা ফেলছে মনে হচ্ছে দুলে দুলে।

—ম্যাথু মার্ক—কি বললে ?—জোরে বল, আমি তোমাকে মারব না।

—ম্যাথু মুন, মেম—হেনরি ফ্রে শুধরে দিল। তখন সে বাথশেবার চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বাথশেবা খাতার দিকে তাকিয়ে বলল—ম্যাথুমুন, তোমার নামে দেখছি,

দশ শিলিং আর আড়াই পেনি লেখা আছে।

—হ্যাঁ ম্যাডাম। ম্যাথু বলল, যেন শুকনো পাতায় হাওয়া বয়ে গেল।

—এই নাও। এবারে এ্যাণ্ড্রু র‍্যাণ্ডল—তুমি দেখছি নতুন লোক—আগের চাকুরী ছেড়ে এলে কেন?

—প, প প্, প্, প্ল প্ল প্ল প্লীজ ম্যাম, প্ল প্ল প্ল প্ল প্লীজ ম্যাম। প্লীজ ম্যাম প্লীজম্, প্লীজম্।

—ও তোতলা মেম—হেনরি ফ্রে বলে দিল—ওই জন্যে ওকে আগের ফার্ম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু গালাগালি দেওয়ার সময় ও তোতলায় না।

—এ্যাণ্ড্রু র‍্যাণ্ডল, এই নাও তোমার। এখন একদিন কি দুদিন ধরে আমাকে ধন্যবাদ দাও। টেম্পারেন্স মিলার—আর আরেকজন, সোবার্নেস দুজনেই মেয়েছেলে মনে হচ্ছে—

—হ্যাঁ ম্যাম্—এই যে আমরা।

—তোমাদের কি কাজ?

—আমরা বিচালি আঁটি বাঁধি আর হুস করে মুরগী তাড়াই।

—ও আচ্ছা! মেয়েগুলো ভালো তো? সে হেনরিকে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল।

—ও ম্যাডাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। ঐ সব মেয়ের আবার স্বভাবচরিত্র—

হেনরি বলল মুখ বেঁকিয়ে। বাথশেবার ইঙ্গিতটা ভাল লাগল না। সে গম্ভীরভাবে বলল—

—যাও বসো গে।

—কে ম্যাডাম?

—বসো বলছি।

পেছনের দিকে বসে জোসেফ পুয়োর গ্রাস ভাবল—ভীষণ কিছু একটা ঘটে গেছে—ভয়ে তার তালু শুকিয়ে যাচ্ছিল। হেনরি এককোণে সরে গেল।

—আচ্ছা এবারে, লাবান টল—তুমি এখানে কাজ করবে তো?

—করবে না, কোথায় যাবে?—পেছন থেকে একজন মহিলা বলল।

—কে এই মেয়েটি? বাথশেবা জিজ্ঞাসা করল।

—আমি ওর বৌ, আবার কে?—এই মেয়ে লোকটি নিজের বয়স বলত পঁচিশ, দেখাত তিরিশ, পঁয়ত্রিশও বলা যায় আর প্রকৃত বয়স ছিল চল্লিশ।

—ও তুমি,—বলল বাথশেবা—আচ্ছা লাবান তুমি থাকবে তো ?

—হ্যাঁ থাকবে ম্যাডাম।—লাবানের বিয়ে করা বৌ বলল।

—আমার মনে হয় ও নিজেই সে কথা বলতে পারে।

—হায়রে কপাল! ও কিছুই পারে না ম্যাডাম—বৌটা উত্তর দিল।

পার্লামেণ্টের নির্বাচন প্রার্থীর মত নির্লজ্জ ছিল বলে লোকটা হে-হে-হে করে হাসল। এইভাবে আর সবাইকে একে একে ডাকা হল। বাথশেবা বইটা বন্ধ করে একগোছা চুল পিঠে সরিয়ে দিয়ে বলল—এবার তোমরা যেতে পার। উইলিয়ম স্মলবেরী কি ফিরেছে ?

—না ম্যাডাম।

হেনরি ফ্রে একটু অফিসিয়াল হওয়ার চেষ্টা করে, বাথশেবার কাছাকাছি এসে বলল—নতুন শেফার্ডের একজন সহকারী চাই।

—ওঃ হো ঠিক—তার কাকে পছন্দ হয় ?

—কেইন বল ছেলেটা বেশ,—বলল হেনরী—আর নতুন শেফার্ড বোধ হয় অপছন্দ করবে না—বলে সে কাঁচুমাচু মুখে গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকাল। গ্যাব্রিয়েল একটু আগে প্রবেশ করেছিল—হাত দুটো বুকের কাছে ভাঁজ করে একটা দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

—ঠিক আছে। কেইন বল তাহলে শেফার্ডের সঙ্গেই থাকবে। তুমি তোমার কাজ বুঝে নিয়েছ ?

তুমি—অর্থাৎ গ্যাব্রিয়েল ওক!

—হ্যাঁ, ধন্যবাদ, মিস এভার্ডিন! আর না হলে আমি জেনে নেব'খন—এই শান্ত পরিচালনা দেখে গ্যাব্রিয়েল আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। আগে থেকে না বলে দিলে কারও বোঝার উপায় নেই ওক এবং এই সুন্দরী মহিলা পরস্পরের পূর্বপরিচিত কিনা। বাথশেবা হঠাৎ এত সম্পত্তির মালিক হয়েছিল বলে, তার সামাজিক গুরুত্বের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল।

বাইরে থেকে থপ্‌থপ করে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। সবাই বলে উঠল—এই যে বিলি স্মলবেরী এসে গেছে।

—কি খবর ?—বাথশেবা জিজ্ঞাসা করল। উইলিয়ম তখন ঘরের মধ্যে এসে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে। সে বলল—এই খারাপ আবহাওয়ার জন্যে দেরী হয়ে গেল ম্যাডাম! তার জুতোয় তখনও বরফ জমেছিল।

—ফ্যানির খবর কি ?—বাথশেবা বলল।

—সোজা কথায় সে সোলজারের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

—ফ্যানির মত লাজুক মেয়ে?

—হ্যাঁ, শুনুন, সব খুলে বলছি। আমি ক্যাষ্টারব্রিজ গিয়ে শুনি যে এগার নম্বর ড্রাগুন এগিয়ে গেছে—নতুন কোম্পানী আসছে। ঐ এগার নম্বর কোম্পানীই আমাদের মেলচেষ্টারের ভিতর দিয়ে গেছে।

গ্যাব্রিয়েল আগ্রহভবে শুনছিল—বলল,—হ্যাঁ, আমি দেখেছি।

—ফ্যানির লোকটা ঐ বাহিনীর সঙ্গেই ছিল—ফ্যানিও তার সঙ্গে।

—তুমি কি তার নাম জানতে পেরেছ?

—না, কেউ জানে না। তবে বোধহয় সাধারণ সেপাইয়ের থেকে উপরে, অফিসার-টফিসার হবে।

গ্যাব্রিয়েলের মুখের ভাবে মনে হল, এই কথাটায় তার সন্দেহ আছে।

—যাই হোক, আজকে আর কোনও খবর পাওয়া যাবে না। তোমরা কেউ একজন এই খবরটা ফার্মার বোল্ডউডকে জানিয়ে এসো। বাথশেবা উঠে দাঁড়াল, বলল—এখন থেকে মনে রেখো—তোমাদের মালিক একজন মহিলা। ফার্মিং-এ আমার দক্ষতার এখনও পরীক্ষা হয় নি—তবে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব—আর তোমরা আমার দিকে দেখলে, আমিও তোমাদের দেখব। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ধান্দাবাজ থাকো (আমার মনে হয় কেউ নেই), জেনে রাখো ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা আমার পুরোপুরি আছে।

লিডি পেছন থেকে আস্তে বলল—বেশ বলেছ।

—তোমাদের ঘুম থেকে ওঠার আগে আমি উঠব। তোমরা মাঠে যাওয়ার আগে আমি যাব। দেখবে কেমন আশ্চর্য্য করে দিই সবাইকে।

—হ্যাঁ, ম্যাডাম—বলল সকলে।

—এখন বিদায়, গুড-নাইট।

—গুড নাইট, ম্যাডাম।

বাথশেবা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল—তার রেশমী গাউনে কয়েকটা খড় জড়িয়ে গিয়ে খসখসে আওয়াজ হচ্ছিল—লিডিও অনুরূপ গাম্ভীর্য্যের ব্যর্থ অনুকরণ করার চেষ্টা করতে করতে অনুসরণ করল।

॥ ১১ ॥

সেই তুষার-ঝরা সন্ধ্যায়, ওয়েদারবেরীর অনেক উত্তরে, এক ছোট শহরের সেনা ছাউনিতে অন্য এক নাটক অভিনীত হচ্ছিল—যার প্রধান চরিত্র ছিল মিশকালো অন্ধকার।

এই আঁধারে উজ্জ্বলতাও কখন যেন মলিন হয়ে যায়, ভাবুক এবং অনুভূতিশীল লোকদের মনে হয়—প্রেম পরিণত হয়েছে অনুগ্রহে, আশা তলিয়ে যায় বৃথা আশ্বাসে, আর বিশ্বাস আশায়। স্মৃতি তখন উচ্চাশার অপরিণতিতে বিলাপের জন্ম দেয় না বা আকাঙ্ক্ষা উৎসাহকে প্রণোদিত করে না।

দৃশ্য রাজপথ। তার একদিকে বিস্তীর্ণ জলাভূমি—অন্যদিকে ছোট একটা খাল—খালের গা দিয়ে উঁচু দেয়াল। বনভূমি থেকে এখানে ঋতুর পরিবর্তন বোঝা যায় না। আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা। পথে, প্রান্তরে, বাড়ীর দেয়ালে, গাছের ডালে টুপটাপ করে বরফ পড়ছে। মেঘের খিলান যেন অনেক নীচে নেমে এসেছে—আর একটু হলেই আকাশের ছাদ নেমে আসবে মাটির উপরে—চারিদিকে খালি বরফ আর বরফ। ঝাপসা আবহাওয়ায় ঠক্ ঠক্ করে অনেকক্ষণ একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা গেল। কাছাকাছি কোনও ঘড়িতে দশটা বাজল। খোলা জায়গায় কোথাও হয়তো ঘণ্টাটা বরফে মোড়া হয়ে গেছে।

এই সময়ে তুষারপাত বেশ কিছুটা কমে এল। দূরে, দেয়ালের বর্ণহীন প্রেক্ষাপটে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখলে একটা আকৃতি চোখে পড়ে, মানুষ বলেই মনে হয়। আকৃতিটা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু খুব কষ্ট করে নয়—তুষার এখনও দু'ইঞ্চি পুরু হয়নি। এখন জোরে জোরে গোনার শব্দ হল—এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ।

প্রতি সংখ্যা গোনার আগে আকৃতিটা প্রায় ছয় গজ মত এগিয়ে যাচ্ছিল। এইবার বোঝা গেল যে মাথার উপরে জানলাগুলো গোনা হচ্ছিল কারণ পঞ্চম জানালায় এলে পাঁচ শোনা গেল।

এখানে এসে বিন্দুটা দাঁড়িয়ে পড়ল তাই আরও অস্পষ্ট মনে হতে লাগল। এবার একখণ্ড বরফ নীচে থেকে পঞ্চম জানালার দিকে কেউ ছুঁড়ে দিল। বরফটা লক্ষ্যমত না পৌঁছে পাশে দেয়ালে গিয়ে লাগল—আবার, আবার ছুঁড়লে পঞ্চম জানালায় গিয়ে লাগল। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। আর একবার জানালায় ঐরকম আঘাত করলে, জানালাটা খোলার শব্দ হল। ওপর থেকে

কেউ একজন বলল—ওখানে কে ?

গলাটা পুরুষের এবং আদৌ বিস্ময়াহত নয়। এই উঁচু দেয়াল সেন ছাউনির।

—কে, সার্জেণ্ট ট্রয় ?—আবছা বিন্দুটা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল।

এই দুই ব্যক্তির অস্তিত্ব যেহেতু মাটি আর মকান থেকে আলাদা কর যাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল দেয়ালটা, বরফের সঙ্গে কথা বলছে।

—হ্যাঁ। ছায়া উত্তর দিল—তুমি কোন মেয়েটি বলো তো ?

—ও ফ্র্যাঙ্ক! তুমি আমাকে চিনতে পারছ না ? বিন্দুটি বলল—আমি তোমার স্ত্রী, ফ্যানি রবিন—

—ফ্যানি ? দেয়ালটা ভীষণ আশ্চর্য্য হয়ে বলল।

—হ্যাঁ, মেয়েটি বলল, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে। মেয়েটির স্বরে মনে হচ্ছিল যেন সে প্রকৃতই স্ত্রী নয়, আর লোকটির ব্যবহারও স্বামীর মত নয়। কথোপকথন চলছিল—

—তুমি এখানে কি করে এলে ?

—রাগ করো না, আমি তোমার জানালাটা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম।

—আমি ভাবিনি তুমি আজ রাত্রে আসবে। তুমি আসতে পার একথাই আমি ভাবি নি। তোমার কপাল ভাল, দেখা পেয়েছ—আমার তো কালই চলে যাওয়ার অর্ডার হয়েছে।

—তুমি আমাকে আসতে বলেছিলে।

—আমি বলেছিলাম, ইচ্ছে করলে আসতে পারো।

—হ্যাঁ তাই। তুমি আমাকে দেখে খুশী হওনি ফ্রাঙ্ক ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

—একবার আসবে এখানে ?

—লক্ষ্মীসোনা ফ্যান—পারব না—গেট বন্ধ হয়ে গেছে—আমার আর ছুটি নেই। কাল সকাল পর্য্যন্ত আমরা সবাই এই জেলে বন্দী।

—তাহলে ততক্ষণ তোমার সঙ্গে দেখা হবে না—হতাশার স্বর শোনা গেল।

—তুমি ওয়েদারবেরীর থেকে কি করে এলে এখানে ?

—কিছুটা হেঁটে, বাকীটা গাড়ীতে।

—আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি।

—আমিও। আচ্ছা ফ্রাঙ্ক কখন সেটা হবে ?

—কোনটা ?

—সেই যে তুমি বলেছিলে—

—ঠিক মনে করতে পারছি না তো !

—একটু চেষ্টা কর—ওরকম বোলো না—আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। যে কথা তোমার বলা উচিত তা কিনা আমাকে বলতে হচ্ছে।

—কি বলো তো—কিছু মনে কোরো না।

—আমাকেই বলতে হবে ? আমাদের কখন বিয়ে হবে ফ্রাঙ্ক ?

—এই ব্যাপার। তোমার জন্যে তো কিছু জামাকাপড় কিনতে হবে তাহলে ?

—আমার কাছে টাকা আছে। কিন্তু আমরা দুজনে তো দু'জায়গায় থাকি ?

—তাই নাকি ? তাতে কি হয়েছে ?

—দুই চার্চে নাম লেখাতে হবে না ? আমার তো সেণ্ট মেরীতে ?

—ও সেটাই আইন নাকি ?

—হ্যাঁ। হায় ফ্রাঙ্ক—তোমাকেআমার বলে দিতে হচ্ছে। প্লীজ, ফ্রাঙ্ক। আমি তোমাকে এত ভালবাসি ! তুমি আমাকে কতবার বলেছ বিয়ে করবে —আমি আমি আমি—

—এখন কেঁদো না, বোকার মত। আমি যদি বলে থাকি, নিশ্চয়ই করব।

—আমি তাহলে আমার চার্চে জানিয়ে দেব, আর তুমি তোমার ?

—হ্যাঁ।

—কালকেই !

—কালকে না—দুই একদিনের মধ্যে করে ফেলব।

—তুমি অফিসারের অনুমতি নিয়েছ ?

—না এখনও নেওয়া হয় নি।

—সে কি ? তুমি ক্যান্টারব্রিজ থেকে আসার আগে বলেছিলে প্রায় হয়ে গেছে।

—আমি আসলে ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি এত হঠাৎ এসে পড়েছ।

—তোমার মনে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখিত। আমি এখন চলে যাচ্ছি। তুমি কাল নর্থস্ট্রীটে মিসেস টুইলস-এর বাসায় আসবে ? আমার এখানে আসতে লজ্জা করে—খারাপ মেয়েরা ঘোরাঘুরি করে, আমাকেও তাই মনে করে।

—সত্যি তো। আচ্ছা আমি কাল আসব, গুড নাইট।

—গুড নাইট ফ্রাঙ্ক, গুড নাইট।

জানালাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। নীচের বিন্দুটা আস্তে আস্তে স' গেল। দেয়ালের মধ্যে তখন একটা চাপা উত্তেজনার হাসি শোনা যাচ্ছিল— হো হো সার্জেন্ট হো হো—চাপা হাসির আওয়াজটা বাইরে নদীর কলক' ধ্বনিতে মিলিয়ে গেল।

॥ ১২ ॥

বাথশেবা ঠিক করেছিল এখন থেকে সে জনসমক্ষে নিজেই ফার্মারের কাজক' করবে—অন্যদের দিয়ে আর করাবে না। তাই পরের হাটবারে ক্যাষ্টারব্রিজে' গমের বাজারে সে নিজেই হাজির হল।

'কর্ণ এক্সচেঞ্জ' নামটি খুব গালভরা হলেও—জায়গাটা ছিল কতকগুলি পিলার ও বীমের ওপর দাঁড়ানো নীচু ও লম্বা একটা হলঘর। ফড়েরা সেখানে পরস্পর আলাপ করছিল—তুজন, তিনজন, এক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিল—কথা বলার সময়ে বক্তার দৃষ্টি ঘোরাফেরা করছিল সমস্ত চত্বরে—হঠাৎ একটা চোখ ছোট করে ফেলে যেন কোনও প্রত্যুত্তর আশা করে সে থামছিল। অনেকের হাতেই একটা করে ছড়ি—শুয়োর ভেড়া ইত্যাদি খুঁচিয়ে দেখার জন্যে। কথা বলার সময়ে দেখা যাচ্ছিল বিচিত্র উপায়ে ছড়িটার ব্যবহারের প্রদর্শনী। কখনও পিঠের দিকে তুইহাতে বাঁকিয়ে ধরা—কখনও মাটিতে ভর দিয়ে বাঁকিয়ে অর্দ্ধবৃত্তে পরিণত করা—আবার কখনও তাড়াতাড়ি বগলের তলায় চালান করে, থলে থেকে মুঠো করে দানা তুলে দেখানো। অতঃপর অপর পক্ষের অপছন্দের অসারতা প্রমাণ করার জন্যে কেউ কেউ দানাগুলে ছড়িয়ে ফেলে দিচ্ছিল মেঝের উপরে—ঠিক এই মুহূর্তটার জন্যেই কতকগুলো শহুরে মুরগী গলা উঁচু করে চোখ বাঁকিয়ে দাঁড়িয়েছিল অদূরে—অন্যান্য দিনের মত আজও তারা সকলের অলক্ষ্যে কখন ঢুকে পড়েছিল এখানে।

এই সমস্ত শক্ত সমর্থ পুরুষদের মধ্যে এক সুন্দরী সুসজ্জিতা মহিলার উপস্থিতি ঠিক যেন শ্বাসরোধকারী গরমের মধ্যে ঠাণ্ডা এক ঝলক হাওয়া।—এদের মধ্যে স্থান করে নেওয়া কিন্তু, বাথশেবা প্রথমে যা ভেবেছিল তার থেকেও কঠিন. কারণ—তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আলাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—সব চোখ তখন তার দিকে।

ফার্মারদের মধ্যে মাত্র দু তিন জনের সাথে বাথশেবার পরিচয় ছিল। াজেই বাথশেবা তাদের দিকে এগিয়ে গেল—কিন্তু ব্যবসা করতে গেলে পরিচয় াক বা না থাক—তাকে এগিয়ে যেতে হবে—কাজেই এতদিন শুনে সে যা শখেছিল সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সকলের দিকেই এগিয়ে গিয়ে তার ছোট াতে শস্যদানা নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। তার ঝকঝকে মুক্তোর মত দাঁত ার লাল ঠোঁটে নারীত্বের গর্ব ছিল, আর ছিল সাহস। কিন্তু তার দৃষ্টি স্বাভাবিক ধরনের কোমল—চোখ দুটো কালো না হলে ঠিক রহস্যজনক মনে ত আর কালো বলেই খুব গম্ভীর এবং স্বচ্ছ দেখাচ্ছিল। যৌবনাগমে মেয়েরা যমন অফুরন্ত উৎসাহে সর্বদা কলকল করে—বাথশেবা কিন্তু কথাবার্তায় অন্য কম—অপরপক্ষের বক্তব্য পুরোটা শুনে তবে নিজে উত্তর দিচ্ছিল—দরাদরির মেয়ে পাকা ব্যবসাদারের মত নিশ্চল—অগত্যা অপরপক্ষকে স্বভাবতঃই তার ারীত্বের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হচ্ছিল। কিন্তু তার দৃঢ়তায় কোন গাঁয়ার্তুমি বা ছোট অন্তঃকরণের পরিচয় ছিল না।

অধিকাংশ ফার্মারেরই বাথশেবার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ হয় নি—তারা পরস্পর বলাবলি করছিল—মেয়েটি কে? কেউ উত্তর দিচ্ছিল—

—ফার্মার এভার্ডিনের ভাইঝি—ওয়েদারবেরীর আপার ফার্মটা নিয়েছে গা!—বেলিফকে তাড়িয়ে দিয়ে দিব্যি করেছে, নিজেই সব দেখাশুনা করবে।

শ্রোতা ঘাড় নাড়ল।

বক্তা বলে যাচ্ছিল—মেয়েটি একগুঁয়ে বটে—কিন্তু আমাদের গর্ব যে, াজাবটাকে আলো করে দিয়েছে। এত সুন্দরী মেয়ে বেশীদিন আর আইবুড়ো থাকবে না।

মেয়েটির মুখশ্রী ও দেহবল্লরীর শোভার মত তার অস্বাভাবিক বৃত্তিও যে মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল—এ কথাটা বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। যাই হোক সকলের চোখে আজ এই শনিবারের হাটের দিনে বাথশেবা পাকা ফার্মার হিসেবে না হলেও সুন্দরী বলে তার প্রশ্নাতীত জয় প্রমাণ করে গেল।

এত অসংখ্য প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টির মধ্যেও একটি ব্যতিক্রম ছিল। মেয়েরা এসব ব্যাপারে যেন তাদের চুলের ফিতে দিয়ে দেখতে পায়। বাথশেবা সোজা-সুজি না তাকালেও বুঝতে পারছিল, এদের মধ্যে একজন ছিল, অন্য সবার থেকে স্বতন্ত্র। প্রথমে সে খানিকটা আশ্চর্য্য হয়ে গেল। যদি দু'তরফের এই চকাংটা এত সুনির্দিষ্ট না হত তবে অস্বাভাবিক লাগত না আর যদি এমন হত

যে কেউ তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না—তাহলেও খারাপ লাগত না—। ব্যতিক্রম যেহেতু কেবলমাত্র একা একজন, বাথশেবার কাছে এটা রহস্যজ মনে হল।

অচিরেই বাথশেবা তার আকৃতি, ফিটফাট পোশাক আশাক, ভদ্র চাল ও সরলীকৃত আচার আচরণে তাকে একজন বিশিষ্ট লোক বলে মনে করা লোকটার সর্বাঙ্গে একটাই গুণ ফুটে উঠছিল—তা হল মর্য্যাদাবোধ। ভদ্রে প্রৌঢ়ত্বের এমন এক পর্য্যায়ে এসে পড়েছিলেন যখন মানুষের বয়স সম্বন্ধে স ধারণা করা মুস্কিল—পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বা এই দুইয়ের মধ্যবর্তী যে কো বয়সীই হতে পারেন।

সাধারণতঃ চল্লিশোর্ধ যে কোনও বিবাহিত ব্যক্তি সম্পর্কে একথা বলা পারে যে, আসা যাওয়ার পথে মোটামুটি চলনসই যে কোনও সুন্দরীর দি একবার তাকিয়ে দেখার মত মানসিক উদারতা ও সর্বদা প্রস্তুতি তাঁদের আ বাথশেবা নিশ্চিত ধারণা করল যে এই ভদ্রলোক অবিবাহিত।

হাট ভেঙে গেলে সে দৌড়ে লিডির কাছে গেল। লিডি তখন গাড়ী বসে। ঘোড়া জুতে গাড়ী ছেড়ে দেওয়া হল—বাথশেবার কেনাকাটা জি পত্র, চিনি, চা, ইত্যাদি নানা গৃহস্থালী জিনিস দেখেই মনে হচ্ছিল ভারী সু —দোকানীর হাত থেকে এই তরুণীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে তাদের রূপ পা গিয়েছে

—যাক মিটে গেল, লিডি! ঝঞ্ঝাট চুকে গেছে—এখন আমি অভ্যস্ত গেলাম। কিন্তু আজ সকালবেলা যেভাবে লোকে আমার দিকে তাকিয়েছিল যেন আমার বিয়ে

—আমি জানতাম এইরকম হবে। লিডি উত্তর দিল—পুরুষ জাতটাই হাঙরের মত শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—একটা লোককে কিন্তু একটু বেশী বুদ্ধিমান মনে হল—আমার দি তাকিয়ে নষ্ট করার মত সময় ছিল না তার। বাথশেবা কথাগুলো এমন ভঙ্গিতে বলল যাতে লিডির একবারও মনে না হয় যে লোকটাকে তার মনে ধরেছে।—দেখতে শুনতে ভাল। বয়েস বোধ হয় বছর চল্লিশেক হবে কোন লোকটা বুঝতে পেরেছিস?

লিডি ভেবেচিন্তে কিছু পেল না।

—একদম আন্দাজ করতে পারলি না? বাথশেবা যেন হতাশভাবে বলল

কি জানি? বুঝতে পারছি না. আর পেরেই বা কি হবে—যদি সে ামার দিকে অন্যদের চেয়ে একটু বেশী তাকাত টাকাত, তাহলে না হয় কথা ।

বাথশেবার মনে মনে কিন্তু তখন ঠিক উল্টো চিন্তাটাই ঘুরছে। একটা চথাট গাড়ী তখন তাদের পিছন থেকে এসে পাশ কাটিয়ে গেল।

-ঐ তো, ঐ যে যাচ্ছে—সে বলল।

লিডি তাকিয়ে দেখল—ঐ! ওতো ফার্মার বোল্ডউড—সেদিন যিনি মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

—ও। ফার্মার বোল্ডউড। বাথশেবা বিড়বিড় করে বলল আর তাকিয়ে ল। ফার্মার কিন্তু একবারও ঘাড় ফিরিয়ে দেখল না—বরং দূরে সামনে রাস্তার ক তাকাতে তাকাতে চলে গেল যেন বাথশেবা ও তার সৌন্দর্য হাওয়ার মত চঞ্চিৎকর।

—লোকটা বেশ ইন্টারেষ্টিং—তাই না?

—হ্যাঁ। সবাই সে কথা স্বীকার করবে। লিডি উত্তর দিল।

—আমি বুঝি না উনি সর্বদা এত নিবিষ্ট আর উদাসীন কেন?

—লোকে বলে, হয়তো ঠিক নাও হতে পারে—ওঁর যৌবন বয়সে নাকি টি মেয়ে ওঁকে খুব দাগা দিয়েছে।

—লোকে ওরকম বলে থাকে—কিন্তু এটা কখনই সত্যি নয় যে মেয়েরা দের ঠকায় বরং ছেলেরাই ঠকিয়ে থাকে। আমার মনে হয় এই গম্ভীর তিটা ওর স্বভাবের।

—হ্যাঁ স্বভাবই বটে—অন্য কিছু নাও হতে পারে।

—কিন্তু, এটা কিন্তু ভাবতে বেশ লাগে যে, বেচারীকে কেউ ঠকিয়েছে। যাক মানুষের সম্পর্কে আমরা সহজেই অনেক কিছু ভেবে নিই। হয়তো এমনও পারে যে দুটোই ঠিক—ওর স্বভাবটা ঐরকম আবার কেউ হয়তো দাগাও গছে।

॥ ১৩ ॥

সেদিন রবিবার—ফেব্রুয়ারীর তেরো তারিখ। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে া পড়ে এলে বাথশেবা আর কাউকে না পেয়ে লিডির সঙ্গেই বসে গল্প করছিল

আর সময় কাটাচ্ছিল। দীর্ঘশীতের শুরুতায় আবহাওয়া কেমন যেন বু
বুড়ো, জানালার খড়খড়িগুলো বন্ধ—বাতি তখনও জ্বলে নি—ঘরের স
কোণগুলো যেন নিজের নিজের উত্তাপে বিশিষ্ট মনে হচ্ছিল—কারণ ফায়া
প্লেসের আগুন তখনো জ্বালানো হয় নি। লিডি অনবরত টুকটুক করে অ
কথা বলে যাচ্ছিল অগভীর কোনও ঝর্ণার মত—তার উপস্থিতি সরব হলেও
গম্ভীর হয়ে চেপে বসে থাকে না। টেবিলের উপরে চামড়ায় বাঁধানো একখ
বাইবেল দেখে, লিডি বলল—আচ্ছা, মিস, তুমি কি কখনও বাইবেল আর চ
দিয়ে গুণে দেখেছ কে তোমার বর হবে?

—বোকার মত কথা বলিস না তো লিডি, তাই আবার হয় না কি?

—হ্যাঁ গো সত্যি—

—দূর বোকা

—যাক গে ভালো, কারও বিশ্বাস হয়, কারও হয় না। আমি বিশ্বাস ক

বাথশেবা বলল—বেশ পরীক্ষা করে দেখা যাক, নিয়ে আয় এক্ষুনি ঐ
দরজার চাবিটা।

লিডি চাবিটি নিয়ে এলো, বলল—আজকে রোববার, বাইবেল নিয়ে ঠ
ইয়ার্কি আজকের দিনে ঠিক হবে কি?

অন্যদিনও যা, রবিবারও তাই—এর আর তফাৎ কি। গভীর আত্মবিশ্বা
সঙ্গে উত্তর দিল বাথশেবা।

বহু পুরোন বইটাতে—কত অতীতের অগণিত পাঠকের তর্জনীর আঘ
পাতাগুলো জরাজীর্ণ হয়ে গেছে—বাথশেবা সেখান থেকে বুক অব রুথের বি
কবিতাটা মেলে ধরল—সেই স্বর্গীয় শব্দগুলো পড়ে সে যেন হঠাৎ পুলকি
লজ্জিত হল। জ্ঞান ও অজ্ঞানের দ্বন্দে অজ্ঞানই জয়ী হল—বাথশেবা হা
হাসতে পাতাটির ওপরে চাবিটা রাখল। এর আগেও যে বহুবার ঐ
এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছিল মরচে ধরা লোহার দাগে।

—এবার চুপচাপ সোজা হয়ে দাঁড়া—বাথশেবা বলল। কবিতাটি পাঠ
বইটা বন্ধ করে বাথশেবা অপরাধীর মত হাসতে লাগল।

—কি কার কথা মনে হল? জিজ্ঞাসা করল লিডি।

—বলব না।

—আচ্ছা মিস্! আজ সকালে মিঃ বোল্ডউডকে লক্ষ্য করেছিলে?—লি
কথায় যেন কোনও অলক্ষিত ইঙ্গিত ছিল।

—না তো—বাথশেবা বলল নিরাসক্তভাবে।

—উনি তো ঠিক তোমার উল্টোদিকের সারিতেই বসেছিলেন।

—হ্যাঁ জানি।

—তাও তুমি লক্ষ্য কর নি?

—না বলছি তো।

লিডি যেন ইচ্ছা করেই ঠোঁট চেপে ধরে চুপচাপ বসে থাকল। তখন বাথশেবা জিজ্ঞাসা করল—কেন কি করেছিলেন উনি?

—সারাক্ষণ একবারও তোমার দিকে তাকালেন না, তাই বলছি।

—তাকাবেন কেন? আমি তো তাঁকে তাকাতে বলি নি। বাথশেবা ঝাঁঝালো স্বরে বলল।

—না, অন্যরা সকলেই তো তাকাচ্ছিল। উনি ধনী এবং যথার্থ ভদ্রলোক, তাই না তাকানোই স্বাভাবিক।

বাথশেবা এমন ভঙ্গি করল যেন একথার উত্তর দেওয়া না দেওয়া সমান কারণ তা লিডির বুদ্ধিবিবেচনার অতীত। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠে বলল—ওঃ হো—কাল যে ভ্যালেণ্টাইন লেটারটা এনে রেখেছি—কাউকে তো দেওয়া হল না।

—কাকে দেবার জন্যে এনেছ? ফার্মার বোল্ডউডকে?

অন্য সকলের কথা ভুলে গিয়ে বাথশেবার কাছে এখন এই নামটিই সব থেকে পছন্দসই মনে হল। মুখে অবশ্যি বলল—'না এটা আমি বাচ্চা টেডি কোগানকে দেব। ওকে কিছু দেব বলেছিলাম—পেলে খুব খুশী হবে। দে তো, আমার কলম আর ডেস্কটা—কি লেখা যায় ভাবতে ভাবতে অবশেষে লিডির পরামর্শমত লেখা হল—

"The rose is red, The violet blue

Coronation is sweet and so are you."

বাথশেবা মনে মনে ভাবল ওর মত সুন্দর বাচ্চাকে কথাগুলো খুব ভাল লাগবে। লিডি হঠাৎ বলে উঠল—চিঠিটা বোকা বুড়ো বোল্ডউডকে পাঠালে কিন্তু খুব মজা হত। খুশীর আমেজে সে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মান সম্মান কিছুই গুরুত্ব দিয়ে বিচার করল না।

বাথশেবা মনে মনে একটু চিন্তা করল। ভদ্রলোকের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা ভেবে দেখলেও, বাথশেবা তার প্রতি অবহেলাকে ক্ষমা করতে পারছিল না—

আর লিডির মত মেয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করুক এটাও তার পছন্দ নয়। বাথশেবা বলল—না ওকে পাঠাব না। উনি মজাটা ঠিক ধরতে পারবেন না।

লিডি বলল—ভাবতে ভাবতেই বুড়ো মরে যাবে।

—আমি যদিও টেডিকেই দেব এমন কিছু ভেবে রাখি নি। আচ্ছা বেশ তো—টস্ করা যাক।—আজকে রবিবার পয়সা দিয়ে টস করার দরকার নেই। এই বইটা দিয়েই করা যাক—খোলা পড়লে বোল্ডউড, বন্ধ পড়লে টেডি, না—খোলাই পড়ার সম্ভাবনা বেশী—খোলা টেডি। বন্ধ বোল্ডউড।

বইটা ছুঁড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পতপত করে খুলে গেল। পড়ল কিন্তু বন্ধ হয়ে। বাথশেবা ছোট একটু হাই তুলে নিবাসক্তভাবে বোল্ডউডের নাম লিখে ছেড়ে দিল।

—নে, যাহোক হল—এবাব মোম জ্বালিয়ে সীল করে দে—কি সীল দেওয়া যায়—দুর এটা পড়া যাচ্ছে না—এটা একটা বাঘেব মাথা—আচ্ছা এইটা দেখা যাক—বলে একটা বড় সীল মেরে কথাগুলি পড়ে বাথশেবা বলল—বাঃ চমৎকার, এই ঠিক হয়েছে—এতে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরও ধৈর্য্য টলে যাবে। লিডি নীচু হয়ে পড়ে দেখল—লেখা আছে—'Marry me'।

—চিঠিটা সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা ক্যাষ্টারব্রিজের ডাকঘরে পৌঁছে গেল।—পরদিন ঘুরে ফিরে এল ওয়েদারবেরীতেই ফার্মার বোল্ডউডের ঠিকানায়।

খুব হাল্কা চালে ঘটে গেলো ঘটনাটা। প্রেমের বাহ্যিক রূপ বাথশেবা কিছু দেখেছিল বটে—অন্তরে যে তার কি ক্রিয়া সে সম্পর্কে তার কোনও জ্ঞান ছিল না।

॥ ১৪ ॥

পরের দিন সেণ্ট ভ্যালেণ্টাইন'স ডে। বোল্ডউড অন্যান্য দিনের মতই সন্ধ্যার পরে খেতে বসেছিল। সামনেই তাকেব উপব টাইমপিস ঘড়িটা টিক টিক করে চলছে। তারই মাথায় ছিল বাথশেবার সেই বেনামী চিঠিটা। বেশ খানিকটা দূরে হলেও, এই চিরকুমারের দৃষ্টিতে 'Marry Me" লেখা কটা যেন জলজল করে ভাসছিল।

সকালবেলা চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই বোল্ডউডের মনে বহুরকম তোলপাড়ের শুরু। কলম্বস যেমন আগাছা ভেসে আসতে দেখে অপার সম্ভাবনার আশা করেছিলেন, বোল্ডউডেরও অনেকটা তেমন মনে হচ্ছিল। শুতে যাওয়ার

আগে বোল্ডউড চিঠিটা আয়নার পেছনে গুঁজে রেখে বিছানায় গেল। এমন ঘটনা বোল্ডউডের জীবনে এই প্রথম, তাই ঘটনাটা নিছক মজা বা অবিবেচনা-প্রসূত বলে মনে হয়নি তার। সে বারবার চিঠিটার দিকে দেখছিল আর রাত্রির আবছায়ায় সেই চিঠিকে আশ্রয় করে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল এক নারীমূর্তি। তার পেলব হাতে লেখা বোল্ডউডের নাম—আচ্ছা, বোল্ডউডকেই কেন মনে পড়ল সে নারীর? তার মুখের শ্রী—কেমন ভ্রুভঙ্গি করে লিখেছিল সে এই চিঠি? সে নারীর ছায়ার কোনও বাস্তবতা ছিল না—বোল্ডউডের চিন্তা যাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছিল সে হয়তো তখন গভীর ঘুমে অচেতন—প্রেম বা পত্ররচনা কিছুই তার বিশ্রামে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিল না। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বোল্ডউড যে স্বপ্ন দেখছিল, জেগে উঠলে ঐ চিঠিটাই ছিল তার বাস্তবের রূপ।

আবছা চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়াতে বোল্ডউডের ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল বারবার। হঠাৎ তার একবার মনে হল—খামটা ভাল করে খুলে দেখে, ভেতরে আরও কিছু আছে কি না? একবার লাফ দিয়ে উঠে সেই অনুজ্জ্বল আলোয় সে খামটা খুলে ফেলল—ভাল করে নেড়ে চেড়ে দেখল ভেতরে আর কিছু নেই। আগের দিনের শতেকবারের মত বোল্ডউড চিঠিটা আর একবার দেখল এবং জোরে জোরে বলে উঠল—"ম্যারি মী"। চিঠিটা বন্ধ করে রাখতে গিয়ে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল বোল্ডউড। অভিব্যক্তি-হীন সাদামাটা চেহারা। বোল্ডউড দেখল, তার গাল বসে গেছে। চোখ দুটো বড় বড় এবং দৃষ্টি শূন্য। এই উত্তেজনার মুহূর্তে নিজেকে বড় অসহায় মনে হল—তাই বোল্ডউড আবার শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেশ বেলা হয়ে গেল বোল্ডউডের। সকাল অনেকক্ষণ হয়ে গেলেও তুষারপাতের জন্য সূর্য্য ভাল করে দেখা যায়না—পশ্চিম আকাশে তাকিয়ে বোল্ডউড দেখল, আগের রাত্রির চাঁদকে যেন পুরনো পেতলের চাকতির মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। হঠাৎ তার কানে এল এক ঘরঘর আওয়াজ। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখে ওপর থেকে ডাকগাড়ী এগিয়ে আসছে, ডাক পিওন হাত বাড়িয়ে আছে একখানা চিঠি নিয়ে। বোল্ডউড ত্রস্তপদে রাস্তার দিকে এগিয়ে এল—ভাবল আগের দিনের মত আরও একখানা চিঠি এল কোনও অপরিচিতার কাছ থেকে। টপ করে চিঠিটা নিয়েই বোল্ডউড খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেলল।

ডাকপিওন হাঁ হাঁ করে উঠল—চিঠিটা আপনার নয়—আপনার নয়। যদিও

কোনও নাম লেখা নেই, আমার মনে হয় এটা আপনার শেফার্ডের হতে পারে।

বোল্ডউড ঠিকানাটা পড়ে দেখল—"নতুন শেফার্ড, ওয়েদাববেরী ফার্ম, ভায়া ক্যাষ্টারব্রিজ।" ওঃ হো, বিরাট ভুল হয়ে গেছে। চিঠিটা আমার না—আমাব শেফার্ডেরও না। মিস এভার্ডিনের শেফার্ডের হতে পারে—তার নাম গ্যাব্রিয়েল ওক—তুমি বরং ওকেই দিয়ে দাও—বোলো আমি ভুলবশতঃ খুলে ফেলেছি।

এমন সময় দূরে পাহাড়ের মাথায় দেখা গেল একটি লোক নেমে আসছে—মোমবাতির জ্বলন্ত শিখাব মধ্যে পলতেটিকে যেমন কালো দেখায়, আলোকিত আকাশের পটভূমিতে লোকটিকে তেমনই দেখাচ্ছিল। সঙ্গে একটি চারপেয়ে জীব লাফাতে লাফাতে আসছে। লোকটিকে ক্রমে গ্যাব্রিয়েল ওক বলে মনে হল আর চার পেয়ে জীবটি তার কুকুর জর্জ।

বোল্ডউড বলল—ঐ যে লোকটি নেমে আসছে—ওই হল নতুন শেফার্ড। ঠিক আছে, চিঠিটা আমাকে দাও, আমিই পৌঁছে দিচ্ছি।

বোল্ডউডের কাছে এই চিঠি নিয়ে যাওয়াটাই একটা আলাপ করাব সুযোগ বলে মনে হল। সে চিঠিটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল গ্যাব্রিয়েলেব দিকে।

বেশ কিছুটা হাঁটাব পরে দুজনে মুখোমুখি হ'লে, বোল্ডউড মুখ কাঁচুমাচু করে বলল—আমি খুবই দুঃখিত মিঃ ওক—ডাকগাড়িটা এখান দিয়ে যাচ্ছিল—তো আমি ঠিকানাটা না পড়েই তোমাব চিঠি খুলে ফেলেছি—আমাব মনে হয় চিঠিটা তোমাবই, দেখ তো! কিছু মনে কোর না, প্লীজ!

—না, না, তাতে কী আছে—গ্যাব্রিয়েল সপ্রতিভস্বরে বলল। তাকে চিঠি লেখার মত দুনিয়ায় কেউ ছিল না—আব সে চিঠিতে এমন কিছু থাকার নয় যা গাঁয়ের সমস্ত লোকের কর্ণগোচর না করা যায়। ওক এগিয়ে এসে কোন এক অপরিচিতার হাতের লেখা পডতে লাগল—বন্ধু! তোমার নাম যদিও আমার জানা নেই, তবুও আশা করি আমার এ চিঠি তোমার হাতে পডবে। যে দুর্যোগের রাত্রিতে আমি ওয়েদারবেরী ছেডে এসেছিলাম, সেদিন তোমার সহৃদয়তার কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। এইসঙ্গে তোমার পাওনা টাকাটাও ফেরৎ দিলাম—সেদিনের সাহায্যকে দান হিসাবে গ্রহণ করতে পারিনি বলে কিছু মনে কোর না। তোমাকে একটা সুখবর জানাই, এই শহরেই সার্জেন্ট ট্রয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে—সে এখানকার সেনাছাউনিতে একজন অফিসার। তার সম্মানরক্ষার জন্যেই আমাকে টাকাটা ফেরৎ দিতে

হল—কারণ সে ধার ব্যতীত কোনও সাহায্য নিতে বোধ হয় আপত্তি করত।

প্রিয় বন্ধু, দয়া করে এই চিঠির কথা এখনই আর কাউকে জানিও না। আমরা বিয়ের পরে ওয়েদারবেরীতে এসে সবাইকে চমকে দিতে চাই। সার্জেন্টও ওয়েদারবেরীতে মানুষ হয়েছে। আনকা লোক হিসেবে তোমাকে এত কথা লেখার জন্যে আমি লজ্জিত। তোমার সাহায্যেব জন্যে ধন্যবাদ। ইতি

সতত: মঙ্গলাকাঙ্খী

ফ্যানি রবিন।'

—মিঃ বোল্ডউড আপনি কি চিঠিটা পড়েছেন? গ্যাব্রিয়েল জিজ্ঞাসা করল —আপনি তো ফ্যানি রবিনসম্পর্কে বেশ উদ্বিগ্ন বোধ হয়—চিঠিটা পড়লে বুঝতে পারবেন।

চিঠিটা পড়ার পবে বোল্ডউডকে আরও বিপন্ন মনে হল।

—বেচারা ফ্যানি! বোকা একেবারে! যতই আশা করে থাকুক, বিয়ে ওদের হবে বলে মনে হয় না। দেখ—মেয়েটি কোথায় আছে তার ঠিকানা পর্য্যন্ত দেয় নি।

—সার্জেন্ট ট্রয় লোকটি কেমন? গ্যাব্রিয়েল জিজ্ঞাসা করল।

—হুম, এসব ব্যাপারে মোটেই নির্ভব যোগ্য নয়—বোল্ডউড বলল বিড়বিড় করে—লোকটি চতুর এবং কর্মঠ। ওব মা ছিল এক ফরাসী গভর্ণেস। এখানকার লর্ড সেভার্ণের বাড়ীতে কাজ কবতে করতে তাঁব সঙ্গে একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে—তারপর তার বিয়ে হয় এক গরীব কমপাউণ্ডারের সাথে। বাচ্চাটা জন্মানর পরে যতদিন পর্যন্ত রোজগার পত্তর ছিল—এক বকম ভাল ছিল। কিন্তু অল্পবয়সেই আত্মীয়বন্ধু সব হারিয়ে ছেলেটিকে কাজ নিতে হল ক্যাষ্টারব্রিজের এক উকিলের ফার্মে। সেখানে থাকলেই ভাল ছিল—কিন্তু মিলিটারীতে ঢুকে ওর স্বভাব গেল খারাপ হয়ে। আমার তো খুবই সন্দেহ হয় ফ্যানি যেমন ভাবে লিখেছে তেমন ভাবে কোনদিন চমকে দিতে পারবে কি না—বোকা মেয়ে, একেবারে নির্বোধ—এই কথাগুলো বলে বোল্ডউড কি যেন একটু ভেবে পিছন্ন ফিরে হাঁটতে আরম্ভ করল। ওক তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে।

কিছুটা এগিয়ে যেতে যেতে বোল্ডউড পকেট থেকে আর একটি চিঠি বার করল এটি বাথশেবার লেখা। আবার পিছিয়ে এসে ওককে বলল—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম, মিঃ ওক—আচ্ছা, বলতে পার এই হাতের লেখাটা কার?

ওক ভাল করে মন দিয়ে খামটা দেখল—তারপর একটু হেসে বলল—এ লেখা মিস এভার্ডিনের।

এই নাম উচ্চারণ করতেই যেন ওক রাঙা হয়ে উঠল—কিছু মুহূর্তের মধ্যেই তার মনে চিন্তা দেখা দিল—চিঠিটা নিশ্চয় বেনামী নাহলে এত খোঁজখবরের কি দরকার ছিল ?

বোল্ডউড কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের এই হাসি এবং গম্ভীর হয়ে যাওয়া দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেল, ভাবল লোকটি তাকে মস্করা করছে। একজন নতুন অপরিচিত লোককে এভাবে জিজ্ঞাসা করা বোধ হয় উচিত হয় নি। আবার গ্যাব্রিয়েলের কথাটা সে উড়িয়ে দিতে পারল না। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ফিরে এল বোল্ডউড। মজা করাটা যে প্রায়শঃ কাউকে মনোকষ্ট দেওয়ার প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত—এই কঠিন সত্য কথাটা সেই মুহূর্তে বোল্ডউডকে দেখে বড় করুণভাবে ফুটে উঠছিল।

॥ ১৫ ॥

এর কিছুদিন পরে সেই ছাউনি শহরের 'অল সেণ্টস্ নামাঙ্কিত গীর্জায় একদিন সকালবেলার প্রার্থনা সবে শেষ হয়েছে। প্রধানতঃ বাচ্চামেয়েরা এবং মহিলারাই এসব অনুষ্ঠানে এসে থাকেন। মেয়েরা উঠে যে যার বাড়ী ফিরে যাওয়ার তোড়জোড় করছে এমন সময় জুতোর মচমচ আওয়াজে সবাই সচকিত হয়ে উঠল। প্রত্যেকের দৃষ্টি একজায়গায় গিয়ে আটকে গেল। একজন তরুণ অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার, পরনে লাল ইউনিফর্ম—কাঁধে তিনটে তারা জ্বলজ্বল করছে—খুব দৃঢ় পদক্ষেপে গটগট করতে করতে বেদীর কাছাকাছি রেলিঙের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটুক্ষণ পরে একজন পাদ্রী তাকে ফিসফিস করে কি বলল—তারপর পাদ্রীটা এক বুড়ীকে (সম্ভবত তার স্ত্রী) কিছু বলল —এবং ওরা সবাই একধারে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

মেয়েলোকগুলোর চোখমুখ যেন চকচক করে উঠল। সবাই বলতে লাগল —বিয়ে—বিয়ে—বোস্না, আর একটু দেখে যা। অনেকেই আবার বসে পড়ল। একটু একটু করে সময় এগিয়ে যেতে লাগল—সাড়ে এগারোটার ঘণ্টা বাজল ঢং করে। কই, কনে কোথায় ? দর্শকরা পরস্পর আলোচনা করতে লাগল।

তরুণ অফিসারটি কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে, তার মুখ যেন আরও কঠিন হয়ে

উঠতে লাগল। আস্তে আস্তে সব এমন নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল যে, ঢং ঢং করে যেই বারোটার ঘণ্টা পড়ল অমনি সবাই যেন চমকে উঠল। এবার মেয়েরা সবাই গা টেপাটেপি করতে লাগল—হাসাহাসি করতে করতে তখন সবাই বেরিয়ে গেল এক এক করে। পাদ্রীরাও ভেতর দিকে চলে গেল। সার্জেণ্ট ট্রয় আর অপেক্ষা করল না। গীর্জার সদর ফটক দিয়ে নামতে নামতে শুনল দুপাশে দুই বুড়ো ভিখিরী জিভ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করছে। এযেন শুধু তাকে পরিহাসই নয়—আরও গভীর কোনও দুঃখের ইঙ্গিত বহন করে আনছিল।

গীর্জার সামনেই কেয়ারী করা ফুলের বাগান, তারপর রাস্তা, বাগান পেরিয়ে রাস্তায় পড়তেই সার্জেণ্টের সঙ্গে দেখা হল একটি ছোট মেয়ের। ভয়ে তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। ট্রয় চাপাস্বরে বলল, বেশ। ফ্রাংক!—আমার ভীষণ ভুল হয়ে গেছে আমি ভেবেছিলাম ঐ গীর্জাটার নাম 'অল সেণ্টস্'। পৌনে বারোটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাল করে তাকিয়ে দেখি ওটা 'অল সোলস'। যাকগে, তাতে কোনও দোষ নেই, কালকেও তো সময় আছে—ফ্যানি রবিন যেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

—বোকা মেয়ে কোথাকার! আমাকেও বোকা বানিয়েছ।—আর কথা বোলো না।

—ফ্রাংক, কালকে হবে তো?—ফ্যানি আলতো করে বলল—

—আগামী কাল?—হো হো করে হেসে উঠল সার্জেণ্ট ট্রয়—আমি আবার অমন বোকা বনতে চাই না।

—ফ্রাংক! আমার ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা কর – তুমি অমন করে বোলো না। কালকে আসব তো? না হলে আবার কবে হবে?—

—কবে? হ্যাঁ। ভগবান জানেন, কবে? ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে কথাকটা বলে সার্জেণ্ট ট্রয় হন হন করে হেঁটে চলে গেল।

॥ ১৬ ॥

শনিবার দিন ক্যাষ্টারব্রিজের হাটে বোল্ডউড তার স্বপ্নসুন্দরীর দেখা পেল। এ যেন আদম গভীর নিদ্রা ভেঙে দেখে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ঈভ। বোল্ডউড মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে তার দিকে তাকাল।

বাস্তব ঘটনা এবং তার আবেগময় পরিণতি সবসময়ে হিসেবের দ্বারা

মেলানো যায় না। মনের ক্রিয়াবিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় অতি তুচ্ছ বিনিয়োগ থেকে সৃষ্টি হয় বিশালাকৃতি ফলাফল। মেয়েরা তাদের খেয়ালখুশির মুহূর্তে এ শিক্ষাটি সহজেই ভুলে যায়—তাই বাথশেবার আজকে আশ্চর্য হওয়ার মত অনেক কারণ ছিল।

বোল্ডউডের দৃষ্টিতে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই—চাতুর্য্য, খুঁটিয়ে দেখা বা বোঝাপড়া সবগুলোই তার চরিত্রে বেমানান—গাঁয়ের কিষান যেমন ধান কাটতে কাটতে কাজ থামিয়ে তাকিয়ে থাকে চলে যাওয়া রেলগাড়ীর দিকে—বোল্ডউড তেমনই দেখছিল—বাথশেবার কালো কেশ, চঞ্চল অধর, সুডৌল চিবুক আর গ্রীবার কমনীয়তা—তার চোখের পাতা, চোখ, সুন্দর কান, সুন্দর শরীর, সুন্দর স্কার্ট এমন কি পায়ের জুতো দুটোও সুন্দর। বোল্ডউড যেন নিজের বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডের গতি শুনতে পাচ্ছিল। তার এই চল্লিশ বছর বয়সেও বোল্ডউড কোন নারীকে দূর থেকে ছাড়া দেখে নি—হৃদয়ের গভীরতায় তার দৃষ্টি পৌছায় নি। বাথশেবা সত্যি সত্যি সুন্দর কিনা যাচাই করার জন্যে সে পাশের এক ফার্মারকে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, মিস এভার্ডিনকে সবাই খুব সুন্দরী বলে, তাই না?

—একশোবার—কেন উনি যখন প্রথম এই হাটে আসেন—মনে আছে আপনার? সত্যিই সুন্দরী—একবাক্যে মেনে নেওয়ার মত।

ভালবাসার পাত্রীকে যখন অপরেও সুন্দরী বলে প্রশংসা করে—এমন কি কোনও শিশুর মতামতও মানুষকে এসব মুহূর্তে বড় দুর্বল করে দেয়। বোল্ডউডের সমস্ত পেশী এবং নার্ভ যেন আলগা হয়ে যাচ্ছিল। এই মেয়েই তাকে লিখে পাঠিয়েছে—'ম্যারি মী'—বোল্ডউড আরও বিস্ময় বোধ করতে লাগল।

বাথশেবা কিন্তু সেই মুহূর্তে এক অল্পবয়সী ফার্মারের সঙ্গে দরাদরি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। বোল্ডউডের মত ভাঁড়গুমো পুরুষ যে বাথশেবার রুচিতে কোনও দাগ কাটবে না সেটা অবশ্যি স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু বোল্ডউড যেন গভীর ঈর্ষায় গরম হয়ে যাচ্ছিল—তার বারংবার মনে হচ্ছিল ঐ দুজনের দরাদরির মধ্যে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলে। তা করতে হলে একটিই মাত্র উপায়—বাথশেবার শস্যদানাগুলো হাতে নিয়ে পরখ করে, দরদাম করা। কিন্তু সেটা করা বোল্ডউডের পছন্দ হল না। কেনাবেচার প্রসঙ্গ যেন এক্ষেত্রে ভয়ানক অশোভন মনে হচ্ছিল তার।

বাথশেবা কিন্তু মনে মনে ঠিক বুঝেছিল, যে বোল্ডউডের গাম্ভীর্য্যের আবরনে সে ঠিকমতই আঘাত করেছে—তাই বোল্ডউডের দৃষ্টি সর্বদা তার পিছনে পিছনে

ফিরছে। বাথশেবার জিৎ হলেও অন্তরে সে অত বেশী প্রসাদ লাভ করছিল না—কারণ এই জয় কৃত্রিম উপায়ে অর্জিত—বোল্ড ্ডের স্বাভাবিক নতি স্বীকার নয়।

চিন্তা ও যুক্তির যথাযোগ্যতা দিয়ে বিচার করে বাথশেবার মনে মনে কষ্ট হচ্ছিল—তার এবং লিডির খেয়ালে একজন সম্মানীয় ব্যক্তির এভাবে হতচকিত হয়ে যাওয়াটা ঠিক সমুচিত মনে হচ্ছিল না। অন্ততঃ বাথশেবা কোনদিন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়াকি করার কথা চিন্তাও করে নি। ভেবেচিন্তে সে ঠিক করল—পরের দিন দেখা হলেই সে বোল্ডউডের কাছে এজন্যে মার্জনা চেয়ে নেবে। কিন্তু মুস্কিলের কথা হচ্ছে, যদি বোল্ডউড এটাকে ঠাট্টা ইয়ার্কি ভেবে থাকে তবে মার্জনা চাইলে আরও বিরক্ত হবে—আর যদি সত্যি সত্যি ভালবাসার ইঙ্গিত মনে করে থাকে, তবে মার্জনা চাইলে মনে করবে ভালবাসা খুবই গভীর।

॥ ১৭ ॥

বোল্ডউডের ফার্ম যে পাড়ায় তার নাম লিটল ওয়েদারবেরী। এদিকে প্রায় সবই গরীব লোকের বাস। কালে কস্মিন এক আধজন রাজপুরুষ ছাড়া ভদ্রলোকের কোনও গতায়াতই নেই। একমাত্র বোল্ডউড যখন গ্রাম থেকে বাইরে কোথাও যান—তখনই তার জুড়িগাড়ীর চলার ছন্দে গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আটকে যায়। আবার সেই গাড়ী যখন ফিরে আসে, তার পরিচিত শব্দে, তারা তাকিয়ে থাকে এই সবেধন নীলমণি অভিজাত পুরুষটির দিকে।

বোল্ডউডের জীবনযাত্রায় বিশেষ বৈচিত্র্য না থাকলেও মানুষটি কিন্তু নিরেট সাদামাটা ছিল না। সাধারণ পর্য্যবেক্ষণে তাকে খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির মনে হলেও—সেটা ছিল তার বাহ্যিক রূপ—অন্তরের বহু পজিটিভ আর নেগেটিভ এর এক অদ্ভুত ব্যালান্স। এই ভারসাম্য একবার স্থানচ্যুত হলেই বোল্ডউড মুহূর্তে চরমপন্থী হয়ে যেত। একবার কোনও আবেগের বশীভূত হলেই সে সর্বক্ষণ সেই চিন্তায় ব্যাপৃত থাকত। হয় সে একেবারে নির্বিকার—কোন কিছুই গায়ে মাখত না—নইলে একেবারে চরম, ভয়ানক বিব্রত।

ভাল বা মন্দ কোন বিষয়েই সে আলতো মতামত পছন্দ করত না—সর্বদা এবং সর্বথা "সীরিয়াস" এই মানুষটি জীবনের কোনও ভুল ত্রুটিকেই হাল্কা চালে

দেখতে শেখে নি—তাই হাসিখুশী মজাদার লোকদের থেকে দুঃখী এবং গম্ভীর স্বভাবের মানুষদের কাছে সে ছিল বেশী গ্রহণযোগ্য। জীবনের সমস্ত স্বপ্নই ছিল তার কাছে একান্ত গভীর তাই আনন্দে সে যেমন নেচে উঠতে পারত না—দুঃখেও ভেঙে পড়ত খুব বেশী। কোন আঘাতকেই সহজে মন থেকে মুছে ফেলতে পারত না।

বাথশেবা ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি যে অসাবধানে সে কত উর্বর এক ক্ষেত্রে বীজ ফেলেছে। সে যদি জানত, এই অসহায় ব্যক্তিটির ভাল বা মন্দ এই মুহূর্তে তার উপরেই একান্ত নির্ভরশীল—তাহলে সেই দায়িত্ববোধে বাথশেবা নিশ্চয়ই কেঁপে উঠত ভয়ে। বোল্ডউডের স্বভাব, প্রকৃতি বাথশেবার একেবারেই অজানা ছিল—প্রকৃতপক্ষে কেউই জানত না—কারণ এ যাবৎ কাল কেউই তাকে বিশেষ বিচলিত হতে দেখে নি।

শীত কেটে গিয়ে আস্তে আস্তে বসন্ত আসছে। এখনই ভেড়ার পাল নিয়ে সব মাঠে চরাতে বেরোয়। কারণ ঘাস এখনো কাটার মত বড় হয় নি। পূবে বাতাস দক্ষিণে বইতে শুরু করেছে। বসন্তকাল যেন শুরু না হয়েই হঠাৎ মাঝামাঝি এসে গেল। হঠাৎ যেন প্রকৃতি জেগে উঠেছে—গাছে গাছে পাতায় পাতায় মাতামাতি—বাগান, বাগিচা, সবুজে সবুজ—তুষার আর বরফের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে জীবন এখন চঞ্চল মুখর—শহরের হাজার ব্যস্ততা আর হৈ চৈ—এই নীরব ব্যস্ততার তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

বোল্ডউড আস্তাবল থেকে বেরিয়ে, পিছনের মাঠের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক আস্তাবলের পরেই বাথশেবার ফার্ম শুরু। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দূরে তিনটি লোক দেখা গেল - একজন মিস এভার্ডিন—অপর দুজন গ্যাব্রিয়েল ওক ও তার সহকারী কেইনি বল। বাথশেবার দিকে চোখ পড়তেই বোল্ডউড চঞ্চল হয়ে উঠল—অনেক ভেবে সে ঠিক করল—নিজেই গিয়ে সাহস করে তাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করবে। মাঠের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা গিয়ে বোল্ডউড থমকে দাঁড়াল। সেদিনই কিছু বলার মত সাহস হল না।

অবশেষে মে মাসের শেষাশেষি একদিন সে বাথশেবার বাড়ীর দিকে যাত্রা করল। অনিশ্চিত উদ্বেগের মধ্যে সে নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারছিল না। ভালবাসার কথা মনের মধ্যে তোলপাড় করতে করতে সে এখন পুরোপুরি প্রেমিক।—এই আবেগ আর তাকে বিস্মিত না করে মানসিক কষ্ট দিচ্ছিল খুব। বাথশেবার বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে সে ভেড়ার পাল স্নান করানোর

তদারক করতে গেছে। বোল্ডউড সেইদিকে রওনা হল।

ভেড়াগুলোকে স্নান করানোর জন্যে মাঠের মধ্যে একটি ছোট্ট পুকুর আছে। ইট দিয়ে চারিদিক বাঁধানো। একদম পরিষ্কার তরতরে জল—আশেপাশের ঘাস হয়েছে খুব লম্বা লম্বা। বোল্ডউড মাথা নীচু করে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিল—কিছুটা এগুলে শেফার্ড শুক, ম্যাথু মুন, জ্যান কোগান, কেইনি বল আরও সবাইকে দেখা গেল—প্রায় সকলেরই চুলেব গোড়া পর্যন্ত সারা দেহ ভিজে সপসপ করছে—আর পাড়ে দাঁড়িয়ে বাথশেবা ঘোড়ার পিঠে—লাগামটা আলতোভাবে তার হাতে ধরা। লাজুক ভেড়াগুলোকে এক এক করে জলে নামানো হচ্ছে—কোমর জলে দাঁড়িয়ে কোগান আর ম্যাথু মুন ভেড়াগুলোকে নামিয়ে দিচ্ছিল—গ্যাব্রিয়েল একেবারে মাঝখানে গলাজলে দাঁড়িয়ে—তাদেরকে ধবে, চুবিয়ে দিচ্ছিল। জলে পশমগুলো ভিজে ভারী হয়ে জন্তুগুলো যখন বেশ পরিশ্রান্ত, তখন তাদের ওপরে তুলে দিচ্ছিল জোসেফ আর কেইনি বল।

বোল্ডউড পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বাথশেবাকে সুপ্রভাত জানাল। বাথশেবার কিন্তু মনে হল লোকটি তাব খোঁজেই এতদূর এসেছে—ভেড়া স্নান করানোব সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। একটু একটু করে কখন যেন বাথশেবা একটি ঢিল ছুঁড়ে দেওয়ার মত দূরত্বে সরে গেল। সেখান থেকে ঐ ব্যস্ত লোকগুলোর কথাবার্তা এবং জলে চুবোনর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। বোল্ডউড এগিয়ে এসে বলল—মিস এভার্ডিন!

বাথশেবা যেন কেঁপে উঠল—ফিরে তাকিয়ে বলল—গুড মর্নিং। তার কণ্ঠস্বর ধীর এবং চাপা। অনেক সময় অল্প কথাতে মনের সব ভাব প্রকাশ হয়ে যায়। বোল্ডউড একটি কথাতেই তার অন্তর পুরোপুরি মেলে দিয়েছিল। চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ, না আকাশে গুরু গুরু ধ্বনি ভেবে নিতে যেমন চেতনার দরকার হয় না—অন্তরের প্রেরণাই কাজ করে, বাথশেবারও তেমনি মনে হচ্ছিল -এ এক আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস।

বোল্ডউড এক পবিত্র সারল্যের সঙ্গে বলল—আমি, আমি তোমাকে কোন ভূমিকা না করেই বলতে এসেছি—তোমাকে ভালভাবে দেখার পর থেকে আমার জীবন আর আমাতে নেই, মিস এভার্ডিন। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

বাথশেবা নিরপেক্ষতা রক্ষা করার জন্যে যেন নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেল—নড়াচড়া বলতে, তার অধরোষ্ঠ এতক্ষণ যেটুকুও বা খোলা ছিল, এখন একেবারে

বন্ধ করে ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে ধরল সে।

—আমার বয়স এখন একচল্লিশ—বোল্ডউড বলে যেতে লাগল—এখনও কুমার—হয়তো চিরকুমারই থেকে যেতাম—কারণ কারো স্বামী হিসাবে নিজেকে কখনও কল্পনা করিনি আমি। কিন্তু মানুষের তো পরিবর্তন হয়—তোমাকে দেখার পর থেকে আমারও মনের পরিবর্ত্তন হয়েছে—এখন আমার দিন দিন মনে হচ্ছে এভাবে চলা ঠিক নয়—আর সব থেকে বড় কথা হল আমি তোমাকেই স্ত্রী হিসাবে পেতে চাই।

—আমার মনে হয় মিঃ বোল্ডউড,—আপনাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি—কিন্তু আপনার এই প্রস্তাব বোধ হয় ঠিক—সমুচিত নয়। বাথশেবা উত্তর দিতে দিতে তোৎলাচ্ছিল।

মর্য্যাদার বদলে মর্যাদা ফেরৎ পেলে সমস্ত ভাবের বন্যা আপনা থেকে খুলে যায়। বোল্ডউড নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না।—তুমি ছাড়া আমার জীবন একেবারে দুঃসহ—চাপা স্বরে বোল্ডউড ভেঙে পড়ল—আমাকে—আমাকে বলতে দাও যে আমি তোমায় ভীষণ ভালবাসি।

বাথশেবা কোনও উত্তর দিল না। তার ঘোড়াটা যেন কিছু হচ্ছে ভেবে ঘাস খাওয়া বন্ধ করে মুখ উঁচু করে তাকাল।

—আমার মনে হয় আমার কথাগুলো শুনতে তুমি আপত্তি করবে না।

বাথশেবার হঠাৎ মনে হল এসব কিছুর জন্যে দায়ী তার মুহূর্তের সেই খেয়াল, যার থেকে এই মিথ্যা আশ্বাসের জন্ম।

বোল্ডউড সহজ ভঙ্গিতে বলে যেতে লাগল—আমার ইচ্ছা করে, যদি তোমাকে প্রেমের কথা সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারতাম—কিন্তু আমার সে ক্ষমতাও নেই আর ধৈর্য্যও নেই—আমি তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই—এটাই আমার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান—যদিও উপযুক্ত কারণ না থাকলে আমি এমন কথা বলতাম না।

বাথশেবা মনে মনে ভাবল—ওঃ সেই ভ্যালেণ্টাইনের চিঠি—কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

—মিস এভার্ডিন! তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে শুধু একবার ব—আর যদি না ভালবাস, তবুও আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

—মিঃ বোল্ডউড, আপনাকে যে কী জবাব দেব ভাবতেও আমার অন্তরে খুব সঙ্কোচ হচ্ছে—কারণ আপনাকে আমি যথার্থই শ্রদ্ধা করি। আপনাকে

আমি শুধু আমার অনুভূতিটুকু বলতে পারি—আমার পক্ষে আপনাকে বিয়ে করা কিছুতেই সম্ভব না—আপনার মর্য্যাদার সঙ্গে সেটা মোটেই মানাবে না—

—কিন্তু মিস এভার্ডিন !

—আমি, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আপনাকে সেই ভ্যালেণ্টাইন চিঠিটা পাঠাবার কথা—শুধু এক অসাধারণ খেয়ালে, সম্পূর্ণ অচিন্তিত উপায়ে চিঠিটা আপনার কাছে চলে গেছে—সেজন্যে আমি ক্ষমা চাইছি।

—না, না, না, অচিন্তিত একথা বোল না বরং আরও বেশী কিছু এটাই আমাকে ভাবতে দাও—এ নিশ্চয়ই তোমারও অগোচর অন্তরের গোপন প্রেরণা —তুমি আমাকে ভালবাস—এটাই তার প্রমাণ—সম্পূর্ণ অচিন্তিত একথা আমি ভাবতেই পারি না। হায়—আমি জানি না কিভাবে তোমাকে খুশী করব— আমি পারব না, ওসব অভিনয় আমি পারি না—আমি শুধু তোমাকে চাই— আর কিছুই বলতে পারছি না আমি।

বাথশেবা ছোট্ট একটু হেসে বলল—কিন্তু মিঃ বোল্ডউড আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—আমি আপনার প্রেমে পড়ি নি। তার সাদা ঝকঝকে দাঁত আর চাপা ঠোঁটে বড়ই নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছিল তাকে, কিন্তু চোখ দুটো যেন মমতামাখা।

—কিন্তু—তুমি শুধু একটু অনুগ্রহ করে চিন্তা কর, আমাকে স্বামী হিসাবে মেনে নিতে পার কিনা। আমি জানি তোমার থেকে বয়েস আমার অনেক বেশী--কিন্তু তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমার সবরকম যত্ন নেব—তোমার বয়সী যে কোন পুরুষের থেকেও অনেক বেশী—তোমাকে আমি সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করব। গৃহস্থালীর কোনও ঝঞ্ঝাট ঝামেলা তোমায় স্পর্শও করবে না—যত ইচ্ছা, দরকার, কাজ করবার লোক রাখার যোগ্যতা আমার আছে—তোমাকে কোন দিকে লক্ষ্য দিতে হবে না—তুমি চাইলে, আমার ঐ পুরনো জুড়ি গাড়ীও বিক্রী করে দেব। শুধু আমার বাবা মা পছন্দ করতেন তাই রেখেছি—তোমাকে আমি নতুন এক্কাগাড়ী কিনে দেব। আমি বলে বোঝাতে পারব না—দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস থেকে তুমি কত কত বেশী মহার্ঘ আমার কাছে—তুমি জান না—কেউ জানে না--একমাত্র ঈশ্বর তিনিই জানেন।

এই সরলপ্রাণ গভীর স্বভাব ভদ্রলোকটির প্রতি সহানুভূতিতে, অনুকম্পায় বাথশেবার তরুণ হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল।—আর বলবেন না, আপনি আর কিছু বলবেন না। আমার লজ্জা করে আপনি আমার জন্যে এত ভাবেন অথচ

আমি একটুও ভাবি নি। মিঃ বোল্ডউড! ওরা বোধ হয় আমাদের লক্ষ্য করছে —আমার অনুরোধ আপনি ব্যাপারটা এখানেই চাপা দিন। আমি আর কিছু চিন্তা করতে পারছি না। আপনি যে এই কথা বলতে এতদূর এসেছেন, আমি একটুও ভাবি নি। আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। বোল্ডউডের বিচলিত অবস্থা দেখে বাথশেবা একটু ভীত এব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।

—তাহলে বল যে তুমি আমাকে একেবারে ফিরিয়ে দিচ্চ না।

—আমি কিছুই করতে পারছি না—দুঃখিত, একথার কোনও উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

—তাহলে তোমাব সঙ্গে আবার আমি দেখা করব।

—আচ্ছা।

—তোমাব কথা মনে মনে চিন্তা করব!

—হাঁা, তা করতে পারেন।

—তোমাকে পাওয়ার আশা করব?

—না, তেমন কোনও আশা করবেন না। চলুন, এখন যাওয়া যাক।

—তাহলে কালকে আবাব তোমার কাছে আসব?

—না, প্লীজ আসবেন না, আমাকে একটু সময় দিন।

—আমি তোমাকে অনন্তকাল সময় দিতে রাজী—কৃতজ্ঞতার সুরে ও একান্ত আগ্রহে সে কথাগুলো বলল—আমি এখন অনেকটা খুশী।

—না, আমি রাজী হয়েছি ভেবে যেন খুশী হবেন না। মিঃ বোল্ডউড। নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করুন,—আমাকেও ভাবতে দিন।

—আচ্ছা, আমি তাহলে অপেক্ষা করব। বোল্ডউড বলল।

বাথশেবা চলে গেলে, মাটির দিকে তাকিযে তাকিয়ে বোল্ডউড ভাবল যেন কোথায় কোন এক অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে। কোনও উত্তেজনাব মুহূর্তে আঘাত পেলে, ব্যথার তীব্রতায় যেমন মানুষ আস্তে আস্তে বাস্তবে ফিরে আসে—তেমনই বোল্ডউডও বাস্তবে ফিরে এল এবং বাড়ীর দিকে যাত্রা কবল।

॥ ১৮ ॥

বোল্ডউড বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর থেকে বাথশেবার মনে সেই একটা কথাই দোলা দিয়ে যাচ্ছিল। তার মত একাকিনী অভিভাবকহীন নারীর কাছে বোল্ডউড ছিল যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য, বিত্তবান এবং সম্মানীয় ব্যক্তি। ভদ্রলোকের গুণের কোনও ঘাটতি ছিল না। বাথশেবার মত পরিস্থিতিতে যে কোনও মেয়েই এরকম প্রস্তাবে সাগ্রহে রাজী হ'ত আর পাড়ার লোককে গর্বের সঙ্গে সে কথা বলে বেড়াত। বিয়েটাকে নিছক বিয়ে বলে মনে করলে বাথশেবার পক্ষে বোল্ডউড সর্বোত্তম পাত্র। সাধারণ লোকে দারপরিগ্রহ করে তার কারণ বিয়ে না করলে একটি নারীর উপরে অধিকার বর্তায় না আর মেয়েদের স্বামীগ্রহণ করার কারণ হ'ল—একটি পুরুষকে আশ্রয় না করলে বিয়ে করা যায় না। উপায় উভয়ক্ষেত্রেই এক হ'লেও উদ্দেশ্য বিভিন্ন। মেয়ে পক্ষের এই বিয়েতে আপত্তি থাকার একমাত্র কারণ ছিল, কোনও পুরুষকে আশ্রয় করার মত মানসিকতার অভাব। কিন্তু তার মনের মধ্যে সর্বদাই এক দ্বন্দ্ব তোলপাড় করছিল--যে খেলা সে নিজেই শুরু করেছে তার ফলাফলও তারই বহন করা উচিত—সেদিক দিয়ে বোল্ডউডকে বিয়ে না করাটা গর্হিত নিষ্ঠুরতা। বাথশেবার চিন্তা এবং ধারণাগুলো সাধারণতঃ যুক্তি এবং ন্যায়শাস্ত্র মেনে চললেও কার্যে পরিণত হত খুব কম—দুর্ভাগ্যবশতঃ তার খেয়াল এবং অবিবেচনা—প্রসূত সিদ্ধান্তগুলোই কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হত বেশী।

শীত চলে গেছে। এখন ভেড়াদের গায়ে পশম বেশ বড় হয়ে উঠেছে। ঐ ঘটনার পরেরদিন বাথশেবা তার বাড়ী থেকে দেখল, দূরে শেফার্ডের কুটীরগুলোর সামনে, ছেলেমেয়ে সবাই মিলে, অস্ত্র-যন্ত্রে ধার দিতে লেগে গেছে। কাস্তে, হেঁসো, বড় বড় ব্লেডওয়ালা কাঁচি (এইগুলো দিয়েই পশম ছাঁটা হয়)—সবকিছু মিলে যেন এক যুদ্ধের সাজ। অন্যান্যদের মত গ্যাব্রিয়েল তার যন্ত্রপাতি ধার দিচ্ছিল—কেইনি বল ধার দেওয়া জাঁতাটার হাতল ঘোরাচ্ছিল আর গ্যাব্রিয়েল সযত্নে ব্লেডগুলো ধরে ছিল—কখনও কখনও আঙুল দিয়ে পরখ করে দেখছিল ঠিক ঠিক ধার হ'ল কিনা। এমন সময়ে তাদের মনিব আস্তে আস্তে তাদের কাছে এসে দাঁড়াল—দু'এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখল—তারপর বলল, কেইন, নীচের মাঠ থেকে ঘোড়াটাকে ধরে নিয়ে আয় তো, আমি ততক্ষণ হাতল ঘোরাচ্ছি, আর গ্যাব্রিয়েল, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

কেইন চলে গেলে বাথশেবা হাতল ঘোরাতে লাগল। গ্যাব্রিয়েল অবাক

হয়ে একবার মুখ তুলে দেখল, কিন্তু কোনও ভাবপ্রকাশ করল না। আবার মাথা নীচু করে যন্ত্রে ধার দিতে লাগল। বাথশেবা হাতল ঘোরাচ্ছিল। চাকা ঘোরানোর গতির সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও ওঠানামা করাতে হয়, মাথাটা কেমন ভার হয়ে আসে—মগজ যেন গোল পাকিয়ে যায়। বিশ-তিরিশ বার ঘোরান'র পর বাথশেবা অস্বস্তিবোধ করতে লাগল, আস্তে আস্তে বলল—গ্যাব্রিয়েল, তুমিই বরং ঘোরাও আমি ব্লেড ধরে থাকি। আমার মাথাটা ঘুরছে—কথা বলতে পারছি না।

গ্যাব্রিয়েল তখন চাকা ঘোরাতে লাগল। বাথশেবার মাথায় চিন্তাগুলো এমন ঘোরাফেরা করছিল, যে ব্লেড ধরে থাকতে যতটা মনোযোগের দরকার তা সে দিতে পারছিল না। বাথশেবা বলল—আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—আচ্ছা, আমি আর মিঃ বোল্ডউড কালকে বেড়ার দিকে সরে গেলে কেউ কিছু বলাবলি করছিল কি?

—হ্যাঁ বলছিল বটে—গ্যাব্রিয়েল উত্তর দিল—কিন্তু মিস। ব্লেড ধরা তোমার ঠিক হচ্ছে না—এইভাবে, এইভাবে ধর—গ্যাব্রিয়েল হাতল ছেড়ে দিয়ে তার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে (যেভাবে বাচ্চাদের লেখা অভ্যাস করতে হয়) বলল—একটা দিক এইরকম বাঁকিয়ে ধরে থাক—কথাগুলো বলতে বলতে গ্যাব্রিয়েল অনেকক্ষণ হাত ধরেছিল। বাথশেবা বলল—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার হাত ছেড়ে দাও—আমি হাত ধরে রাখা পছন্দ করি না। নাও, হাতল ঘোরাও।

গ্যাব্রিয়েল নিঃশব্দে তার হাত ছেড়ে দিয়ে হাতল ঘোরাতে শুরু করল।

—লোকগুলো খারাপ কিছু বলছিল কি?—বাথশেবা জিজ্ঞাসা করল।

—না, ঠিক তেমন কিছু নয়।

—তবে কি?

—বলছিল যে, বোধহয় বছর শেষ হওয়ার আগেই তোমার সঙ্গে ফার্মার বোল্ডউডের বিয়েটা হয়ে যাবে।

—ওদের দেখে আমার তাই মনে হচ্ছিল বটে, এমন বোকার মত কথা বলে। আসলে এসব কিছুই সত্যি নয়—তুমি এই কথার প্রতিবাদ কর—এটাই আমি চাই, আর এই কথাই আমি তোমায় বলতে এসেছি।

গ্যাব্রিয়েল যেন দুঃখ পেল এবং কথাগুলো বিশ্বাস করল না—বাথশেবা আবার বলল—আমাদের কথাবার্তাও বোধহয় শুনেছে ওরা।

গ্যাব্রিয়েল বিস্মিত হয়ে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল— কিন্তু তাহলে বাথশেবা—

—বলো মিস্ এভার্ডিন--বাথশেবা মর্যাদার ভঙ্গিতে বলল।

—আমি বলছিলাম যে মিঃ বোল্ডউড যদি তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে থাকেন, তবে সেটা নিশ্চয়ই নিছক খুশী করাব জন্যে নয়—আমিও তোমাকে যথাসাধ্য খুশী করার চেষ্টা কবেছিলাম।

বাথশেবা অবাক হয়ে গেল। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত এই লোকটিব প্রতি অনুকম্পা না রাগ, কোনটা হওয়া উচিত সে বুঝতে পারছিল না।

—না, না, তুমি শুধু এই কথা বলবে যে মিঃ বোল্ডউডেব সঙ্গে আমাব বিয়ে হওয়ার গুজবটা ঠিক নয়।

—তুমি চাইলে অবশ্যি তাই বলব মিস এভার্ডিন। কিন্তু আমাব মতে—

—তোমার কোনও মতামত আমি জানতে আসি নি।

—ও, আচ্ছা—আমি বুঝতে পারিনি—গ্যাব্রিয়েল চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে মাটির দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বলল।

বাথশেবা তাড়াতাড়িতে যে কোনও কাজ কবলেই তাতে হঠকারিতা প্রকাশ পেত কিন্তু চিন্তা বা পবামর্শ করার মত সময়ও সে সর্বদা পেত না। তাছাড়া এই গ্রামের সমস্ত লোকের মধ্যে সে নিজের মতামত ছাড়া আর যার কথায় বেশী গুরুত্ব দিত সে হ'ল গ্যাব্রিয়েল ওক। তাব চরিত্রের সততা এতদূর নিশ্ছিদ্র যে, বাথশেবার অন্য পুরুষেব প্রতি প্রেম বা বিবাহ সম্পর্কেও গ্যাব্রিয়েল নিঃস্বার্থ মতামত পোষণ করত। তার নিজের প্রণয় যেহেতু পূর্ণ হওয়ার নয় তাই অন্যকে সে আহত করতে চাইত না। বুঝেশুঝেই বাথশেবা তাকে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেছিল, যাতে সঠিক উত্তরটা পাওয়া যায়। কিছু কিছু সুন্দরী স্ত্রীলোকের স্বার্থপরতা এমনই। তবে এটাও হয়তো ঠিক, যে কাছাকাছি আর কোথায়ও যথাযথ পরামর্শ পাওয়ার উপায় ছিল না।

বাথশেবা আস্তে আস্তে বলল—আচ্ছা, কি তোমার মতামত শুনি?

—কোনও চিন্তাশীল, নম্র ভদ্রঘরের মেয়ের পক্ষে এমন কাজ করা ঠিক নয়।

বাথশেবার মুখ মুহূর্তে সিঁদুরের মত লাল হয়ে গেল। সে চুপ করে থাকলেও মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তীব্র ঝাঁঝ বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে।

গ্যাব্রিয়েল একটা ভুল করে ফেলল—তুমি হয়তো আমার এই তিরস্কার পছন্দ করছ না—শুনতে খারাপ লাগলেও আমি তোমাব ভালর জন্যই বলছি।

বাথশেবা তক্ষুনি বিদ্রূপেব সঙ্গে বলল—আমি তোমার মত মতকে অত গুরুত্বই দেই না।

—বেশ ভাল কথা—কিন্তু আমি যা সঠিক মনে কবি তাই বলি আব যথেষ্ট গুরুত্ব দিযে বলি।

—ও! কিন্তু দুর্ভাগ্যাবশতঃ তোমাব গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনলে হাসি পায় আব গুরুত্ব ছাডা বললে তবুও একটু আধটু বোঝা যায়।

এই তীক্ষ্ণ বিদ্রুপে গ্যাব্রিয়েল রেগে গেল। বাথশেবাব মেজাজ আগে থেকেই খারাপ ছিল। সে ফুঁসে উঠল—কোনটা আমাব অভদ্র আচবণ, জানতে পাবি কি? তোমাকে বিয়ে কবতে বাজী না হওয়া, তাই তো?

—কক্ষনো না—গ্যাব্রিয়েল ধীরভাবে বলল—ও চিন্তা আমি বহুদিন ছেডে দিয়েছি।

—না কি, মনে মনে এখনও চাও? বাথশেবা ভাবল অপর পক্ষ তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পডবে। কিন্তু গ্যাব্রিয়েল নিস্তেজভাবে বলল—হতেও পারে।

মেয়েরা অনেক সময় তীব্রভাবে আহত হতে ইচ্ছা কবে—কারণ অপব পক্ষকে আঘাত কবাব মত উত্তেজক অবস্থায় নিযে যাওয়াই আঘাত পাওয়ার সার্থকতা—সে এক মধুর জয়। বাথশেবাও তাই চাইছিল। গ্যাব্রিযেল আব একটু উচ্চস্বরে বলতে লাগল—আমাব মনে হয, মিঃ বোল্ডউডেব সঙ্গে এমন মস্করা কবা তোমার ঠিক হযনি। যে লোকটিকে তুমি আদপেই কেয়াব কব না, তাকে নাচানোর মধ্যে প্রশংসা কবাব মত কিছুই নেই। আব যদি তোমাব তাকে ভাল লাগে, তবে এমনি চিঠি লিখে জানালেই পাবতে, ভ্যালেণ্টাইনএব চিঠি দিযে ইয়ার্কি কবা উচিত হয় নি।

বাথশেবা হাত থেকে কাঁচিটা বেখে দিল—আমি চাই না, আমাব একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার স্যাপারে অন্য কেউ নাক গলাক। একদম নয়—অতএব এই সপ্তাহের শেষে তুমি আমাব ফার্ম ছেডে চলে যাবে। বাথশেবাব নিচের ঠোঁটটা কাঁপছিল।

—ঠিক আছে, তাই হবে—গ্যাব্রিয়েল ধীরভাবে বলল—এক্ষুনিও চলে যেতে পাবি।

—তবে তাই যাও—তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছিল কিন্তু গ্যাব্রিয়েলেব মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না।—আর যেন তোমাকে না দেখতে হয় এখানে।

—ঠিক আছে মিস এভার্ডিন, তাই হবে। বলে গ্যাব্রিয়েল যন্ত্রপাতি নিয়ে ধীরপদে বেরিয়ে গেল।

॥ ১৯ ॥

গ্যাব্রিয়েল ওক ওযেদাববেবীব ফার্ম ছেড়ে যাওয়াব পবে চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি। ববিবাব দিন বিকেলবেলা এক নতুন বিপদ দেখা দিল। বাথশেবা তখন গীর্জায় যাবে বলে ওপব থেকে নামছে। লাল ঠোঁট দুটো চেপে ধবে হাতে দস্তানা পবতে পবতে দেখল—নীচে দাঁড়িযে আছে তাব ফার্মের যত বয়স্ক কর্মচাবীবা, জোসেফ পুয়োবগ্রাস, হেনবি ফ্রে, ম্যাথু মুন, আবও ছয় সাতজন। তাবা কেউই গুছিযে কিছু বলতে পারছে না।—সবার মুখেই একটা ভয় ও আতঙ্কেব ছাপ, অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক কথা থেকে যেটুকু বোঝা গেল তা'হল প্রায় ষাট বা সওবটা ভেড়া মাঠেব বেড়া ভেঙে বাইবে চলে গিয়েছিল পাশেব মাঠে। সেখানে বিষাক্ত কোনও ঘাস বা পাতা খেয়ে সবগুলোব দারুণ পেট ফেঁপেছে এবং এখনই তাদেব চিকিৎসাব ব্যবস্থা না কবতে পাবলে আব কিছুক্ষণেব মধ্যেই টপটপ করে সবগুলোই মবে যাবে।

বাথশেবা প্রেয়াব বুক ছুঁড়ে ফেলে গালাগালি দিয়ে উঠল—বোকা গর্দভ গুলো! তোমবা আমাব কাছে এসেছ কেন? নিজেবা চিকিৎসাব ব্যবস্থা করতে পাবছ না—নিষ্কর্মাব ঢেঁকি সব।

রেগে গেলে বাথশেবাকে প্রকৃত সুন্দব দেখায়—বজোগুণটাই তার মধ্যে বেশী। হন্তদন্ত হয়ে সে বেবিয়ে পড়ল মাঠেব উদ্দেশ্যে, যেখানে অসহায় ভেড়াগুলো মৃত্যুব জন্য প্রহব গুনছে। পেছন পেছন দৌড়তে দৌড়তে চলল তাব কর্মচাবীরা। বাথশেবাকে পেয়ে সকলেরই কর্মক্ষমতা কিছুটা যেন বেড়ে গেল। প্রত্যেকেই ঘুবে ঘুবে দেখতে লাগল, কোন ভেড়াটার কী অবস্থা। প্রায় সবগুলোর মুখ দিয়েই গেঁজা বেবোচ্ছিল—পেট ফুলে ঢাউস হয়েছে আর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বাথশেবা অসহায় ভাবে বলে উঠল—আর পাবি নে—ভেড়াগুলোর পেছনে সর্বদাই কোন না কোন বিপদ লেগেই আছে—একটা বছব একটু ভাল যায় না।

লাবান টল বলল—এদের বাঁচানোব একটা উপায় আছে।

—কি উপায় বলতো?

—ওদের পাকস্থলার এই পাশটায় যন্ত্র দিয়ে একটা ছিদ্র করে দিতে হবে।

—তুমি জান সেটা—অথবা আমি কি পারব ?

—না ম্যাডাম, আমরা জানি না, আপনিও পারবেন না—ও একটা বিশেষ জায়গা আছে—এক ইঞ্চি এদিক ওদিক হলে সঙ্গে সঙ্গে ভেডাটা মরে যাবে। নিয়মমত, শেফার্ডরাও পাবে না।

—তাহলে আর কি হবে—ওদের কপালে মৃত্যুই লেখা আছে।

—এ অঞ্চলে মাত্র একজন জানে—জোসেফ একটু এগিয়ে এসে বলল—সে এখানে থাকলে এতক্ষণ সব সাবিয়ে তুলত।

—কে সে তাকে আনাব বাবস্থা কর।

—শেফার্ড ওক—বলল ম্যাথু—লোকটাব সত্যিই গুণ আছে।

—আলবৎ—সায় দিল জোসেফ পুয়োরগ্রাস।

লাবান টল বলল—হ্যাঁ, ঐ একটি লোকই আছে।

তোমরা আমাব সামনে ঐ লোকটির নাম করবে না—বাথশেবা উত্তেজিত ভাবে বলল—আমি তোমাদের একশবার বলেছি—আমার এখানে কাজ করতে হলে, ঐ লোকটির কথা তুলবে না।—সহসা একটু আশান্বিত হয়ে বাথশেবা বলল—আচ্ছা, ফার্মার বোল্ডউড জানেন না ?

—না ম্যাডাম—বলল ম্যাথু—ওর দুটো ভেডার এইরকম হয়েছিল এই কয়েকদিন আগে। উনি ঘোডাশুদ্ধ লোক পাঠিয়েছিলেন গ্যাবলকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে—গ্যাবল গিয়ে তাই সারিয়ে দিল—তবে হাঁ, ফার্মার বোল্ডউডের এই যন্ত্রটি আছে—অনেকটা পাইপের মত দেখতে। তাই না জোসেফ ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলেছ—যন্ত্রটা ঐরকমই বটে—হেনরি ফ্রে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল—সময় চলে যাওয়াটা তার কাছে প্রাচ্য দার্শনিকের নির্বিকার-চিত্ততার মত।

—আচ্ছা, আচ্ছা, অনেক হয়েছে—বাথশেবা তাড়াতাড়ি করে বলল—এখন কাউকে এনে এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

সবাই ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ল—বিমূঢ়চিত্তে সব ভাবছিল কাউকে আনতে হবে। কিন্তু কাকে আনতে হবে কেউ জানে না। সবাই চলে গেলে মৃত্যু-পথযাত্রী ভেড়াগুলোর সাথে বাথশেবা একাকী দাঁড়িয়ে থাকল—মনে মনে ভাবল—আমি কক্ষণো ওকে আনতে পাঠাব না, কক্ষনো না। এই সময় একটা ভেড়া তার পাগুলো খিঁচতে লাগল। হঠাৎ কেমন একটা আওয়াজ করে

একেবারে নিথর হয়ে গেল। বাথশেবা কাছে গিয়ে দেখল, ভেড়াটা মরে গেছে। হাত কচলাতে কচলাতে বাথশেবা বলল—আমি এখন কি করি, হায় রে, কি করব আমি এখন।

—ওকে আমি কিছুতেই ডাকতে পারব না।

অনেক সময় মুখে যত জোর দিয়ে একটা প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করা যায় অন্তরে ঠিক তার উল্টোটা ঘটে। বাথশেবাও বাইরে যত না না করুক, মনে মনে বুঝছিল গ্যাব্রিয়েলকে ডাকা ছাড়া উপায় নেই। বাথশেবা দৌড়ে সদর ফটক পর্যন্ত গেল এবং হাত তুলে একজন কর্মচারীকে ডাকল। লাবান দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল।

—আচ্ছা ওক এখন কোথায় আছে?

—ঐ তো, টিলাটার ওধারে পুব পাড়ার শেষে—

—তাহলে ঐ ঘোড়ায় চড়ে চলে যাও। আর ওকে ডেকে নিয়ে এস, বলবে আমি বলেছি। লাবান টল দু মিনিটের মধ্যে ঘোড়ার জিন টিন না খাটিয়ে, বিনা লাগামেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সেই দিকে। বাথশেবা দেখতে লাগল—সেই সঙ্গে আর সকলেও দেখছিল। লাবান বটতলা, নকফুল মোড়, মাঝের পাড়া ছাড়িয়ে, টিলা পেরিয়ে নেমে গেল। আসার পথেও ঐগুলো এক এক করে পেরিয়ে আসতে হবে। দূরে একজনকে দেখা গেল ঘোড়ার পিঠে চড়ে ফিরছে। বাথশেবা ভাবল—লাবান নিশ্চয়ই গ্যাব্রিয়েলকে ঘোড়াটা দিয়ে নিজে হেঁটে হেঁটে আসবে। অশ্বারোহী আস্তে আস্তে এগিয়ে এলে, দেখা গেল সে লাবান টল। তাহলে বোধ হয় গ্যাব্রিয়েলকে খুঁজে পাওয়া যায় নি—সে হয়ত চলে গেছে—ভাবল বাথশেবা।

টল সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল—মুখটা ভার। সে বলল—গ্যাব্রিয়েল বলেছে ভদ্রভাবে অনুরোধ না করলে সে আসবে না—অন্ততঃ একজন স্ত্রীলোক একজন ভদ্রলোকের কাছে সাহায্য চাইতে গেলে যতটা নম্রভাবে চাওয়া উচিত।

—ও তাই নাকি? এর মধ্যেই এত ডাঁট বেড়ে গেছে—আমি সাহায্য চাইব—তাও কিনা এমন লোকের কাছে যে একদিন আমার অনুকম্পা প্রার্থী ছিল। অসম্ভব—

আর একটা ভেড়া হাত পা খিঁচতে শুরু করল—মিনিট খানেক পরে সেটিও শেষ। অন্য সকলে তাদের মতামত অবান্তর বলে চুপচাপ দেখতে লাগল। বাথশেবার চোখ দুটো অশ্রুতে পূর্ণ। সে হু হু করে কেঁদে উঠল—সবাই দেখল

—আর লুকোনর কিছু ছিল না বাথশেবার।

উইলিয়ম স্মলবেরী বলল—ম্যাডাম! ওকে একবার নরম করে আসতে লিখুন না—আমার মনে হয় গ্যাবল খুবই নরম মানুষ।

বাথশেবা কান্না বন্ধ করে চোখ মুছল। বিড়বিড় করে বলল—আমাকে—আমাকে জোর করে—যা আমি করতে রাজী নই, তাই বাধ্য হচ্ছি আমি। এস লাবান, ভেতরে এস আমার সাথে।

বাথশেবা ভেতরে গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে তাড়াতাড়িতে একটা চিঠি লিখল খুব বিনীতভাবেই। চিঠিটা একবার পড়ে, ভাঁজ করার আগে, তলার দিকে আবার লিখল—গ্যাব্রিয়েল, আমাকে বিপদে ফেলো না। চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে বাথশেবার মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

চিঠিটা নিয়ে বার্তাবাহক চলে যাওয়ার মিনিট পনের পরেই আবার ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বাথশেবা মুখ বাড়িয়ে দেখল—গ্যাব্রিয়েল আসছে। গ্যাব্রিয়েল কাছাকাছি আসতে বাথশেবা নেমে এল—কাছে এসে বলল—গ্যাব্রিয়েল, তুমি আমার ওপর এত নিষ্ঠুর হলে কি করে?

গ্যাব্রিয়েল বিড়বিড় করে কিছু উত্তর দিল—কিন্তু তার কথা বোঝা গেল না। বাথশেবা মুখ দেখে বুঝতে পারছিল—তার চিঠির কোন কথাটা গ্যাব্রিয়েলকে এখানে টেনে এনেছে। বাথশেবাও মাঠের দিকে এগুলো।

গ্যাব্রিয়েল ততক্ষণে অর্ধমৃত ভেড়াগুলোর মধ্যে পৌঁছে গেছে। সে তাড়াতাড়ি করে কোট খুলে ফেলল—জামার হাতা গুটিয়ে নিল আর পকেট থেকে বার করল সেই যন্ত্র। যন্ত্রটা একটা টিউবের মত, মাথার দিকটা ছুঁচলো, বর্শা আকারের। গ্যাব্রিয়েল ঠিক একজন হাসপাতালের সার্জেনের মত দক্ষতার সঙ্গে যন্ত্রটার ব্যবহার করছিল। ভেড়াগুলোর পেটের বাঁদিকে সে হাত বুলিয়ে দেখছিল—তারপর ঠিক জায়গাটি বেছে নিয়ে, চামড়ার মধ্যে একটা ছিদ্র করে দিচ্ছিল—টিউবটা ঢুকে গেলে, বর্শা আকারের ফলাটা টেনে বার করে নিচ্ছিল ক্ষিপ্রহাতে। আর সঙ্গে সঙ্গে টিউবের মধ্য দিয়ে হুস করে বেরিয়ে এল বাতাস।

তীব্র কষ্টের পরে একটু আরাম পেলেই মনে হয়, রোগের অর্দ্ধেক আরোগ্য হয়ে গেছে। বেচারা ভেড়াগুলোকে দেখে সেইরকমই মনে হচ্ছিল এখন। উনপঞ্চাশটি ক্ষেত্রে অপারেশন সফল হ'ল। কেবল তাড়াহুড়োর জন্যে গ্যাব্রিয়েল একটা ক্ষেত্রে ঠিক জায়গায় ছিদ্র করতে পারল না। চারটে ভেড়া

আগেই মারা গিয়েছিল—আর তিনটি এমনিতেই সুস্থ হয়ে উঠল।

এই প্রেমতাড়িত পুরুষটির দীর্ঘ পরিশ্রমের পর হাত দুটো ক্ষান্ত হ'লে, বাথশেবা কাছে এসে দাঁড়াল, মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল—গ্যাব্রিয়েল, তুমি আমার এখানে থাকবে?—তার হাসিতে যেন সুনিশ্চিত জয়ের লক্ষণ—ঠোঁট দুটো তখনও খোলা। আরও একবার হাসির আভাস।

—আচ্ছা থাকব। বলল গ্যাব্রিয়েল।

বাথশেবার মুখে আবার হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

॥ ২০ ॥

জুনমাস এসে গেল। এখনই ভেড়াদের গা থেকে পশম কেটে নেওয়া একটা উৎসবের মত ব্যাপার। লোকজনও যেমন বেশী লাগে তেমনই হৈ-চৈ হয় প্রচুর আর খাটুনিও প্রচণ্ড। রোদ্দুরের দিকে পেছন করে সব হাঁটু গেড়ে বড় বড় কাঁচির মত যন্ত্র নিয়ে বসেছিল— ধারালো আগায় সূর্য্যকিরণ ঠিকরে পড়ছে। আজকের এই দৃশ্যের সঙ্গে চারশো, পাঁচশো বছরের আগেকার এই 'শীপ-শীয়ারিং' উৎসবের কোনও বৈপরীত্য নেই। শহরের সঙ্গে তুলনা করলে, ওয়েদারবেরী যেন অপরিবর্তনীয়। লণ্ডনে বিশ তিরিশ বছরেই সময় পুরনো হয়ে যায় আর প্যারিসে পাঁচ দশ বছরও লাগে না। কিন্তু এই ওয়েদারবেরী গ্রামে তিন-চার কুড়ি বছরও বর্তমানেরই অন্তর্ভুক্ত—কেবলমাত্র শতাব্দীর পরিমাপেই সময়ের দূরত্ব বিচার হয়। এখানকার মানুষের পোষাক কিছুই পরিবর্তন হয় না—মুখের কথা একেবারেই পাল্টায় না। ওয়েসেক্সএর এইসব গৃহকোণে বহিরাগত কেউ এলে মনে হবে প্রাচীনকাল সবে পুরনো হ'ল, পুরনো এখনও নতুন আর বর্ত্তমানটাই এদের ভবিষ্যৎ। প্রাচীনকালের এই গোলাবাড়ীর সঙ্গে তাই লোকগুলোকে মানিয়েছিল বেশ। ভেড়াগুলোকে পেছনদিকে ঘেরা একজায়গায় এনে জড় করা হয়েছিল এবং তিনটে চারটে করে এগিয়ে দেয়া হচ্ছিল সামনে, যাতে পশম কেটে নেওয়া থেমে না থাকে। পুরুষদের পেছনেই একটু ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল তিনটি মেয়েলোক—তারা পশমগুলো সঙ্গে সঙ্গে জড় করে, পাকিয়ে বড় বড় উলের গোলা বানিয়ে রাখছিল। তাদেরকে একটু সাহায্য করছিল বুড়ো সরাইওয়ালা—অক্টোবর থেকে এপ্রিল সে সরাইখানার বাইরে বিশেষ বেরোয় না বটে—কিন্তু বছরের

অন্যান্য সময় যথাসাধ্য টুকটাক কাজকর্ম করে।

এদের সকলের পেছনে দাঁড়িয়ে বাথশেবা লক্ষ্য রাখছিল—যাতে ভেড়াগুলোর কোনটার গা টা কেটে-কুটে না যায় অথচ পশমগুলো ভাল করে পুঁচিয়ে কেটে নেওয়া হয়। গ্যাব্রিয়েলকে ইতস্ততঃ দেখতে হচ্ছিল ঠিক ঠিক ভেড়াগুলোকে এগিয়ে দেয়া হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি। আপাততঃ এখন গ্যাব্রিয়েল লোকগুলোর টিফিনের আয়োজন করছিল।

বাথশেবা কখনও কখনও এদিকে দেখছিল, কখনও কাউকে শুধরিয়ে দিচ্ছিল —একবার এক ছোকরাকে ডেকে বলে দিল একটা ভেড়ার গা থেকে পশম কেটে নেওয়ার পর বাথশেবার নামের আদ্যাক্ষর লিখে দেওয়া হয়নি। গ্যাব্রিয়েল আবার সেটাকে ধরে এনে B, E, লিখে দিল গায়ে—পুরো কাণ্ডটা গ্যাব্রিয়েল এত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছিল যে বাথশেবা মুগ্ধ হয়ে গেল। এরই মধ্যে আবার গ্যাব্রিয়েল কাউকে কাউকে বিশ্রাম দিয়ে নিজেই অস্ত্র চালাচ্ছিল। কিন্তু সেদিনের সকালটা অবিমিশ্র আনন্দে কাটল না। ফার্মার বোল্ডউডকে আস্তে আস্তে পেছন দিকে আসতে দেখা গেল। বোল্ডউডের সঙ্গে এমন একটা গাম্ভীর্যের আবহাওয়া চলাফেরা করত—যে কথাবার্তা একদম বন্ধ হয়ে গেল—বাথশেবা আসতেই হৈচৈ কমে গিয়েছিল আগেই।

বোল্ডউড ধীরে ধীরে বাথশেবার দিকে এগিয়ে গেলে, বাথশেবা তাকে খুব স্বাভাবিক ভাবে সম্ভাষণ জানাল। বোল্ডউড খুব চাপাস্বরে কি যেন বলল বাথশেবাকে—বাথশেবাও অনুরূপভাবে উত্তর দিল। কি তাদের আলাপ হচ্ছিল গ্যাব্রিয়েল শুনতে পায়নি। কাছে এগিয়ে শুনবার মত হ্যাংলাও সে নয়, যদিও একেবারে পাত্তা না দেওয়ার মত নির্বিকারও নয়। কি তাদের আলাপ হচ্ছিল? ভেড়াগুলোর সম্পর্কে কি? নাকি এবছর কেমন পশম বিক্রী হবে সেই বিষয়ে? বোধহয় না—অন্য কিছু। শুধু বাথশেবাকে মনে হচ্ছিল লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। গ্যাব্রিয়েল হাতে কাজ করে যাচ্ছিল—তার মনটা ভার হয়ে গেল।

বাথশেবা বোল্ডউডের কাছ থেকে চলে যাওয়ার পরেও মিনিট পনের বোল্ডউড ইতঃস্তত পায়চারী করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বাথশেবা সবুজ রঙের ঝকমকে পোষাক পরে এগিয়ে এলো—সঙ্গে ঘোড়াটা ধরে নিয়ে আসছিল বাচ্চা বব কোগান। তখন বোল্ডউডও গাছের তলা থেকে তার ঘোড়া খুলে নিয়ে এল। এসব কিছুই গ্যাব্রিয়েলের চোখ এড়াচ্ছিল না।

বরং এইদিকে বারবার দেখার জন্যে সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তার ফলে একটা ভেড়ার পেটের নীচে হঠাৎ খানিকটা কেটে গিয়ে গল গল করে রক্ত বেরুতে লাগল। বাথশেবার চোখে পড়ে গেল তক্ষুনি ব্যাপারটা।—অমনি সে চেঁচিয়ে উঠল—গ্যাব্রিয়েল! তুমিই লোকদের বকাবকি করছ আর দেখ তো তুমি নিজে এটা কি করলে?

অন্য কারও থেকে এই অভিযোগ শুনতে হলে কিছু বলার ছিল না—কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের মনে হল বাথশেবা ভালভাবেই জানে যে এই দুর্ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণ সে নিজে, কারণ, সে ঐ ভেড়ার গায়ের থেকেও আরও কোমল স্থানে আঘাত করেছে। যাই হোক, মনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্যে গ্যাব্রিয়েল ভাবল নিজেকে আর বাথশেবার প্রেমিক বলে ভাববে না। সে চেঁচিয়ে উঠল—কেইনি বল! ওষুধের বাক্স। সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ এল, মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হল—আবার আগের মত সবাই কাজে লেগে গেল।

খুব আলতোভাবে বোল্ডউডের হাত ধরে ঘোড়ায় চাপল বাথশেবা। তার পর আবার সেই ওপরওয়ালার স্বরে আদেশের ভঙ্গিতে বলল—আমি একটু মি• বোল্ডউডের সঙ্গে বেরোচ্ছি—গ্যাব্রিয়েল, তুমি সব দিকে লক্ষ্য রেখ।

এতকাল গ্রামের লোকেরা বোল্ডউডকে যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত—তাতে তার বর্ত্তমান আচার আচরণ কিছুটা বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল। ওরা দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে গেলে টেম্পারেন্স মিলার বলে উঠল—তার মানে বিয়েটা হতে আর দেরী নেই। কোগান সায় দিল—আমারও তাই মনে হয়। হেনরি ফ্রে চোখ মুখ কুঞ্চিত করে বলল—আমি বুঝি না, এইসব মেয়েদের বিয়ে করার কি দরকার—নিজের যা আয় আর সম্পত্তি আছে—তাতে বিয়ে করে আর একটা মেয়ের ভাত মারছে না? যাক গে, হতে দাও—এখন আর দুজনে দুই বাড়ীতে না জ্বালিয়ে তবু একত্র হবে।

(দোষ আর গুণের মধ্যে, দোষের দ্বারাই মানুষের পরিচিতি নির্দিষ্ট হয়—গুণ ঢাকা পড়ে যায়। সূর্যকিরণের সাতটা রঙের মধ্যে যে রশ্মিগুলো বস্তুর দেহে মিলতে পারে না, সেইটাকেই আমরা তার রঙ বলি। বাকী মিলে যাওয়া রশ্মিগুলোর পরিচয় ফুটে ওঠে না।) বাথশেবা তাই হেনরি ফ্রের মত কিছু লোকের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। হেনরি বলে যেতে লাগল—আমি এক আধবার ছুটো একটা কথা বলতে গিয়ে, সে যা ব্যবহার পেয়েছি—কি আর বলব?—তোমরা তো জানই, আমি কি রকম সোজা কথার মানুষ—আমি শুধু

গিয়ে বললাম—ম্যাডাম, আপনার তো কয়েকটা কাজ খালি রয়েছে—যোগ্য লোক রয়েছে, তবুও—মেয়েছেলের বুদ্ধি তো কত আর হবে—

—হুঁঃ, এটা হক কথা বলেছ—যতই হোক মেয়েছেলের বুদ্ধি তো—

—তো আমি বেলিফের কাজের কথাটাই বলতে গিয়েছিলাম—আমার জন্যে—আমি কি আব অত বোকা। একটু ঘুরিয়ে মানে সোজাসুজি না বলে—মনের কথা বুঝতে দিলে চলে নাকি? যাক গে যাক—যাকে খুশী বিয়ে করুক, বিয়েটা হয়ে যাওয়াই ভাল। সেদিন তো বোধ হয় ঐ ঝোপের পাশে যখন সরে গেল দুজনে—বোল্ডউড নিশ্চয়ই ওকে চুমু খেয়েছিল।

—মিথ্যে কথা—গ্যাব্রিয়েল বলে উঠল।

—তাই নাকি ? তা তুমি কি করে জানলে হে?—হেনরি বলল আস্তে

—মিস এভার্ডিন আমাকে বলেছে সেদিন কি হয়েছিল না হয়েছিল—গ্যাব্রিয়েলেব কথাব ভঙ্গিতেই প্রকাশ পাচ্ছিল যে সে অন্যদের থেকে এক আলাদা চরিত্রের মানুষ।

গ্রামবাসীদের কথাবার্তা শুনে শুনে গ্যাব্রিয়েলও অবশ্যি মনে মনে ধারণা করে নিয়েছিল যে হয়তো বোল্ডউডেব সঙ্গেই বিয়ে হয়ে যাবে বাথশেবার। কিন্তু তাতে তার বাথশেবার প্রতি ভালবাসা একটুও কমে নি। গ্যাব্রিয়েলের গাম্ভীর্য্য এবং বাথশেবার স্পষ্ট ইঙ্গিত যে সে গ্যাব্রিয়েলকেই অন্যদের থেকে বেশী দায়িত্বশীল মনে করে এবং হয়তো তাকেই 'বেলিফ' করতে চায়—এইসব ভেবে চিন্তে সকলেই কিছুক্ষণেব জন্যে চুপচাপ হয়ে গেল। কেইন বল তখন আব-হাওয়াটাকে সহজ কবার জন্যে বলে উঠল—আজ রাত্রে যা একটা ভোজ হবে না। আঃ সকাল থেকেই ময়দা ঠাসার কাজ শুরু হয়ে গেছে—

—মাংসও এসেছে গাড়ীভর্ত্তি হয়ে—বলল মেরিয়ান।

—ব্যস চালাও ফুর্ত্তি—ভাল খাওয়া পেলে ভাই আমি সব কিছু করতে রাজী—জোসেফ পুয়োরগ্রাস বলে উঠল—শরীরটাই আসল। তাই কিনা? খাওদাও আর ফুর্ত্তি কর—নাও ভাই হাত চালাও।

সেই রাত্রের ভোজের জন্যে এক লম্বা টেবিল পাতা হয়েছিল বাড়ীর বাইরের ঘাসে ছাওয়া উঠোনে টেবিলটার মাথার দিকে ফুট দুয়েক ঘরের মধ্যে ঢোকানো—আর বাকীটা বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলায়—মধ্যিখানে একটা খোলা জানালা। জানালার ভিতর দিকে মিস এভার্ডিনের বসবার জায়গা।—সেখান

থেকে বাইরে সকলের খাওয়ার দৃশ্য দেখা যেতে পারে যাতে কর্মচারীদের থেকে তফাতে থেকেও তাদের সঙ্গেই একসাথে খাওয়া যায়।

বাথশেবাকে অন্যদিনের থেকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল—তার গালে ও ঠোঁটে একটা রাঙা আভা, কালো চুলের সঙ্গে সেটা দেখাচ্ছিল বেশ। বাথশেবার উল্টোদিকের সীটটা তারই ইচ্ছায় ফাঁকা রাখা ছিল। সকলে খাওয়া শুরু করলে বাথশেবা গ্যাব্রিয়েলকে ডেকে সেখানে বসতে বলল।

এমন সময়ে মিঃ বোল্ডউড সদর দরজা পেরিয়ে আস্তে আস্তে এসে ঢুকলো। বাথশেবার কাছে দেরী হওয়ার জন্যে মার্জনা ভিক্ষা করল—অর্থাৎ আগে থেকেই তার আসার কথা ছিল নিশ্চয়ই।

বাথশেবা গ্যাব্রিয়েলকে আবার ডেকে বলল—গ্যাব্রিয়েল, তুমি একটু বাইরে গিয়ে বসবে—মিঃ বোল্ডউডকে বসতে দেবে ওখানে?

ওক নীরবে তার পুরনো সীটে গিয়ে বসে পড়ল।

মিঃ বোল্ডউড-এর পোষাক আষাক আজ নেহাৎ সাধারণ নয়—নতুন কোট গায়ে তাঁকে খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছিল—মেজাজটাও বোধ হয় খুব খুশী। তাই সারাক্ষণ তাকেই আলাপ করতে দেখা গেল। বাথশেবাও যেন মিঃ বোল্ডউড আসার পর থেকে খুশীতে ভরপুর। শুধু পুরনো বেলিফ (যে চুরি করে পালিয়েছিল) পেনিওয়েজ এই ভোজে এসে হাজির হওয়াতে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

খাওয়া দাওয়া সারা হলে বাথশেবা সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে উঠে পড়ল। ঘরের ভিতর দিকে মিঃ বোল্ডউড তখন কাচের জানালাগুলো টেনে টেনে বন্ধ করছেন। জ্যান কোগান, জোসেফ পুয়োরগ্রাস, পুরনো বেলিফ, নানারকম আলাপ হাসি ঠাট্টা করতে করতে এগুতে লাগল। ওক তখন একটু তফাতে সিডার গাছগুলোর তলায় খুব ধীরে পায়চারী করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে এক আবেগময় নাটকীয় দৃশ্যের অভিনয় চলছে—মিস এভার্ডিন আর বোল্ডউড ছাড়া আর কেউ ছিল না সেখানে। বাথশেবার ঔজ্জ্বল্য অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে—কিন্তু তার চোখে প্রকাশ পাচ্ছিল এক জয়ের দীপ্তি—যে জয়ের কথা সে মনে মনে চিন্তা করেছিল মাত্র, কিন্তু মনেপ্রাণে চায়নি কখনও।

বাথশেবা একটা চেয়ারের পেছনদিকে দাঁড়িয়ে। এই চেয়ারেই সে একটু আগেও বসেছিল—আর তার বিপরীতে মিঃ বোল্ডউড একটু সামনে ঝুঁকে তার দুই হাতে বাথশেবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে। খুশীতে বোল্ডউড চঞ্চল হয়ে উঠেছিল

—বাথশেবা খুব কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—আমি চেষ্টা করব। যদি মনে হয় যে আমি আপনার যোগ্য স্ত্রী হতে পারব—তাহলে আমার এই বিয়েতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু মিঃ বোল্ডউড এসব ব্যাপারে একটু ভেবেচিন্তে এগুনোই ভাল—কাজেই এক্ষুনি আমি কোন কথা দিতে পারছি না। আমি বরং বলি—আর কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখুন না।—

—কিন্তু তখনও কি পরিস্থিতির কোনও পরিবর্ত্তন—

—না, আর পাঁচ ছয় হপ্তা পরে, ফসলগুলো ঘরে উঠে গেলে—আমার মনে হয় আমি আপনাকে সম্ভবতঃ কথা দিতে পারব।—বাথশেবা খুব দৃঢ়স্বরে বলল—কিন্তু এখন আপনাকে কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না—

—ঠিক আছে, আমি এখনই আর কিছু চাই না। সেই সময় পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। এখন তাহলে চলি মিস্ এভার্ডিন—গুড নাইট।

—গু-ড-নাইট—বাথশেবা বলল খুব সৌজন্যের সঙ্গে, প্রায় কোমল সুরে।

এখন বাথশেবা অনেক সহজ বোধ করতে লাগল—বোল্ডউডের অন্তরের কিছুই আর গোপন ছিল না তার কাছে—আর যে অপরাধবোধে বাথশেবা এতদিন কষ্ট পাচ্ছিল তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত যেন হয়ে গেল—অন্ততঃ নিজের মনে খুঁৎ খুঁৎ করার মত আর কিছু ছিল না।

॥ ২১ ॥

বেলিফ বেটাকে বিদেয় করার পর বাথশেবার বাড়তি কাজগুলোর মধ্যে একটা ছিল শুতে যাওয়ার আগে সমস্ত বাড়ীটা একবার চক্কর দিয়ে আসা—সব ঠিক ঠিক আছে কিনা। গ্যাব্রিয়েল অবশ্যি প্রতিদিনই বাথশেবা বেরোনর ঠিক আগে নিজে ঘুরে দেখে আসত সব, কিন্তু সে কথা তার মনিব জানত না, আর একটু আধটু জানলেও বিশেষ আমল দিত না। প্রেমিক পুরুষকে বেচাল হতে দেখলে মেয়েরা যে পরিমাণে মুখ ফুলিয়ে থাকে, প্রেমিকের অচঞ্চল একনিষ্ঠতাকে কিন্তু তেমনভাবে স্বীকার করে না।

বাথশেবা বাইরে বেরোনর সময় একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোত।—লণ্ঠনটার বাইরে থেকে ঢাকা—কারণ আঁধার থাকলে পাহারা দেওয়ার সুবিধে হয়—শুধু সন্দেহ হলে সে আলোটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়ে আশেপাশে দেখে নিত। এইভাবেই চলছিল, কারণ ভয়ের বিশেষ কিছু ছিল না।—বড় জোর দেখা যেত

কোনও ঘোড়াকে হয়ত রাত্রির জাবনা দেওয়া হয় নি—বা হাঁস মুরগীগুলো সবকটা ঘরে ওঠেনি অথবা কোনও দরজাটা খোলা পড়ে রয়েছে। সবদিক ঘুরে বাথশেবা উত্তরের রাস্তা দিয়ে আসত ঘরে—সেদিকটায় শীতকালে বাতাস আটকানোর জন্যে কিছু দেবদারু গাছ লাগানো হয়েছিল। গাছের ঘনত্বে আর পাতার ছায়ায় জায়গাটা সর্বদাই অন্ধকার হয়ে থাকত—জায়গাটাকে মনে হত একটা আপনা থেকে গড়ে ওঠা বিরাট হলঘর, বড়বড় গাছের থামের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে।

রাত্রিতে হাঁটাচলার পক্ষে এই জায়গাটাই ছিল সবচেয়ে ভয়ের—যদিও কখনও প্রয়োজন হয় না তাই বাথশেবা কোনও সঙ্গীর কথা চিন্তা করে নি। সেদিনও নিঃশব্দে হাঁটছিল বাথশেবা। হঠাৎ মনে হ'ল অপর প্রান্ত থেকেও কারও পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু নিজের পদশব্দের সঙ্গে সে গুলিয়ে ফেলেছিল ব্যাপারটা। পরক্ষণেই তার মনে হল—এটা সাধারণের রাস্তা, তাই হয়তো কোনও গ্রামবাসী রাত করে বাড়ী ফিরছে—হয়তো অন্ধকারতম জায়গাটাতেই লোকটার মুখোমুখি হতে হবে—যদিও সেটা তারই সদর দরজার সামনে।

আস্তে আস্তে পদশব্দ আরও স্পষ্ট হল—এগিয়ে এল—অবশেষে একটি লোক তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল—কিন্তু হঠাৎ যেন বাথশেবার স্কার্টে কিছু একটা আটকে গিয়ে মাটির দিকে টেনে ধরল। ঘটনার আকস্মিকতায় বাথশেবা হতভম্ব হয়ে গেল—একটু পরেই গরম পোষাক ও বেল্টপরা একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল তার।

—বাঃ বেশ তো ব্যাপার—একটা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল—লাগল না কি বন্ধু ?

—না—বাথশেবা একটু সরে গিয়ে বলল।

—আমরা দুজনেই মনে হচ্ছে আটকে গেছি।

—হ্যাঁ।

—তুমি কি মেয়েছেলে ?

—হ্যাঁ—

—ওহো দুঃখিত—মহিলা বলা উচিত ছিল আমার।

—না ঠিক আছে—

—আমি বেটাছেলে

—ও!

বাথশেবা আবার ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল—কিন্তু পারল না।

—ওটাতো একটা লণ্ঠন মনে হচ্ছে, তাই না?

—হ্যাঁ।

—দেখি, আমার কাছে একটু দাও তো, তোমাকে যদি ছাড়িয়ে দিতে পারি।

লোকটা আলো নিয়ে বাড়িয়ে দিল—ওপরের ঢাকনা খুলে ফেলল—বাথশেবা আশ্চর্য্য হয়ে দেখে, যে লোকটার সঙ্গে সে আটকে গেছে সে একটি সৈনিক। নিঃস্তব্ধতার মধ্যে ঢাক পেটালে যেমন মনে হয়—এই লোকটির উপস্থিতি বাথশেবার কাছে সেইরকম মনে হচ্ছিল। আলোর থেকেও, এই আলোকিতবস্তুর জন্যেই যেন অন্ধকার কেটে গেল একেবারে। বাথশেবা যে এতক্ষণ ভাবছিল কোনও কুৎসিত দন্তিাদানোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, তার বদলে এই বিপরীত অভিজ্ঞতায় সে আশ্বস্ত হল।

এতক্ষণে বোঝা গেল যে এই সৈনিকের পোষাকের ধাতব কোনও হুকে বাথশেবার স্কার্টের ঝালর আটকে গেছে।

লোকটি খুবই চটপটে। সে তাড়াতাড়ি বলল—আমি তোমাকে এখুনি ছাড়িয়ে দিচ্ছি মিস—

—না, না আমি নিজেই পারব—বাথশেবা ততোধিক তাড়াতাড়ি উত্তর দিল। কিন্তু ঝালরগুলো এমনভাবে জড়িয়ে গিঁট পড়ার মত হয়ে গিয়েছিল যে ছাড়িয়ে নেওয়া বড সহজ ছিল না। লণ্ঠনটা মাঝখানে নামিয়ে রেখে লোকটা নিজেও চেষ্টা করল খানিকক্ষণ। লণ্ঠনের আলোয় তাদের দুজনের বিরাট ছায়া ছড়িয়ে পড়েছিল গাছগুলোর ওপর। বাথশেবা আড়চোখে তাকিয়ে দেখল—লোকটি যুবক—সুন্দর চেহারা—এবং তার কাঁধে তিনটি তারা চিহ্ন। বাথশেবা একবার টান দিয়ে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল—পারল না।

—মিস্ তুমি এখন বন্দী—কাজেই বৃথা চেষ্টা করে লাভ নেই। এত যদি তাড়া থাকে তো তোমার স্কার্টের এখান থেকে কেটে দিতে হয়।

—হ্যাঁ তাই দাও। বাথশেবা অসহায় ভাবে বলল।

—কিন্তু আর একটু যদি অপেক্ষা কর তবে তার দরকার হবে না।

বাথশেবা তার হাত সরিয়ে নিল কিন্তু লোকটি ইচ্ছা করেই হোক বা

অনিচ্ছাতে হোক—তার হাতে হাত ছোঁয়াল একবার। বাথশেবা কোনও অজ্ঞাত কারণে বিরক্তি বোধ করল।

লোকটি গিঁট খুলতে লাগল—কিন্তু শেষ আর হয় না। বাথশেবা আবার তার মুখের দিকে তাকাল। তরুণ সার্জেণ্টটি কোনও ভূমিকা না করেই বলল—

—তোমার এই সুন্দর মুখ দেখতে পাওয়ার জন্যে ধন্যবাদ।

বাথশেবা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল—কিন্তু খুব দৃঢ়স্বরে এবং মর্যাদার সঙ্গে উত্তর দিল—অনিচ্ছাকৃত ভাবে দেখা হয়ে গেল।

—তোমাব এই কঠোরতার ভঙ্গিমাটাই ভাল লাগছে আরও—লোকটি বলল।

—তোমার সঙ্গে আমার এইভাবে দেখা না হলেই ভাল লাগত আমার—বলল বাথশেবা।

সে তুমি আমাকে যত খুশী গালি দিতে পার—কিন্তু গিঁট যে খুলছে না—

—তুমি ইচ্ছে করে আমাকে দেরী করানোর জন্যেই আরো গিঁট পাকিয়ে ফেলছো।

—তাই নাকি? লোকটি যেন মজা করবার সুরে বলল।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই—বাথশেবা রেগে গেল—খুলে দাও বলছি—না হলে আমাকে খুলতে দাও।

—যেমন ইচ্ছা তোমার—সুন্দর কিছু যদি কুকুরের মুখে হাড় ছুঁড়ে দেওয়ার মতও আমার কাছে আসে, তো তাতেই আমি খুশী।

বাথশেবা কিছু বলবে না ভেবে শক্ত করে ঠোঁট চেপে থাকল। সে মনে মনে ভাবছিল স্কার্টের মায়া না করে ছিঁড়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু হাঁক দিলেই তার লোকজন এখনি ছুটে আসতে পারে। বাড়ীর এত কাছ থেকে সে ভয়ে পালিয়ে যাবে? পোষাকটার প্রতি মায়াও কম নয়—এটাই তার সবচেয়ে দামী স্কার্ট—সেদিনের ভোজসভার জন্যে পরেছিল—মানিয়েছিল ভারী সুন্দর।

বাথশেবার নতুন বন্ধু বলল—আচ্ছা, দেখি এইবার, খুলতে পারি কিনা—আমি জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছি—কিন্তু বিশ্বাস কর বা না কর—রাগই কর আর যাই কর—তোমার মত সুন্দর মেয়ে আমি দেখি নি।

—কে হে তুমি, যে অন্যের মতামত অমন অগ্রাহ্য করতে পার?

—একেবারে উটকো কেউ নই—আমি সার্জেণ্ট ট্রয়—এখানেই থাকি—যাক এইবার খুলে গেছে—হায় হায় এই গিঁট যদি কোনদিন না খুলত—

বাথশেবা আরও চটে যাচ্ছিল। সে সরে দাঁড়াল। লোকটিও সরে গেল এখন কিভাবে তার থেকে সহজে বিদায় নেওয়া যায়—সেটাই সমস্যা। বাথশেব লণ্ঠনটা নিয়ে কোন কথা না বলে এক পা এক পা করে সবে গেল যতক্ষণ ন লোকটার লাল কোটটা দেখা যাচ্ছিল। দূর থেকে সে বলল—বিদায় সুন্দরী বাথশেবা তখন দরজা খুলে ঢুকে পড়েছে। সে কোনও উত্তর না দিয়ে দৌড়ে ভিতরে চলে গেল।

লিডি তখন শুতে গেছে—বাথশেবা লিডিব দরজাটা একটু ফাঁক কে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—লিডি! এখানে কোনও সোলজাব থাকে সার্জেণ কি যেন নাম?—বেশভদ্র এবং ভাল দেখতে—একটা নীল বর্ডাব দেওয়া লা কোট গায়ে?

—না তো মিস্—না—ও! হতে পারে, সার্জেণ্ট ট্রয় বোধহয়—আ যদিও তাকে দেখি নি—তবে একবাব এসেছিল এখানে—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ বকমই নাম। একটুখানি গোঁফ আছে—দাডিটা কিছু নেই।

—ঠিক ঠিক।

—কি বকম বে লোকটা?

—ও মিস! কি বলব! খুব হাসিখুশী খুব চালাক আব চটপটে—পোষা আষাকে একদম ফিটফাট। ওব পরিচয় ডাক্তারের ছেলে হিসেবে আব স্বভা জমিদারেব ছেলে।

—বাঃ তাই নাকি?

—হ্যাঁ! আরও কি—ক্যাষ্টার ব্রিজ গ্রামাব স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে— অনেক ভাষা জানে, লোকে বলে চীনা ভাষাও লিখতে পারে। —সত্যি মিথে জানি না—তবে লোকটাব যোগ্যতা আছে। নেহাৎ কিনা সেনা বিভা নাম লিখিয়েছে—তবে সেখানেও তো বিনা চেষ্টাতেই সার্জেণ্ট হয়েছে উচ্চবংশে জন্মানোর গুণ অনেক—সহজেই সব আয়ত্ত হয়ে যায়।

—হুঁ, ঠিকই বলেছিস—গুড নাইট লিডি।

বাথশেবা যতই মনে মনে আনুপূর্বিক ঘটনাটার কথা চিন্তা করছিল— ঠিক বুঝতে পারছিল না লোকটি সত্যই তাকে অপমান করতে চেয়েছি কিনা। অবশেষে নিজে নিজেই বলে ফেলল—ইস্ কি বেহায়ার মত পালিয়ে এলাম আমি—লোকটি এত ভদ্রতা আর সৌজন্য দেখাল—আর আমি কিনা—

—লোকটির ঠোঁট কাটা কথাবার্তায় বাথশেবার এখন আর অপমানবোধ হচ্ছিল না।

বোল্ডউডের প্রধান অক্ষমতা ছিল এই যে, সে কোনদিন বাথশেবাকে সামনা-সামনি সুন্দরী বলতে পারে নি।

॥ ২২ ॥

খামখেয়াল আর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ছিল ট্রয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পুরনো স্মৃতি তার কাছে ছিল ঝঞ্চাট আর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা অবান্তর। বর্তমানের দেখা, শোনা আর স্পর্শ করাই তার কাছে সব। সময়ের গতি চোখের পলক ফেলার মত। গতকালকে সে ভাবত অতীত আর আগামীকালকে ভবিষ্যৎ—এর আগেও নয়, পরেও নয়।

সার্জেন্ট ট্রয় ভবিষ্যতে কোনও কিছু পাওয়ার আশা করত না- তাই কোনদিন বিফলমনোরথ হয়নি। সেজন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হত—তার থেকে নেতিবাচক লাভটাই ছিল তার বেশী। এসব ক্ষতি অবশ্যি মনে না করলে ক্ষতি নয়—বরং যারা এই নিয়ে বেশী ভাবে তাদেরই হতাশ হতে হয় বেশী আর যারা মোটেই ভাবে না তারাই থাকে দিব্যি সুখে।

পুরুষের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রয় মোটামুটি সত্যিকথা বললেও, মেয়েদের সঙ্গে মিথ্যে কথা বলতে সে ছিল অতি দক্ষ—এতে তার নীতিবোধে বাধত না—হাসি ও আনন্দময় পরিবেশে নিজেকে উপভোগ করতে হলে এটাই হচ্ছে সার্থক উপায়।—এবং যেহেতু এই আনন্দ খুব ক্ষণস্থায়ী, অতীতের স্মৃতি মনে রাখতে যাওয়া নেহাৎই বোকামি। ট্রয়ের দোষত্রুটি কখনই অপরকে আহত করত না—তাই তার স্বভাবের জন্য কারও থেকে প্রশংসা না পেলেও, মৃদুহাসি ছাড়া তিরস্কারও সে পায়নি কোনদিন। এইসব কারণে ট্রয় নিজের স্বভাব চরিত্র বিষয়ে বরং উত্তরোত্তর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছিল। কথাবার্তায় সে ছিল চোস্ত। কথার থেকে কাজে তার ফারাক থাকত বিস্তর।

সাধারণ একজন সৈনিকের তুলনায় তার পড়াশুনা ছিল বেশ। অনর্গল কথা বলতে পারার গুণে সে সহজেই নিজেকে দুরকম রূপ দিতে পারত—প্রেমের কথা বলতে বলতে সে ভাবত খাওয়ার কথা—স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যেত স্ত্রীকে দেখবার জন্যে—ধার শোধ করার কথা বলে নতুন ধার কিভাবে পাওয়া যায়

তাই ভাবত। মেয়েদের খুশী করতে হলে একমাত্র উপায় হ'ল তুষ্ট করে চলা—অবিরাম তাদের প্রশংসা করা—একথা ট্রয় ভালভাবেই জানত। ট্রয় বলত—ওদের সঙ্গে যদি সত্যিকথা বল—তাহলেই তুমি মাঠে মারা গেলে।

এহেন দার্শনিকের সাধারণ্যে আবির্ভূত হতে খুব বেশী সময় লাগল না। মিঃ বোল্ডউড কয়েকদিন যাবৎ না আসায় বাথশেবা একটু হাল্কা বোধ করছিল—তখন ফসল কাটার কাজ চলছে—বাথশেবা দেখতে বেরিয়েছিল কাজকর্মের অবস্থা, খড়ের গাদা ঠিকমত সাজান হচ্ছে কিনা ইত্যাদি। পুরুষেরা সারি বেঁধে লাইন দিয়ে কাটার কাজ করছে আর মেয়েরা ফসল বোঝাই করছিল গাড়ীতে, কেউ কেউ পাখী তাড়াচ্ছিল বা মুরগী তাড়াচ্ছিল। গাড়ীটার পেছন দিকে খুব টকটকে লাল পোষাক পরা একজন কাউকে দেখা যাচ্ছিল। সে হ'ল সার্জেণ্ট ট্রয়—এই ফসল কাটার উৎসবে আপন আনন্দে সে যোগ দিয়েছিল নিছক মনের খুশীতে। এই সময় তাড়াতাড়ি ফসল কেটে ঘরে তোলার দরকার—তাই লোকজনের প্রয়োজন খুব। সার্জেণ্ট যে ফার্মের মালিকের খুব উপকারে লাগছিল তাতে সন্দেহ নেই, যদিও তার কাজে ঐকান্তিকতা ছিল না তেমন। বাথশেবা মাঠের দিকে আসতেই ট্রয়ের নজর পড়ল সেদিকে। সে গাড়ী বোঝাই বন্ধ রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। বাথশেবা ঈষৎ রাগ এবং ঈষৎ লজ্জায় একটু হাসল—ট্রয় তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে লাগল পাশাপাশি—টুপিটা মাথার থেকে খুলে হাতে নিয়ে ট্রয় বলল—মিস এভার্ডিন, সেদিন রাত্রে আমি একটুও বুঝতে পারিনি যে আমি কার সঙ্গে কথা বলছিলাম। তবুও 'ক্যাষ্টারব্রিজের রাণী' বলে যে আমি ভুল করি নি—সেকথা বুঝলাম কালকে—অন্য সব ফার্মাররাও দেখলাম শ্রীমতীকে ঐ পরিচয়েই জানে। সে যাই হোক, আমার সেদিনকার আচরণের জন্যে আমি হাজারবার মার্জনা ভিক্ষা করছি—অপরিচিত হিসেবে সেদিন হয়তো একটু বেশী কথাই বলে ফেলেছিলাম। অবশ্যি এখানে আমি একেবারে অপরিচিত নই। আমি সার্জেণ্ট ট্রয়—এখানে এই ফার্মে বহুদিন কাজ করেছি—তখন তোমার কাকা ছিলেন এই ফার্মের মালিক। আজকেও সেই কাজই করছিলাম এতক্ষণ।

—আমার বোধ হয় সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত—সার্জেণ্ট ট্রয়!—খুব নিরাসক্তভাবে বলল বাথশেবা।

সার্জেণ্ট আহত হল—বলল—কক্ষোনো না। তার কোনও প্রয়োজন নেই।

—না থাকলেই ভাল।

—কেন ? কারণ ?

—কারণ তোমাকে আমি কোনও ব্যাপারেই ধন্যবাদ জানাতে চাই না।

—আমি সম্ভবতঃ আমার কথা দিয়ে যে আঘাত করেছি—হৃদয় দিয়ে তা মুছতে পারব না। দুর্ভাগ্য আমাব। সরল বিশ্বাসে কোনও মেয়েকে সুন্দরী বলা যদি অপরাধ হয়—

—না অপরাধ না হলেও কথাটা এমনই শোনায় যেন আমি যেন তোমার ঘরণী।

—সত্যি কথা বলতে কি, অন্য যে কোনও মেয়ের ভালবাসাব থেকে তোমার গালাগালই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি।

বাথশেবার মুখের কথা হারিয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবল—লোকটা এতক্ষণ যে পরিশ্রম ও যে উপকার করেছে সেই বিচাবে তার আরও কিছু তীব্র উত্তর না দেওয়াই উচিত।

—আমি অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ—কোনও কথাই গোপন রাখতে পারি না। সেটা যদি পাপ হয় তো তার যোগ্য শাস্তিই আমি পেয়েছি—তাতে কোন দুঃখ নেই।—

না কথা তা নয়—একজন অপরিচিত লোকের অত সাহস এবং দুবির্নীত আচরণ আমার পছন্দ নয়। সে আমার প্রশংসা শোনার জন্যেও নয়।

—ও তাহলে আমার বলার ধরণটাই তোমার পছন্দ হয় নি—কিন্তু আমি যা বলেছি সেটা তো সত্যি,—যাক এইটুকুই আমার সান্ত্বনা যে আমি ধোঁকাবাজি করি নি। আচ্ছা, তুমি কি চাও, যে তোমাকে দেখার পরেও আমি আমার বন্ধুবান্ধবের কাছে তোমাকে একটি অতি সাধারণ মেয়ে বলে পরিচয় দেব, যাতে তারা তোমার দিকে না তাকায় ? আমি তা পাবব না। অত ডাহা মিছে কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

—তুমি যা বলছ তার সবটাই ভণ্ডামি—বাথশেবা ট্রয়ের চালাকি বুঝেও হেসে ফেলল—সার্জেন্ট ট্রয়! তোমার ছুতোনাতার অভাব নেই—কেন, সেদিন রাত্রে তুমি তো অনায়াসে পাশ কাটিয়ে আমার সঙ্গে কথা না বলে চলে যেতে পারতে—সেইজন্যেই আমি রাগ করেছি—আর কিছু নয়।

—কারণ আমি তা চাইনি—অনুভূতির আনন্দ কোথায় জান—যদি তা সেই মুহূর্তেই প্রকাশ করা যায়। আমি তো অন্য কিছু করিনি—তুমি যদি এর উল্টোটা হতে, যদি কুৎসিত এক থুথ্‌ড়ে বুড়ী হতে—তাহলেও আমি সেই

মুহূর্তে ভয়ে আঁৎকে উঠতাম।

বাথশেবা মনের খুশীভাব আর চাপতে পারছিল না—সে একটু এগিয়ে গেল—ট্রয় পেছন পেছন আসতে লাগল।

—যাক গে, মিস এভার্ডিন, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ তো?

—মোটেই না।

—কেন?

—তোমার এইসব অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার জন্যে।

—আমি কেবলমাত্র বলেছিলাম যে তুমি সুন্দরী—এখনও আমি তাই বলি কারণ তুমি সত্যিই সুন্দরী—আমি জীবনে যত মেয়েকে দেখেছি তাদেব মধ্যে সবার চেয়ে সুন্দরী সন্দেহ নেই।

—না, না, চুপ কর—তোমার কথাবার্তা বড় অভদ্র হয়ে যাচ্ছে—বাথশেবা বলল এমন ভাবে যেন শুনতে তার কষ্ট হচ্ছে অথচ শোনার ইচ্ছে আছে পুরোপুরি।

—আমি আবারও বলছি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। এমন কিছু আহামরি কথা নিশ্চয়ই আমি বলি নি? মিস এভার্ডিন, তুমি হয়তো বিশ্বাস না করতে পার—কিন্তু আমি যা বলেছি তা সত্যি কথা। এজন্যেই আমি ক্ষমার অযোগ্য?

—কারণ এটা ঠিক নয়—বাথশেবা দুর্বলভাবে উত্তর দিল—আমি কাউকে মুগ্ধ করেছি বলে মনে হয় না।

—তোমার এ'রকম মনে হওয়াটা একান্তই বিনয়। কিন্তু অন্যদের কেমন লাগে তোমাকে, সেটা নিশ্চয় তারা তোমাকে বলেছে—আর তাদের কথা তুমি অগ্রাহ্য করতে পার না।

—অন্যেরা কেউ অমনভাবে বলে নি।

—নিশ্চয়ই বলেছে।

—না মানে, তোমার মত এত মুখের উপরে কেউ বলে নি—বাথশেবা যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কথোপকথন দীর্ঘ করে ফেলছিল।

—কিন্তু তারা যে এই রকমই ভাবে, এটা তো তুমি জান?

—না—তবে—লিডিকে বলতে শুনেছি বটে যে ঐরকম মনে করে—কিন্তু —বাথশেবা চুপ করে গেল।

বাথশেবা নিজের অজান্তেই নতি স্বীকার করে ফেলছিল। এই অসমাপ্ত

অর্দ্ধেক কথাতেই তার মনের সমস্ত ভাব প্রকাশ হয়ে গেল। সার্জেণ্ট মনে মনে হাসল। বাথশেবার মনের গোপনে সেই বীজ উপ্ত হয়ে গিয়েছিল—যার পরিণতি লাভ করাটা এখন কেবলমাত্র সময় ও ঋতু পরিবর্ত্তনের ব্যাপার।

—তবেই তো সত্যি কথাটা বেরিয়ে এল, মিস এভার্ডিন! আমার সাদামাটা কথার জন্যে ক্ষমা কোর। প্রকৃতপক্ষে তোমার মত মেয়েরা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক।

—কেন?

—সত্যিকথা সর্বদাই সত্যি—তুমি পছন্দ কর আর না কর, আমাকে ক্ষমা কর বা না কর—তুমি যে সুন্দর দেখতে তাতে আমাদের অনেক ক্ষতি—সার্জেণ্ট মাটির দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—সাধারণতঃ গড়ে একটি পুরুষ একটি অর্ডিনারি মেয়ের প্রেমে পড়ে—তারা বিয়ে করে সুখী হয়,—সংসারধর্ম করে। কিন্তু তোমার মত একটি মেয়েকে পাওয়ার জন্যে কমপক্ষে একশ পুরুষ আশা করে।—তুমি তাদের মধ্যে মাত্র একজনকেই সুখী করতে পার। বাকি নিরানব্বই জনের মধ্যে অন্ততঃ কুড়িজন মদভাঙ খেয়ে সেই ব্যর্থপ্রেমের কথা ভুলে থাকে—আর কুড়িজন যাদেব মধ্যে হয়তো আমিও পড়ি শুধু তোমার পিছে পিছে ঘোরে—তোমাকে একবার দেখবার জন্যে তারা কঠিনতম ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করে না—আর বাকিরা অবশ্যি তাদের আবেগ কাটিয়ে ওঠে ছোটখাট সার্থকতা নিয়ে। কিন্তু এরা সবাই দুঃখী। আর শুধু এই নিরানব্বইটি পুরুষই নয়—তারাও বিয়ে থা করে, ফলে আরও নিরানব্বইটি নারীও এই দুঃখের ভাগীদার।—সেই কথাই বলছিলাম, মিস্ এভার্ডিন। তোমার মত মেয়েরা মানুষের জীবনে আশীর্বাদ নয়।

বাথশেবা কোনও উত্তর দিল না দেখে সে জিজ্ঞাসা করল—

—তুমি ফ্রেঞ্চ জান?

—না, শিখতে আরম্ভ করেছিলাম। ক্রিয়াপদ পর্য্যন্ত শেখা হলে, আমা বাবা মারা গেলেন তাই আর শেখা হয় নি।

—ওঃ ফ্রেঞ্চ ভাষাতে একটা প্রবাদ আছে জান—Qui aime bien Chatie bien—অর্থাৎ যে ভালবাসে, সে অন্তরে পবিত্রতা এনে দেয়, বুঝলে?

—হ্যাঁ—বাথশেবার মত আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন মেয়েরও গলা কেঁপে যাচ্ছিল—তুমি কথা বলায় যত চৌখশ, যুদ্ধে এর অর্দ্ধেক দক্ষতা দেখাতে পারলে বোধ হয় তোমার বেয়নেটের খোঁচাও মিষ্টি লাগবে—বাথশেবা হঠা

বুঝতে পারল যে একথাটা মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে—তাই দুর্বলতা ঢাকতে গিয়ে সে আরও নতিস্বীকার করে ফেলল—তুমি অবশ্যই ভেব না যে, তোমার কথাবার্তায় আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি।

—আমি জানি, খুব ভালভাবেই জানি তোমার ভাল লাগবে না। যেখানে ডজন ডজন লোক রয়েছে তোমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে মিষ্টি কথা শোনাতে—সেখানে আমার এই যেমন তেমন ভালমন্দ কথা তোমার পছন্দ হবে কেন? বোকা আমি হতে পারি। কিন্তু ও'সব ভণ্ডামি আমার নেই। সেদিন রাত্রে তোমাকে যা বলে ফেলেছি সেটা হয়তো আমার দুর্বিনীত জিভের জন্যে—আমি সেজন্যে মার্জনা ভিক্ষা করছি—অন্ততঃ আজ সকালে এতক্ষণ ধরে তোমার কাজে যা খাটুনি খেটেছি—অন্ততঃ সেইজন্যে আমাকে ক্ষমা কোর—

—যাক গে যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে—ওর জন্য মনে কষ্ট পেয়ো না—হয়তো তুমি সেদিন সত্যিকথাই বলেছিলে—মিথ্যে সাজিয়ে বল নি। আর আজকের পরিশ্রমের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু—কিন্তু তুমি আব কখনই আমার সঙ্গে ঐভাবে কথা বলবে না—মোটেই বলবে না—যদি না আমি আগে কথা বলি।

—সে কি? মিস বাথশেবা! এ যে কঠিন নিষ্ঠুরতা।

—না কক্ষনো—

—তোমাকে অবশ্যি খুব বেশী কথা বলতে হবে না—কারণ আমি এখানে আর বেশীদিন থাকব না—আমাকে ফিরে যেতে হবে সেনা ব্যাবাকের প্যারেড আব ড্রিলের মধ্যে—

—কবে তুমি যাবে এখান থেকে—বাথশেবাকে যেন আগ্রহী মনে হ'ল।

—এই মাসখানেকের মধ্যে।

—কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলে তোমার লাভ?

—তোমার বন্ধুত্ব পেয়ে আমি শুধুমাত্র কৃতজ্ঞ মিস এভার্ডিন! তোমার সঙ্গে কথা বলব না সে কি হয়? তুমি হয়ত কোন লোককে বোকা ভেবে 'গুডমর্নিং' বলতে সঙ্কোচ বোধ করতে পার—কিন্তু তুমি যদি সেই লোকটি হতে, তাহলে তোমার মত একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হলে কথা না বলে থাকতে পাবতে?

—সার্জেন্ট! তুমি বৃথা খুশী করার চেষ্টা করছ—বাথশেবা মাথা নাড়তে লাগল—শুধু শুধু মিথ্যের ফুলঝুরি ছোটাচ্ছ।

—আমি একজন সৈনিক হিসেবে বলছি—একটুও মিথ্যে নয়।

—কিন্তু তোমার সঙ্গে তো আমার দেখা হল মাত্র সেদিন।

—তাতে কিছু আসে যায় না। বিদ্যুতের স্পর্শ মুহূর্তের মধ্যে কাজ করে, আমি সেই মুহূর্তেই তোমাকে ভালবেসেছি—এখন যেমন বাসি।

বাথশেবা তার পা থেকে আরম্ভ করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল যত উর্দ্ধে তার দৃষ্টি যায়, কিন্তু সার্জেণ্টের চোখের দিকে সে তাকাতে পারল না।

—অসম্ভব—বাথশেবা দৃঢ়ভাবে বলল—মানুষ হঠাৎ কক্ষণো ভালবাসতে পারে না। এখন দয়া করে আমাকে কটা বাজে বলো তো—আমাকে যেতে হবে—এখানে অনেক সময় নষ্ট করলাম।

সার্জেণ্ট তার ঘড়ির দিকে তাকাল, তারপর বলল—সে কি? তোমার ঘড়ি নেই?

—এক্ষুনি নেই, তবে শিগগিরই একটা হবে।

—না, তোমাকে এটা নিতে হবে—মিস এভার্ডিন! এটা উপহার বলে গ্রহণ কর।

লোকটা কি করতে চায় বোঝার আগেই বাথশেবা দেখে তার হাতের মধ্যে একটা সোনার ঘড়ি।

—এ ঘড়ি ঠিক আমার মত লোকের যোগ্য নয়—সার্জেণ্ট বলল—ঘড়িটার একটা ইতিহাস আছে—ঘড়িটা ওল্টাও, দেখ পিছন দিকে কি লেখা আছে—

বাথশেবা ঘড়িটা ওল্টাল।

—কি লেখা আছে দেখেছ? Cedit amor rebus—প্রেম পরিস্থিতির অনুগামী। সেভার্ণের জমিদারদের ওটাই ছিল প্রতীক। আমার বাবা তাঁর বাপ ঠাকুর্দার কাছ থেকে পেয়েছিলেন এই ঘড়ি—সেই বংশের এটাই আমার উত্তরাধিকারসূত্রে একমাত্র পাওয়া—বহু উৎসব আর জাঁকজমকের সাক্ষী এই ঘড়ি এখন তোমার।

বাথশেবা বিস্মিত হয়ে বলল—কিন্তু সার্জেণ্ট ট্রয়—এ তো আমি নিতে পারবো না—একটা সোনার ঘড়ি—তুমি এ কি করছ?

সার্জেণ্ট এক পা এক পা করে পিছিয়ে যেতে লাগল, না নেবার অছিলায়—আর বাথশেবা তার দিকে হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা ধরে এগিয়ে যেতে লাগল।

—রেখে দাও, মিস এভার্ডিন, রেখে দাও—ওটা তোমারই যোগ্য সম্পদ।

—কিন্তু সে কি করে হয়? তোমার মৃত পিতার স্মৃতিচিহ্ন—আর এইরকম

দামী একটা জিনিষ—

—আমি আমার বাবাকে ভালবাসতাম ঠিকই—কিন্তু তোমাকে আরও বেশী ভালবাসি—তাই তোমাকে দিতে পেরেছি।

বাথশেবা বিস্ময় আর উত্তেজনায় কাঁপছিল—তাই কি হয় নাকি? ছিঃ ছিঃ এ আমি কি করে নেব? তুমি যতটা মনে কর আমি হয়তো তত সুন্দর নই—আর তাছাড়া এমন হঠাৎ দেখায় ভাল লাগতে পারে কি করে? না না তুমি ফেরৎ নিয়ে নাও—

—ওঃ, ভাল লাগতে পারে না?—সে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল বাথশেবার মুখের দিকে।—তাছাড়া, লোকগুলোই বা কি ভাবছে—তোমার পেছন পেছন আমি এভাবে হাঁটছি—উঃ এ কী লজ্জা।

—অন্ততঃ আমাকে খুশী করবার জন্যও একবার পরো বাথশেবা।

—না, না, সে আমি পারব না।

—বেশ তবে দিয়ে দাও—ঘড়িটা সে ফেরৎ নিয়ে নিল—এখন তবে চলি। বাকী যে কটা দিন এখানে থাকব, আমার সঙ্গে কথা বলবে তো?

—হ্যাঁ বলব। অবশ্যি এখনই তা বলতে পারছি না। তুমি কেন এভাবে আমাকে বিরক্ত করতে এলে?

—হয়তো গিঁট খুলতে গিয়ে আমি নিজেই ধরা পড়ে গিয়েছি। আচ্ছা, তোমার খামারে আমাকে কাজ করতে দেবে?

—তোমার ভাল লাগলে করতে পার।

—অনেক ধন্যবাদ মিস এভার্ডিন। বিদায়।

সার্জেন্ট টুপির কাছে হাত নিয়ে গিয়ে স্যালিউট করে দূরে সরে গেল কর্মচারীদের মধ্যে।

বাথশেবা তার লোকজনের মধ্যে আবার ফিরে যেতে পারল না। উত্তেজনার আতিশয্যে তার বুকের মধ্যে কেবলই তোলপাড় করছিল। ভীষণ কান্না পাচ্ছিল তার—তাই আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চলে গেল—মুখে বিড় বিড় করে সে বলছিল—হায়, এ আমি কি করলাম! হে ভগবান! কে জানে কতটুকু এর সত্যি আর কতটাই বা মিথ্যে।

। ২৬

ওয়েদারবেরীতে এ বছর মৌমাছিরা চাকে বসতে দেরী করছিল। ট্রয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার পরদিন বাথশেবা বাগানে ঘুরে ঘুরে দেখছিল মৌমাছিদের কাণ্ডকারখানা। একটা হাত দিয়ে রোদ্দুর আড়াল করে সে আকাশের সীমানা পর্য্যন্ত তাকিয়ে দেখছিল—কোন কোন গাছের ডালে চাক বাঁধা শুরু হয়েছে। এ সময়টা নারী পুরুষ সকলেই ফসল তোলার কাজে এত ব্যস্ত যে এদিকে কেউ লক্ষ্য দিতে পারে নি—এমন কি লিডিকেও যেতে হয়েছে মাঠের কাজে। বাথশেবা একটা ছোট মত চাক দেখে ভাবল—সে নিজেই মৌচাকের বাক্স এনে, চাকটা ভেঙে বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে।

সে একটা মই জোগাড় করে নিয়ে এল। হাতে দস্তানা পরে, মাথায় টোকার মত টুপি পরল—টুপির চারদিকে দিয়ে ঝুলিয়ে দিল ওড়নার মত পর্দা—এসবই মৌমাছির কামড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে। তারপর মইটা বেয়ে কিছুদূর উঠতেই—একটু তফাতে সে সেই চিত্তচাঞ্চল্যকর গলার আওয়াজ শুনতে পেল।

—মিস এভার্ডিন! আমি আসছি—একা একা পারবে না তুমি।

ট্রয় তখন সবেমাত্র বাগানের দরজা খুলে ঢুকছে।

বাথশেবা তাড়াতাড়ি তার স্কার্ট নীচের দিকে টেনে দিল, জামাকাপড় সাবধান করে নিল। তারপর নেমে এল আস্তে আস্তে। ততক্ষণে ট্রয় সেখানে পৌঁছে গেছে।

—ভাগ্যিস, এসে পড়েছিলাম—সার্জেণ্ট বলল। সে মইতে পা দিয়ে বলল—দাও, আমার কাছে দাও—আমি বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি।

—কিন্তু তোমাকে তো কামড়ে দেবে—আগে এই দস্তানা আর পর্দাটা চাপিয়ে নাও।

—ও, আচ্ছা একটু দেখিয়ে দেবে—কিভাবে পরতে হয়?

—তোমার ঐ ছোট টুপিতে তো হবে না—এই বড় টুপিটা পরতে হবে—নাহলে যে পর্দাটা মুখের উপর এসে পড়বে।

—ও বড় টুপি পরতে হবে।

কোন এক অদৃশ্য ভাগ্যের ইঙ্গিতে বাথশেবার মাথা থেকে টুপি, পর্দা ইত্যাদি খুলতে এগিয়ে এল ট্রয়, এই বিচিত্র পোষাক পরে ট্রয়কে এত অদ্ভুত লাগছিল যে বাথশেবা হেসে ফেলল—সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আগের দিনের যাবতীয় জড়তা কেটে গেছে।

তারপর মই বেয়ে উঠে ট্রয় একহাত দিয়ে বাক্সটা ধরে অপর হাতে চাক ভেঙে পুরতে লাগল তার মধ্যে—বেশ সময় লাগল সবটা শেষ হতে। এক ঝাঁক মৌমাছি বাক্সটার আশেপাশে বোঁ বোঁ করে উড়তে লাগল—ধীরে ধীরে ভেতরে গিয়ে বসল তারা।

ট্রয় নেমে এসে বলল—বাব্বাঃ—এ যে তরোয়ালের লড়াইয়ের থেকেও ভয়ানক—হাতটা একেবারে যেন অবশ হয়ে গেছে, তুমি একটু এই বাঁধনগুলো খুলে আমাকে মুক্ত করে দেবে? এর ভেতরে যেন হাঁপ ধরে গেছে।

বাথশেবা বাঁধনগুলো খুলতে খুলতে তার লজ্জা ঢাকবার জন্যে বলল—তুমি যে খেলাটার কথা বলছিলে না, আমি কখনও দেখি নি।

—কোন খেলা?

ঐ যে তরোয়ালের যুদ্ধ।

—ও! তুমি দেখতে চাও?

বাথশেবা ইতস্ততঃ করছিল। সে বহুদিন ক্যাষ্টারব্রিজের ব্যারাকে সৈন্যদের তরোয়ালখেলার গল্প শুনেছে—রোদ্দুরে যেন ঝকমক করে ওঠে তরোয়ালের চকচকে ফলা। বাথশেবা আব্দারের সুরে বলল—

—হ্যাঁ, খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

—ঠিক আছে, দেখাব।

—কি করে?

—দেখা যাক?

—ঐ ছড়ি দিয়ে নয়—সত্যিকারের তরোয়াল খেলা দেখাতে হবে—

—হ্যাঁ তাই। আমার এখানে তরোয়াল নেই দেখি, বিকেলের দিকে যদি একটা জোগাড় করতে পারি। কিন্তু তুমি কি রাজী হবে?

ট্রয় তার দিকে ঝুঁকে নীচু হয়ে কি একটা কথা বলল খুব মৃদুস্বরে।

—না সে হয় না—বাথশেবা হেসে ফেলল—সে আমি পারব না।

—খুব পারবে, কেউ তো জানবে না।

বাথশেবা দুর্বলভাবে মাথা নাড়তে লাগল—যেতে গেলে লিডিকেও নিয়ে যেতে হয়, তাই না?

ট্রয় দূরে তাকিয়ে থাকল—কি জানি বুঝি না, ওকে আবার আনা কি দরকার—নিরুত্তাপ ভাবে বলল সে।

বাথশেবার চোখে মুখে সম্মতির চিহ্ন ফুটে উঠল। তার কারণ শুধু ট্রয়ের

নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরই নয়—গভীরতর অন্য কিছু—প্রকৃতপক্ষে বাথশেবা প্রস্তাবটা শুনেই বুঝেছিল যে লিডি বা অন্যকারও উপস্থিতি সেখানে বাঞ্ছনীয় নয়।

—ঠিক আছে। আমি একাই আসব। লিডিকে আনব না—কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্যে—বাথশেবা বলল

—পাঁচ মিনিটও লাগবে না—ট্রয় উত্তর দিল।

॥ ২৪ ॥

বাথশেবার খামারের পেছন দিকে টিলা। তার পেছন দিকে মাইল খানেক পর থেকেই পতিত জমির শুরু। সেখানে কোনদিন কেউ চাষবাস করে নি। শুধু ইতস্ততঃ ফার্ণ গাছের ঝোপ, ছু একটা বুনো ফুল ফুটে আছে—একনজরে এক বিরাট সবুজ গালিচা।

এই গরমকালের সন্ধ্যেবেলা তিরতির বাতাসে এই পরিবেশে বেড়ান স্বর্গ সুখের মত। তখনও অন্ধকার হয়নি। বাথশেবা চলতে চলতে একেকবার থামছিল। লালরংয়ের ছটা দেখে বাথশেবা ভাবল ট্রয় আসছে। মনের দ্বন্দ্বে বাথশেবা ছু'একবার ভেবেছিল ফিরে যাবে—কিন্তু ট্রয়কে কথা দেওয়া আছে—সে এসে হতাশ হ'বে—এই ভেবে বাথশেবা ফিরে যেতে পারে নি। আরও কিছুটা এগিয়ে বাথশেবা ফার্ণঝোপের মধ্যে একটা বড় গর্তের কিনারে এসে দাঁড়াল—গর্তের তলায় দাঁড়িয়ে, ট্রয় উপরের দিকে তাকিয়েছিল।

ট্রয় হাত বাড়িয়ে দিল বাথশেবার দিকে, ঢালু জায়গা বেয়ে নেমে আসার জন্য। গর্তটা প্রায় গোল একটা আধখানা ফুটবলের মত—ফুট তিরিশেক চওড়া এবং অগভীর। গর্তের ভেতরে দাঁড়ালে উপরের আর কিছু দেখা যায় না—শুধু মনে হয় দিগন্তরেখা সর্বত্র ফার্ণ ঝোপে ছাওয়া।

ট্রয় তরোয়ালটা বার করল। আকারে বেশ বড়। মনে হয় যেন পড়ন্ত রোদ্দুরে অস্ত্রটা হেসে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। ট্রয় বলল, এইবার দেখ—কিভাবে তরোয়াল চালাতে হয়—আমাদের ঘোড়সওয়ার সোলজারদের থেকে অবশ্যি সাধারণ পদাতিক বাহিনীর অনেক তফাৎ।—আমাদের প্রথমে ডানদিকে চারবার—তারপর বাঁদিকে চারবার—তারপরে এই ঘাস কাটার মত নীচু করে। বাথশেবা যেন মুহূর্তের মধ্যে একটা উল্টো করা রামধনু দেখল—কিন্তু ট্রয়ের হাত তখন থেমে গেছে। তারপর নানান ভঙ্গিতে উপরে, নীচে, পিছনে সামনে

ট্রয় তার অস্ত্রের কসরৎ দেখাল। বাথশেবা বিস্মিত হয়ে বলে ফেলল—কি ভয়ঙ্কর বাব্বাঃ—রক্ত হিম হয়ে যায়।

—হ্যাঁ, মৃত্যু যে কোন সময় হতে পারে—ট্রয় উত্তর দিল—নাও, এইবার তোমাকে আমার খেলা দেখাই। মনে করা যাক তুমি আমার শত্রু অর্থাৎ বিরোধী পক্ষ—প্রত্যেকবার একচুলের জন্য কেমন বেঁচে যাবে দেখ—নড়বে না কিন্তু একটুও—

—আচ্ছা ঠিক আছে।

বাথশেবা আরও একটু পিছিয়ে সরে গেল। ট্রয় এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তরোয়াল চালাতে লাগল—যে ভয়ে বাথশেবার চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল—কখনও এত হঠাৎ অস্ত্রটা পিছন থেকে সামনে চলে আসছিল মনে হচ্ছিল শরীরটা বুঝি কখন অজান্তে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ গতিতে চলছিল তরোয়ালটা।

বাথশেবা একবার ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—ইস, আমাকে কেটে ফেললে নাকি? তাড়াতাড়ি কোমরে হাত দিয়ে দেখল না কাটে নি।

ট্রয় বলল—আমি তোমাকে স্পর্শ করি নি। এসবই হাতের কাজ। দেখো, ভয় পাচ্ছ না তো—তাহলে কিন্তু আমি খেলা দেখাতে পারব না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—তোমার গায়ে তো লাগবেই না—এমনকি তোমাকে 'টাচ' পর্যন্ত করব না।

—ঠিক তো। আমার গায়ে লাগবে না তো?

—একদম নিশ্চিত—

—আচ্ছা, তরোয়ালটায় ধার আছে?

—না, না, তুমি চুপচাপ ষ্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাক।

তারপর বাথশেবা তার চারপাশে শুধুমাত্র তরোয়ালের হিস হিস শব্দ শুনতে পাচ্ছিল—আর সূর্যের কিরণ ঠিকরে পড়ছিল তার ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে সবত্র। বেশ কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে থাকল বাথশেবা। সবকিছু দেখতে বা শুনতে পেলেও যেন তার চেতনা হারিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ট্রয় অস্ত্র থামিয়ে বলে উঠল—তোমার কপালের ডানদিকের ঐ একগোছা চুল বড় বিরক্ত করছে—আচ্ছা দাঁড়াও আমিই নামিয়ে দিচ্ছি।

বাথশেবা দেখল—তার ডানদিকে খালি একটা রূপোলী ঝলক—অমনি চুলের গোছাটা পড়ে গেল মাটিতে।

—বাঃ খুব সাহস তো তোমার—ট্রয় বলল—একটুও নড়াচড়া কর নি।

—কিন্তু তুমি আমার চুল কাটলে কেন ?

—আর একবার দাঁড়াও একটু—

—না, না, আমার ভীষণ ভয় করছে—বাথশেবা চেঁচিয়ে উঠল।

—কোন ভয় নেই—আমি তোমাকে টাচও করব না—এমন কি তোমার চুলেও না—শুধু ঐ শুঁয়োপোকাটাকে মারতে দাও।

ফার্ণ গাছের ঝোপ থেকে একটা শুঁয়োপোকা বাথশেবার গায়ে এসে পড়েছিল—ঠিক বুকের কাছটাতে ব্লাউজের উপরে। বাথশেবা খালি তরোয়ালের ছুঁচলো আগা তার দিকে এগুতে দেখল—মনে হ'ল বুকে ঢুকে যাচ্ছে—বাথশেবা মরে গেছি ভেবে চোখ বন্ধ করল। একটু পরে অবশ্যি চোখ খুলল আবার।

এই যে দেখ—সার্জেণ্ট তরোয়ালটা বাগিয়ে ধরল তার চোখের সামনে।

পোকাটা গেঁথে আছে তরোয়ালের আগায়।—কি আশ্চর্য্য ? তুমি কি যাদু জান ?—বাথশেবা হতচকিত হয়ে গেল।

—না, এ'ব নাম দক্ষতা। আমি তোমার বুকেও অস্ত্রটা ঠেকাই নি—এক ইঞ্চির হাজার ভাগের একভাগ ফাঁক ছিল দুয়ের মধ্যে।

—কিন্তু তুমি ঐ ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে আমাব একগোছা চুল কি করে কাটলে ?

—ভোতা ? দেখবে ?—ক্ষুরের থেকেও বেশী ধার—

ট্রয় তরোয়ালটা হাতের তালুতে ঘসে দেখাল। চামড়ার ওপর থেকে পাতলা একটা নোংরা পর্দা উঠে এলো।

—কিন্তু তুমি যে বললে ওতে ধার নেই।

—না হলে তুমি ভয় পেয়ে যেতে—একটু নড়লেই মৃত্যু—তার থেকে একটা মিথ্যে কথা বলে যদি তোমার জীবনরক্ষা হয়, অন্যায় কি তাতে ?

বাথশেবা ভয়ে কেঁপে উঠল—ইস্ মৃত্যু থেকে মাত্র এক ইঞ্চি তফাৎ। আর তা একটুও বুঝতে পারলাম না।

—আরও হিসেব করে বলতে গেলে ঠিক আধ ইঞ্চি তফাতে মৃত্যু তোমার কাছে এসেছিল অন্ততঃ দুশো পঁচানব্বইবার।

—কী সাংঘাতিক মানুষ বাব্বা !

—তোমার কোনও ক্ষতি তো হয় নি। আমার অস্ত্র কখনোও ভুল করে না—ট্রয় তরোয়ালটা খাপে ভরে ফেলল।

বাথশেবা অনুভূতির তীব্রতায় বসে পড়ল ঝপ করে। ট্রয় খুব নরম স্বরে বলল—এবার আমাকে যেতে হয়। এই স্মৃতিটুকু আমি চিরকাল মনে রাখব।

—বলে ট্রয় নীচু হয়ে মাটি থেকে চুলের গোছাটি তুলে হাতের আঙুলে জড়াতে লাগল—তারপরে কোটের বোতাম খুলে সযত্নে রেখে দিল পকেটে। বাথশেবা শুধু নিঃশব্দে দেখল—কিছুই বলতে পারল না।

ট্রয় একটু এগিয়ে এসে বলল।—বিদায় তাহলে। সে আরও এগিয়ে এল। তারপর মিনিট খানেকের ব্যবধান। বাথশেবা দেখল ফার্ণগাছের ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে যাচ্ছে লালরংয়ের পোষাকপরা একটি মানুষ।

ঐ একমিনিট সময়ে বাথশেবার সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমা হয়েছিল—পায়ের তলা থেকে মাটি সয়ে যাচ্ছিল—আবেগের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল যাবতীয় চিন্তা। আর তার ফলে নেমে এল বন্যার ঢলের মত অশ্রু—বাথশেবার মনে হ'ল সে কি এক মহাপাপ করেছে।

ট্রয়ের মুখের দাগ এখনও তার ঠোঁটের উপরে দেখা যাচ্ছিল বোধহয়—ট্রয় তাকে চুম্বন করে চলে গেল।

॥ ২৫ ॥

কোন আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন দৃঢ়স্বভাবের মেয়ে যখন অপরের উপর নির্ভর করতে শুরু করে তখন তার সমস্ত সত্তা হারিয়ে যায়—যে কোনও সাধারণ মেয়ের থেকেও অতি দুর্বল হয়ে পড়ে। ট্রয়ের প্রতি বাথশেবার প্রেম এমনই একটা পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। শিশুর মত ভালবাসা তাব—যেমন উষ্ণ, তেমনই তরতাজা। বাথশেবা তার আবেগকে রুখতে জানত না আর ভবিষ্যৎ ফলাফল নিয়েও চিন্তা করত খুব কম। অন্যদের সাবধান কবলেও সে নিজে সাবধান হতে জানত না।

বাথশেবার মতই, যে কোনও নারীর দৃষ্টিতে ট্রয়ের কতকগুলো চোখ ধাঁধানো কেরামতি ছিল যেজন্যে তার দোষত্রুটি সব তলিয়ে যেত, আর ওক ছিল ঠিক তার উল্টোটি—তার অক্ষমতাগুলোই ফুটে উঠত মোটা দাগে—কিন্তু তার গুণগুলো ছিল খনির ভেতরের মূল্যবান ধাতুর মত। ভালবাসা আর শ্রদ্ধা এই দুটি পরস্পরের থেকে এত পৃথক যে বাথশেবা হয়তো অনেক সময়েই মিঃ বোল্ডউড সম্পর্কে তার আগ্রহের কথা লিডির সঙ্গে আলোচনা করত, কিন্তু ট্রয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সে নিজের অন্তরেই রেখেছিল।

এসব কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের চোখ এড়ায় নি। রোজই সন্ধ্যাবেলা খামার থেকে

ফেরার পথে সে এইসব ভাবতে ভাবতে আসত। আর বেশ কিছুটা রাত পর্যন্ত বসে ভাবত এইসব কথা। সে যে ভালবাসা পায়নি এজন্যে তার মনে দুঃখ তো ছিলই। কিন্তু তার থেকেও বেশী দুঃখ হত তার বাথশেবার ভবিষ্যতের কথা ভেবে। এরকম স্বার্থবোধশূন্য প্রেম মহান কিন্তু প্রেমিকের তাতে আখেরে কিছু লাভ হয় না। ওক ভাবল সে বাথশেবার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করবে। ফার্মার বোল্ডউডের অনুপস্থিতির জন্যে, তাঁর প্রতি এই অবজ্ঞা গ্যাব্রিয়েলের ভাল লাগছিল না।

একদিনকার সান্ধ্যভ্রমণে বাথশেবা বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। গ্যাব্রিয়েল অদূরেই মাঠ থেকে সেটা লক্ষ্য করল। অন্ধকার হয়ে এসেছে। গ্যাব্রিয়েল খুব ভারাক্রান্ত মনে বাথশেবার পথের দিকে এগিয়ে গেল। গমের গাছগুলো এখন বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে। মাঝখানের রাস্তা তাই খুব সরু হয়ে গেছে। দু জন লোক পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া যায় না। ওক একপাশে সরে দাঁড়িয়ে রাস্তা করে দিল।

—ও গ্যাব্রিয়েল নাকি! তুমিও বেড়াতে বেরিয়েছ—বলল বাথশেবা। তার পর খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

—আমি ভাবলাম, দেরী হয়ে গেছে—এদিকে এলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে—গ্যাব্রিয়েল উত্তর দিল।

—সেজন্যে ধন্যবাদ—তবে আমি মোটেই ভীতু নই।

—না, তাহলেও অনেক বাজে লোক ঘোরাফেরা করতে দেখি তো!

—কই আমি তো কাউকে দেখি না।

ওক খুব বুদ্ধি খাটিয়ে 'চালু' সার্জেন্ট টাকে ঐ বাজে লোকদের দলে ঢুকিয়ে দিতে চাইছিল কিন্তু তার সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে গেল—মনে হল এটা খুব খেলো এবং নগ্ন পরিকল্পনা। তাই সে অন্য ভাবে ভূমিকা শুরু করল।

—আর যে ভদ্রলোকের তোমার কাছে আসার কথা—মানে ফার্মার বোল্ডউড—তিনি যেহেতু এখানে নেই, আমি ভাবলাম এগিয়ে দেখি—

—ও। বাথশেবা মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিল। আরও বেশ কয়েক পা এগিয়ে গেল তারা কোন কথা না বলে। কেবলমাত্র গমের গাছগুলোর সঙ্গে বাথশেবার স্কার্টের ঘষা লেগে খসখস আওয়াজ হচ্ছিল। বাথশেবা বেশ একটু তিক্তস্বরে বলল—মিঃ বোল্ডউডের আসার কথা—মানে? তুমি কি বলতে চাও?

—সকলের মুখেই তো তোমাদের বিয়ের কথা শুনে থাকি—তাই বলছিলাম।

—লোকে যা বলবে সেটাই সত্যি হবে এমন তো কথা নেই—সে পলকেব মধ্যে উত্তর দিল—এরকম বিয়ের কথা অন্ততঃ আমার জানা নেই।

গ্যাব্রিয়েল দেখল এটাই তার মতামত ব্যক্ত করার উপযুক্ত মুহূর্ত। সে বলল—কিন্তু মিস এভার্ডিন! লোকে যাই বলুক আর না বলুক—মিঃ বোল্ডউড যেভাবে তোমাকে আত্মনিবেদন করেছে—তার থেকে বেশী আর কিছু হতে পারে না—

বাথশেবা হয়তো এখানেই কথাবার্তা বন্ধ করে দিতে পারত কিন্তু তাব মর্যাদা বোধ আলোচনাটা আর একটু দীর্ঘায়িত করল। সে খুব জোরেব সঙ্গে বলল—কথাটা যখন উঠেছেই, আমি এই ভ্রান্ত ধারণাটা কাটিয়ে দিতে চাই—আমি মিঃ বোল্ডউডকে কখনও কোনও প্রতিশ্রুতি দিই নি—তাঁকে পছন্দই হয় না আমার। তাঁকে আমি সম্মান করি এবং তিনি আমাকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু আমি কোনও উত্তর এখনও দিই নি—তিনি ফিবে এলেই উত্তরটি দিয়ে দেব। আমার পক্ষে তাঁকে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

—তাহলে হয়তো লোকে ভুল ধাবণা করেছে।

—হ্যাঁ তাই।

—কিন্তু তাদের কথাটা সত্যি হলেই বোধ হয় ভাল হত।

—সেটা আমিই ভাল বুঝব, নয় কি?

দুর্ভাগ্যবশতঃ ওক মিঃ বোল্ডউডের প্রতিদ্বন্দ্বীর কথাও না তুলে পারল-না। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—আমার মনে হয় সার্জেণ্ট ট্রয় ছেলেটির সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ না হলেই ভাল হয়।

বাথশেবার পদক্ষেপ মন্থর কিন্তু দৃঢ় হয়ে গেল। সে বলল—কেন?

—তোমার পক্ষে ছেলেটি খুব ভাল নয়।

—এ কথা কি তোমাকে কেউ বলতে বলেছে আমার কাছে?

—না কেউ বলেনি।

—তাহলে? সার্জেণ্ট ট্রয়ের প্রসঙ্গ এখানে না তোলাই উচিত। তবে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সার্জেণ্ট ট্রয়, শিক্ষিত, উচ্চবংশীয় এবং যে কোনও মেয়ের পক্ষেই উপযুক্ত পাত্র।

—কিন্তু আমার মনে হয় লোকটির বিবেক বোধ বলে কিছু নেই। আমি তোমাকে একান্ত অনুরোধ করছি—ওর সঙ্গে কোনও সংস্রব রেখ না। আমার এই একটি কথা অন্ততঃ রাখো। ভগবান করুন—আমি তাকে যতটা খারাপ

ভাবি সে যেন তা না হয়—কিন্তু লোকটা যখন আমাদের চেনা-পরিচিত নয়—নিজেদের মঙ্গলের জন্যে তাকে খারাপ বলে ধরে নিলে ক্ষতি কি ?—ম্যাডাম ! ওকে বিশ্বাস কোর না—এই আমার একান্ত অনুরোধ।

—কেন, অবিশ্বাস করব কেন ?

—আমি সৈনিকদের ভালবাসি—তবে একে নয়। অতিরিক্ত চতুর বলেই এর চরিত্রে সততাব বালাই নেই। ওকে তোমার সব সময়েই এড়িয়ে চলা উচিত। ওকে এই পথে আসতে দেখলে—ওই পথ দিয়ে চলে যেও—ও হাসির কথা বললে, না বোঝার ভান করে হেসো না। আমি তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে বলছি না—কিন্তু ওকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর—

বন্ধ জানালার বাইরে বন্যা, বাত্যা ও তুষারঝঞ্ঝা তাড়িত ছোট্ট পাখির মত থরথর করে কাঁপতে লাগল বাথশেবা। সে দুর্বার হয়ে চীৎকার করে উঠল—আমি আবার—আবার বলছি—তুমি ঐ বিষয়ে কোন কথা বলবে না। আমি ভালভাবে জানি যে—সে যথেষ্ট বিবেচক এবং ভদ্র—এবং মুখের উপরে সত্যি কথা বলতে পারে।

—ও !

—এই গ্রামেব যে কোন লোকের মতই সে ভাল—এবং আমি তাকে ভালই জানি। বাথশেবা এতদূর এগিয়ে গেছে দেখে ওক মনে মনে খুব কষ্ট পেল, বলল—তুমি তো জান, আমি তোমাকে ভালবাসি এবং বাসবও চিরকাল। তোমার কিছু অমঙ্গল হোক এ আমি চাই না। আজকে হয়তো আমি গরীব হয়ে গেছি—আর তুমি অনেক পয়সার মালিক হয়ে আমাকে পিছনে ফেলে গেছ। কিন্তু বাথশেবা, তোমার কর্মচারীদের মধ্যে যাতে তোমার মানসম্মান বজায় থাকে, সেই বিচার করেই আমি বলছি যে তুমি এমন কাউকে বিয়ে কর, যে তোমাকে আমার মতই ভালবাসবে—এই সোলজারের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের বিষয়টা আর একবার চিন্তা করে দেখ।—না, না, না—বাথশেবার গলা বুঁজে এল।

—তোমাকে আমি আমার প্রাণের থেকেও বেশী ভালবাসি। বয়সে তোমার চেয়ে আমি ছয়বছরের বড় আর মিঃ বোল্ডউডের বয়স আরও দশ বছর বেশী। তাঁর কাছে তুমি অনেক সুখে থাকবে—এটাই আমি ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

ওক নিজেই যে তাকে প্রাণের মত ভালবাসে একথা বলায় বাথশেবার রাগ

কিছুটা প্রশমিত হল বটে—কিন্তু বাথশেবার মঙ্গলচিন্তা তার কাছে বিয়ে করার ইচ্ছা থেকেও প্রবল, এমন ধারণা বাথশেবার কাছে ক্ষমার অযোগ্য মনে হল—সেটা আরও বৰ্দ্ধিত হ'ল ট্রয়ের প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্য।

—তুমি অন্য কোথাও চলে যাও—বাথশেবা আদেশ দিল—এই ফার্মে তোমার কোনও দরকার নেই—আমি চাই তুমি চলে যাও।

—বৃথাই আমাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার ভান করে তো লাভ নেই—ওক শান্তভাবে বলল।

—ভান করছি? তোমাকে যেতেই হবে—তোমার এসব বক্তৃতা আমার আর সহ্য হচ্ছে না—মনে রেখ আমিই এখানকার মালিক।

—সত্যিই তুমি চলে যেতে বলছ? তুমি তো জান—একদিন আমারও তোমাব মত এইসব কিছুই ছিল। আর তাছাড়া এই অবস্থায়, বেলিফ নেই, ম্যানেজার নেই—তোমাকে ফেলেই বা যাব কি করে? তুমি যদি সেইরকম লোক রাখ তাহলে আমি চলে যাই।

—আমার কোনও বেলিফ দবকার নেই। নিজেই যথেষ্ট ম্যানেজারী করতে পাবব আমি।

—খুবই ভাল কথা। কিন্তু একা তোমার পক্ষে মেয়েছেলে হয়ে তা কি সম্ভব? আমি মনে করি না যে, তোমার কোনও উপকার করছি—তবে তোমার জিনিষের ক্ষতি হলে আমারও বুকে বাজে—তোমার ভাল চাই কি মন্দ চাই সেসব তো তোমার অজানা থাকার কথা নয়।—

অবচেতন মনে, গোপনে, গ্যাব্রিয়েলের বিশ্বস্ততাকে শ্রদ্ধা করত বাথশেবা। তাব কথার থেকেও, কথাবলার ভঙ্গিমাতেই বিশ্বস্ততা প্রকাশ পাচ্ছিল। প্রত্যুত্তরে বাথশেবা হয়তো বিড়বিড় করে এমন কিছু বলল, যার অর্থ, গ্যাব্রিয়েল ইচ্ছা করলে এখানে থাকতে পারে। তারপর পরিষ্কার করে বলল—তুমি কি আমাকে একটু একা থাকতে দেবে? এইটুকু উপকার করবে আমার?

—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই—উত্তর দিল গ্যাব্রিয়েল। সে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিল। লোকালয় থেকে এতদূরে এসে এই নির্জন টিলার উপরে—বাথশেবা কেন তাকে ছেড়ে যেতে বলছে—বিশেষতঃ এখন বেশ রাত্রি হয়ে এসেছে। বাথশেবাকে এগিয়ে যেতে দিয়ে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। সে বুঝতে পারছিল না এই অবস্থায় চলে যাওয়া উচিত কিনা! একটু পরেই তার বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল—যখন দূর থেকে দেখা গেল বাথশেবার পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছে আর

একটি লোক—সে ট্রয়। তাদের কথাবার্তাও যাতে কানে না আসে তাই ওক প্রেমিকযুগলকে পশ্চাতে রেখে ফিরে গেল।

॥ ২৬ ॥

আধঘণ্টাটাক পরে বাথশেবা বাড়ী ফিরে এল। ট্রয়ের বিদায়বেলার কথাগুলো তখনও তার কানে বাজছিল। সে তাকে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে গিয়েছিল—দুদিনের জন্যে ট্রয় 'বাথ' শহরে যাবে কালকে, আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা করতে। যাবার সময় ট্রয় তাকে দ্বিতীয়বার চুমু খেয়েছিল। আজকের দেখা হওয়াটা কেমন যেন হঠাৎ ঘটে গেল।—আগে থেকে কোনও ঠিক-ঠাক ছিল না। ট্রয় অবশ্যি বলেছিল সে আসবে—কিন্তু বাথশেবা নিষেধ করে দিয়েছিল। তথাপি যদি এসে পড়ে—তাই আগে থেকে সাবধান হয়ে গ্যাব্রিয়েলকে চলে যেতে বলেছিল বাথশেবা।

নতুন নতুন ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বাথশেবা বড় বিব্রত বোধ করছিল—ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে, চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল—মনে মনে কিছু একটা ঠিক করে সে তাড়াতাড়ি কাগজ কলম টেনে বার করল। তিন মিনিটের মধ্যে, কোথাও না থেমে, সে মিঃ বোল্ডউডকে এক চিঠি লিখে ফেলল—বেশ বিনীত কিন্তু দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিল, যে তার পক্ষে ওঁকে বিয়ে করা সম্ভবনা। ওকের সঙ্গে সে বলেছিল যে বোল্ডউড ফিরে এলে, জানিয়ে দেবে—কিন্তু সেজন্যে আর দেরী করতে পারছিল না। আগামীকালকের আগে চিঠি ডাকে দেওয়া সম্ভব নয়—কিন্তু এতই অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিল সে, যে ভাবল কোনও কর্মচারীর হেফাজতে চিঠিটা পৌছে দিতে পারলে এই দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পায়। তাই রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল—যদি কাউকে পাওয়া যায়।

রান্নাঘরের মধ্যে কিছু একটা কথাবার্তা চলছিল, বাথশেবা বাইরে দাঁড়িয়ে একটু শুনল—ওঁদের বিয়ে হলে তো ইনি নিশ্চয়ই এইসব চাষবাস বন্ধ করে দেবেন—

—বেশ মানাবে দুটিকে—বেশ সুখী দম্পতি হবে ওরা—একটু আধটু ঝগড়াঝাঁটি অবশ্যি হতে পারে।

—আহা, আমার যদি এর অর্দ্ধেক গুণবাণ একটা স্বামীও হত!

এমন সময়ে বাথশেবা ভেতরে ঢুকে বলল—কার কথা বলছ তোমরা?

সকলেই একটু লজ্জা পেয়ে গেল। অবশেষে লিডি মুখ খুলল—এই তো তোমার কথাই বলাবলি করছিলাম আমরা।

—ও! শোন মেরিয়্যান, লিডি আর টেম্পারেন্স—তোমরা এই সম্পর্কে আর কোনও আলোচনা করবে না। জানই তো, মিঃ ট্রয়কে আমি আদপেই দেখতে পারি না। বলতে গেলে প্রায় ঘৃণাই করি তাকে।

—হ্যাঁ, আমরা তা জানি—বলল লিডি—আমরাও পছন্দ করি না ওকে।

—আমিও ঘেন্না করি—বলল ম্যারিয়ান।

—ম্যারিয়ান, মিথ্যুক কোথাকার। তুই না আজ সকালে অন্যরকম বলছিলি, বাথশেবা ফেটে পডল রাগে।

—হ্যাঁ বলছিলাম তো, কিন্তু আপনিও তো বলছিলেন মিস্। ম্যারিয়ান উত্তর দিল—ওটা এখন একটা হাড বদমাইস—তাইতেই তো আপনি ঘেন্না করছেন।

—কে বলেছে বদমাইস? আমার মুখের সামনে অতবড় কথা? সে ভালই হোক আর খারাপই হোক—তোমাদের তাতে কি দরকার—ফের যদি কাউকে এরকম কথা বলতে শুনি—তবে কিন্তু তাডিয়ে দেব এখান থেকে।

বাথশেবার দু'চোখে জল টলটল করছিল—সে নিজের ঘরে ফিরে এল—লিডিও এল পেছন পেছন। লিডি বলল—মিস্ আমাদের ভুল হয়ে গেছে—আমরা ভেবেছিলাম তুমি পছন্দ কর তাকে—কিন্তু এখন দেখছি একেবারেই সহ্য করতে পার না।

—দরজাটা বন্ধ করে দাও লিডি।

লিডি দরজা বন্ধ করে দিল। বলল—লোকে ওরকম কত কথা বলে মিস্—আমি এবার থেকে বলে দেব ওদের, মিস্ এভার্ডিনের মত মেয়ে কখনও ওকে ভালবাসতে পারে? পরিষ্কার বলে দেব—

বাথশেবা এবারে ফেটে পড়ল—ওঃ লিডি—তুই কি এতই বোকা? নিজে মেয়ে হয়েও তুই বুঝিস না কিছু?

লিডির বড় বড় চোখ দুটো বিস্ময়ে ভরে গেল।—এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয়—বাথশেবা লিডির গলা জড়িয়ে ধরে বলল—আমি যে কাউকে না বলে আর পারছি না, হায় ভগবান—আমি যে কত কষ্ট করে এই সত্যি কথাটা গোপন রেখেছি—তুইও কি একটু বুঝিস নি? জানিস না—কোনও মেয়ে যখন

কাউকে ভালবাসে, লোকনিন্দা বা অন্তের কথায় সে থোড়াই কেয়ার করে? যা চলে যা, এখন আমায় একা থাকতে দে।

লিডি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। লিডি শোন! দিব্যি করে বলতো আমার কাছে, লোকটি সত্যি সত্যি ভাল—ওরা যা বলছে সব মিছে কথা।

—কিন্তু মিস! আমি কি করে বলি সে কথা।

—অবাধ্য কোথাকার! তুইও ওদের মত বলতে শুরু করলি? ঠিক আছে দেখব আমি কার কত বুকের পাটা আছে এ গ্রামে?—বাথশেবা পায়চারী করতে লাগল।

বাথশেবার অগ্নিমূর্ত্তি দেখে লিডি বলল—না মিস্—আমি ওদের কথা একটুও বিশ্বাস করি না।

—তুই আমার মন জোগানোর জন্যে একথা বলছিস। কিন্তু আমি বলছি লিডি ও উচ্ছৃঙ্খল হতেই পারে না।

—হ্যাঁ মিস্।

—কিন্তু তুইতো সে কথা বিশ্বাস করিস না?

—আমি কি আর বলব—না বললে তুমি বিশ্বাস করবে না—আবার হ্যাঁ বললে তুমি রাগ করবে।

—বল যে তুই বিশ্বাস করিস না।

—বলছি তো লোকে যত বলে, সে তত খারাপ নয়।

—একদমই খারাপ নয়—বাথশেবা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগল—হায় ভগবান- মেয়েদের পক্ষে ভালবাসা যে এত দুঃখের। কেন আমার সঙ্গে দেখা হ'ল ওর! কেনই বা আমাকে এত সুন্দর দেখায়—একটু সামলে নিয়ে সে লিডিকে বলল—শোনো লিডিয়া স্মলবেরী! তোমাকে আজ আমি যা বলেছি বা তুমি যা যা দেখেছো, তার একটা কথাও যদি প্রকাশ করো তবে তোমাকে আমি আর কোনদিন বিশ্বাস করব না—আর এক মুহূর্ত্তও তুমি থাকতে পাবে না এখানে।

—আমি কিছুই প্রকাশ করব না—লিডি বলল—তথাপি তোমার সঙ্গে আর থাকতে চাই না আমি। এই ফসলটা উঠে গেলে, কি সামনের হপ্তায় নতুবা আজই আমি চলে যেতে চাই—শুধু শুধু তোমার এত ঝাঁঝ আমি সহ্য করতে পারব না।

—না, না, লিডি কিছু মনে করিস না—বাথশেবা হঠাৎ যেন গলে জল হয়ে

গেল—আমি তোকে নিজের বোনের মত দেখি—কাকে যে কি বলছি আমার মাথার ঠিক নেই—লিডি তুইও যদি এমন করিস, হায় ভগবান! জানি না এ আমি কোনদিকে চলেছি। কি আছে কপালে।—ছুনিয়ায় আমার একজনও বন্ধু নেই এখন।

—আমি কিছু মনে করি নি—আর তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না—লিডিও কেঁদে ফেলল—সহানুভূতিতে জড়িয়ে ধরে বাথশেবার গালে চুমু খেল একবার।

বাথশেবাও লিডির গালে আলতো করে একটা চুমু খেল। সব সহজ হয়ে গেল আবার।

—আমাকে কখনও কাঁদতে দেখেছিস? কিন্তু তুই আজ আমায় কাঁদিয়ে ছাড়লি—

অশ্রুভেজা হাসি মাখিয়ে বলল বাথশেবা—ওকে একটু ভাল ভাবতে চেষ্টা কর—পারবি না?

—হ্যাঁ, খুব পারব।

—জানিস, ওর স্বভাবটা একটু চঞ্চল হলেও মনের দিক দিয়ে খুব সরল—অন্য যাদেব মনটা কুটিল, বাইরে সাদাসিধে তাদেব থেকে অনেক ভাল—আমার সেই জন্যই ভাল লাগে, লিডি! তুই কথা দে, কাউকে বলবি না এসব—প্লীজ, খুব লজ্জায় পড়ে যাব তাহলে আমি, আব ও বেচাবাবও কিছু ভাল হবে না।

—আমি মরে গেলেও কিছু বলব না—সর্বদাই তোমাব ভাল চাই আমি মিস—বলতে বলতে লিডি আবার কেঁদে ফেলল।

॥ ২৭ ॥

এই ঘটনার পরের দিনই লিডি এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছিল তার বোনের বাড়ীতে বেড়াতে যাবে বলে। তার বোন এবং ভগ্নীপতি কয়েক মাইল তফাতেই ইয়ালবেরী টাউনে বসবাস করত। বাথশেবা কথা দিয়েছিল লিডি থাকতে থাকতে একদিন তার বোনেব বাড়ীতে বেড়াতে যাবে। আজ সন্ধ্যে-বেলা তার খুব যাই যাই মনে হতে লাগল। সে ভয় পাচ্ছিল বোল্ডউড হয়তো চিঠিটা পেয়েই নিজে চলে আসবে এখানে তার সঙ্গে দেখা করতে। এই

পরিস্থিতিকে এড়ানোর জন্যেও সে ভাবছিল এখান থেকে কয়েকদিনের জন্যে সরে পড়বে।

গ্যাব্রিয়েল আর ম্যারিয়ানকে খুব সাবধানে থাকতে বলে—সব দরজায় তালাটালা লাগাতে বলে সন্ধ্যার আগেই বাথশেবা বেরিয়ে পড়ল ইয়ালবেরীর উদ্দেশ্যে। বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ একটু বৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তাতে মাটি বিশেষ ভেজে নি—আবহাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছিল মাত্র। পশ্চিমাকাশ থেকে আলো তখনও মিলিয়ে যায় নি। বাথশেবা মনে মনে ভাবছিল—কাজকর্ম ছেড়ে মানুষ এখন বিশ্রাম করবে—চিন্তায় ডুবে যাবে—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে—তারপর নিদ্রার কোলে নিজেকে সঁপে দেবে। এমন সময়ে যে লোকটির ভয়ে সে প্রায় গোপনে পালাচ্ছিল—তাকেই দেখা গেল অদূরে, খুব অলসপদে, বিস্ময়াহত ভাবে, মাটির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে। বাথশেবা খুব কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত সে দেখতে পায় নি—যখন সে মুখ তুলে তাকাল, বাথশেবার চিঠির স্পষ্ট উত্তর পড়ে নেওয়া যাচ্ছিল সেখান থেকে।

—ও! মিঃ বোল্ডউড! আপনি! একটু থেমে থেমে অপরাধ সচেতন-ভাবে বলল বাথশেবা।

নীরবে যে তিরস্কার করা যায়, তা মুখের ভাষার থেকে অনেক বেশী জ্বালাময়ী। চোখের ভাষা, জিভের ভাষা থেকে বেশী তীব্র—বিশালতা এবং বেদনা এই দুটো জিনিসই শব্দের ব্যবহার পরিহার করে চলে—তাই বোল্ডউডের চাহনির কোন উত্তর জানা ছিল না বাথশেবার।

বাথশেবাকে একটু সরে দাঁড়াতে দেখে বোল্ডউড বলল—

—তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ?

—কেন? বলল বাথশেবা।

—তোমাকে দেখে সেইরকমই মনে হচ্ছে—কারণ আমি এখন প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি। তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও না—সহজ কথা—আমিও তোমাকে আর কিছু বলতে চাই না।

বাথশেবা 'গুড ইভনিং' বলে এগিয়ে যাচ্ছিল—বোল্ডউড থপথপ করে তার সামনাসামনি এল—বাথশেবা! ডার্লিং! এটাই কি শেষ কথা?

—হ্যাঁ।

—বাথশেবা! দয়া করে আমার দিকে তাকাও—বোল্ডউড ভেঙে পড়ল —আমি এত নীচু স্তরে নেমে গেছি যে আজ একটি নারীর কাছে কৃপাভিক্ষা

করতে হচ্ছে আমায়—তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, সে নারী তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

—কিন্তু তাতে যে নারীর সম্মান কিছু বৃদ্ধি পায় না—বাথশেবা খুব আস্তে আস্তে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিল।

—আমি তোমার জন্যে আজ পাগল হয়ে গেছি—মানবসমাজে আমি আজ নিতান্ত একাকী—বাথশেবা এখন আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিও না।

—আমি কি করে আপনাকে ছুঁড়ে ফেলব? আপনাকে তো আমি গ্রহণ করিনি কখনও। বাথশেবা অত্যন্ত বাস্তবভঙ্গিতে বলল।

—কিন্তু এমন একটা সময় ছিল—যখন আমি তোমার কথা চিন্তা করার আগেই, তুমি আমার কথা ভেবেছিলে। আজকের এই যাবতীয় দুঃখ সেই ভ্যালেণ্টাইনের চিঠি থেকেই জন্মলাভ করেছে—সেজন্যে অবশ্যি আমি কোনও দোষ দিই নে তোমায়—তবে আমি যখন তোমার সম্পর্কে কিছুই জানতাম না—তুমিই আমাকে কাছে টেনেছিলে। তোমার থেকে প্রশ্রয় পেযেই আমি তোমাকে ভালবেসেছি।

—আপনি যেটাকে প্রশ্রয় বলছেন—সেটা ছিল নিছক বাচ্চাদের খেলার মত—এবং সেজন্যে বহুবার আমি দুঃখ প্রকাশ করেছি—

—হ্যাঁ, সেজন্যে আমি তোমাকে দোষ দেই না—শুধু আমারই কপালের দোষ—তুমি যেটাকে ঠাট্টা মনে করেছিলে, আমি সেটাকে গভীর বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরেছিলাম—আর এখন এই চিঠিটাকে আমি হাল্কাভাবে নিতে চাইলে তুমি রাজী হচ্ছ না—আমাদের দুজনের পথ একসঙ্গে মিলবার নয়—এ আমাদের কপালের দোষ বাথশেবা! তুমিই আমার জীবনে প্রথম নারী যাকে আমি প্রেমের দৃষ্টিতে দেখেছি—তুমিও আমাকে প্রায় কথা দিয়েছিলে—সে সব কথা তুলে আমি আর তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না—কারণ তোমার দুঃখ বাড়িযে তো আমার দুঃখ কিছুই লাঘব হবে না—

—আপনার জন্যে আমার মায়া হয়, সত্যিই মায়া হয়—বাথশেবা আবেগ কম্পিতস্বরে বলল।

—না, না, তুমি আর বোলো না। বাথশেবা! তোমার ভালবাসা, মায়ার থেকে এতবড যে, ভালবাসা হারিয়ে ঐ মায়াটুকুও যদি না পাই তাতে আমার দুঃখ এমন কিছু বাড়বে না—আর তুমি মায়া করেও আমার দুঃখ কিছুই কমাতে পারবে না—তোমার সেই সব মিষ্টি কথা কোথায় গেল? তুমি কথা

দিয়েছিলে আমায় ভালবাসতে পারবে একদিন—আমার সম্বন্ধে চিন্তা করবে—ভুলে গেছ ? এখন সব ভুলে গেছ ?

বাথশেবা কোনরকমে আবেগ চেপে রেখে দৃঢ়ভাবে বলল—মিঃ বোল্ডউড ! আমি আপনাকে কোনও প্রতিশ্রুতি দিই নি। আপনি কি মনে করেন আমি মাটির তৈরী—যে আপনি আমাকে ভালবাসেন বললে আমার মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া হবে না ?—যে কোনও মেয়েকে ভালবাসার কথা বলা মানে তার দুর্বলতম স্থানে স্পর্শ করা—আমি কি করে জানবো যে অন্যেরা যেটাকে খেলা মনে করে, আপনার কাছে তা মৃত্যুতুল্য। যুক্তি দিয়ে চিন্তা করুন—

—যুক্তি বিচারের কথা ছেড়ে দাও—শুধু এইটুকু ঠিক যে, তুমি আমার হতে যাচ্ছিলে কিন্তু এখন তুমি তা নয়। একদিন যখন তুমি আমার কিছুই ছিলে না, আমার কোনও দুঃখ ছিল না—এখনও তুমি আমার কিছু নও—শুধু যদি না এইভাবে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে—

—আমি কোনদিন আপনাকে গ্রহণ করিনি—কক্ষনো না—বাথশেবা বলল—আমার ত্রুটি থাকলে আমি সাগ্রহে মেনে নিতে রাজী কিন্তু আপনি যেভাবে কথাবার্তা বলছেন—

—প্রিয়তমে, আমি কিছুতেই তোমাকে অন্তর থেকে ত্যাগ করতে পারছি না। তুমি শুধু একবার ভুলে যাও যে তুমি 'না' বলেছ—আর এই চিঠিটা মজা করার জন্যেই পাঠিয়েছিলে আমার কাছে।

—সেটা আমাদের উভয়ের পক্ষেই খারাপ হবে—আপনার মত জলন্ত ভালবাসা আমার নেই—ছোটবেলা থেকেই অভিভাবকহীন বলে দুনিয়াটা আমার বড় ঠাণ্ডা মনে হয়।

বোল্ডউড তীব্র প্রতিবাদ করে বলে উঠল—এটা কোনও যুক্তি নয়, মিস এভার্ডিন ! তুমি মোটেই নিরুত্তাপ নও। আমাকে ভালবাস না সেটা অন্য কথা—কিন্তু তোমার উষ্ণ প্রেম এখন অন্যখাতে বইছে—এবং আমি ভালভাবেই জানি সে ব্যক্তিটি কে !

বাথশেবা নিশ্চুপ হয়ে গেল। সে ট্রয়ের ইঙ্গিত ধরতে পারছিল। পরমুহূর্তেই বোল্ডউড ফুঁসে উঠল—ট্রয় কেন আমার সম্পদে হাত দিয়েছে ? আমি তো তার কোন ক্ষতি করি নি—সে আসার আগে তুমি তো আমাকেই পেতে চেয়েছিলে—এবার ফিরে এলেই তোমার সম্মতি আমি পেয়ে যেতাম—একথা তুমি অস্বীকার করতে পার ?

বাথশেবা একটু দেরী করলেও উত্তর দিল না।

—সে আমার অসাক্ষাতে আমার জিনিষ চুরি করেছে—কেন সে আগেই এল না—তহেলে আমার দুঃখিত হওয়ার কিছু ছিল না—এখন এই আকাশ, পাথর, সকলেই আমাকে দেখে হাসবে—আমার মান সম্ভ্রম সব গেল—আর কোনওদিন ফিরে পাব না—আমার আর কোনও দাবী নেই তোমার উপরে—এরপর কোথাও কোনদিকে চলে যাব একদিন—মনে মনে ভাবব একজনকে ভালবাসতাম আমি—আমি মরে গেলে লোকে বলবে চিরদুঃখী একটা ব্যর্থপ্রেমিক।

বাথশেবা এই যুক্তিহীন রাগ দেখে ভয় পেয়ে যাচ্ছিল, বোল্ডউড বলল—পেতলের চাকতি আর লালরং দেখে তোমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল—বাথশেবা! হায়! মেয়েদের স্বভাবই এই।

বাথশেবা হঠাৎ রেগে উঠল—আপনি অনেক বেশী কথা বলছেন। প্রতিটি লোক আমার পেছনে লেগেছে—আমি একাই লড়ছি এই সবের বিরুদ্ধে। বিশ্বসংসারে আমার বন্ধু কেউ নেই। কিন্তু আপনারা যতই…আমাকে দেখে টিটকারি দিন আমি আমার পথ থেকে একচুলও নড়ব না।

—হ্যাঁ, তুমি তার সঙ্গে আমার গল্প কোর, যে বোল্ডউড তোমার জন্তে জান কবুল করেছিল। অবশ্যি তুমি এখনই তার হয়ে গেছ—তোমাকে তো চুম্বনও করেছে সে!

বাথশেবা বড় হাঁ করে হাঁপাতে লাগল—আমাকে একটু একা থাকতে দিন।—দয়া করে ছেড়ে দিন আমাকে।

—তুমি কি চুম্বনের কথা অস্বীকার করতে পার?

—না!

—ও! তার মানে সে তোমাকে চুমু খেয়েছে—মোটা গলায় বলল ফার্মার।

—হ্যাঁ—বাথশেবা নির্ভয়ে বলল—সত্যিকথা বলতে আমি একটু পিছপা নই।

—তাহলে সর্বনাশ হোক তার সর্বনাশ হোক। তোমাকে চুমু খেয়েছে? একদিন সময় আসবে যখন তাকে অনুশোচনা করতে হবে—আমাকে যে দুঃখ সে দিয়েছে তার কোনও ক্ষমা নেই।

—আহা হা, ওভাবে গালাগালি দেবেন না। আমি যে ওকে ভীষণ

ভালবাসি!

—আমি নিজেই ওকে শাস্তি দেব—চাবুক মারব শয়তানটাকে। সে যে সেনাবাহিনীতে ফিরে গেছে রক্ষে—নাহলে গ্রামটা উচ্ছন্নে যেত। ওকে আর ঢুকতে দেব না এখানে। বাথশেবা! আমার অনুরোধ ওকে কাছাকাছি ঘেঁষতে দিও না।

বাথশেবা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল—ট্রয় যে সেনাবাহিনীতে ফিরে যায় নি—বাথশহরে গিয়েছিল মাত্র দুদিনের জন্ম একথা কেবলমাত্র সেই জানত। তার প্রেমিক দুদিন পরে ফিরে এলে মিঃ বোল্ডউডের সঙ্গে যে অনাবশ্যক ঝগড়াঝাঁটি ও করুণদৃশ্যের অবতারণা হবে তাই ভেবে সে শিউরে উঠেছিল। বোল্ডউড হয়তো প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে—এইসব সাত পাঁচ ভেবে বাথশেবা অস্থির হয়ে পড়ল মনে মনে। রাস্তাব ধারে কতকগুলো পাথরের ওপব বসে সে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল—তার হৃদয় তখন বহুদূরে ট্রয়ের কাছাকাছি।

॥ ২৮ ॥

একটু রাত হলে ওয়েদারবেরী গ্রামে কবরের নিঃস্তব্ধতা নেমে আসে। গীর্জার ঘড়িতে এগারটা বাজল—ঢং ঢং করে সে আওয়াজ নৈঃশব্দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল দূরে মেঘের জগতে।

আজ রাত্রে বাথশেবার বাড়ী ফাঁকা। লিডি এবং বাথশেবা কেউ বাড়ী ছিল না। এগারটা বাজাব কিছুক্ষণ পরে ম্যারিয়ান তার বিছানায় নড়ে চড়ে বসল—নিদ্রার কিছু ব্যাঘাত হচ্ছিল—হয়তো কোনও স্বপ্ন দেখেছিল—বিছানায় হাতড়ে হাতড়ে কিছু দেখল—তাবপরে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আবছা অন্ধকারে দূরে আস্তাবলের সামনে মনে হল একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে—সে একটা ঘোড়াকে সামনের দিকে ঘাড়ের চুল ধরে বাইরে নিয়ে এল—একটু তফাতেই একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে—তারপর ঘোড়াকে গাড়ীর সঙ্গে জুতে দিয়ে বেরিয়ে গেল। দূর থেকে চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল আকৃতিটা কোনও মেয়েছেলের অথবা বেদে জাতীয় কোন লোকের। এতরাত্রে কোনও মেয়ের পক্ষে ঘোড়া চুরি করতে আসাটা অবাস্তব। বাড়ীতে লোকজন নেই, সুবর্ণ সুযোগ—চোর ঠিক মওকা বুঝেই এসেছে। সন্দেহের আরও কারণ ছিল—

ওয়েদারবেরীর দক্ষিণে কিছু বেদেরা আস্তানা গেড়েছিল কয়েকদিন যাবৎ।

ম্যারিয়ান ভয় পেয়েছিল বেশ। চোরটা চলে যেতে, সাহস ফিরে পেল তাড়াতাড়ি ঘর খুলে সে ছুটে গেল কাছেই কোগানের বাড়ীতে। কোগানকে ডেকে তুলল চীৎকার করে।

কোগান গ্যাব্রিয়েলকে ডেকে তুলল। দুজনে গিয়ে দেখল—'ডেইন্টি' নামের ঘোড়াটা নেই। সেটাই সামনে বাঁধা ছিল। চোর তাড়াতাড়ি ওকে খুলে নিয়ে লাগাম পরিয়ে গাড়ীশুদ্ধ হাওয়া হয়ে গেছে।

গ্যাব্রিয়েল তখুনি সিদ্ধান্ত নিল—ওরা পিছনে ধাওয়া করবে।—কোগান তৈরী হও—এখুনি বেরুতে হবে। না হলে মিস এভার্ডিন এলে কি উত্তর দেব! ম্যারিয়ান কাঁদতে বসল—হায় হায় কত গালাগালি করবে সে এসে—হায় কি বলব আমি। কপাল আমার! সে থাকতে কেন চুরি হ'ল না।

দুটো শক্ত সমর্থ ঘোড়া নিয়ে গ্যাব্রিয়েল আর কোগান বেরিয়ে পড়ল গ্যাব্রিয়েল চেঁচিয়ে বলল—ম্যারিয়ান, তুমি শুয়ে পড়গে যাও।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা গ্রাম ছাড়িয়ে একেবারে দক্ষিণে বেদেগুলোর আস্তানার কাছাকাছি এসে পড়ল। কিন্তু ভাল করে দেখল সেখানে কেউ নেই কোগান বলল—ব্যাটারা সব কেটে পড়েছে। তাহলে গ্যাব্রিয়েল, কোন দিকে যাবে?

গ্যাব্রিয়েল বলল—একদম সিধে। আমাদের ঘোড়া ভাল আছে—কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলব ওদের।

বিকালবেলা বৃষ্টি হওয়ার জন্যে রাস্তাটা ভিজে ছিল—কিন্তু কাদা হয় নি। চলতে চলতে তারা একটা মোড়ে এসে পড়ল। কোগান হঠাৎ লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। গ্যাব্রিয়েল জিজ্ঞাসা করল—কি হ'ল?

—রাস্তাটা দেখে নিতে হবে তো—কোন দিকে গেছে?—বলে সে পকেটের মধ্যে দেশলাই খুঁজতে লাগল। দেশলাই বার করে একটা কাঠি জেলে দেখল —গাড়ীর চাকার বা ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ দেখা যাচ্ছে কিনা।

—এই যে এই যে এই দেখো।—এই দিকে গেছে—দেখছ ঐ ঠিক আমাদের ডেইন্টির পায়ের দাগ। —বলল জ্যান।

—কি করে বুঝলে?

—কেন জিমি বুড়ো এই সেদিন না ওর ক্ষুরে নাল পরিয়ে দিয়েছে—সামনের দিকে ডান পাটায় ও ব্যথা পেয়েছিল, তাই কেমন একটু খোঁড়ানো ভাব—

জোরে দাগ পড়ে নি।

—তাই হবে। তাহলে অন্য বেদেগুলো আগেই সরে পড়েছে অন্যপথে—রাস্তায় আর তো কোনও দাগ দেখলে না!

—না।

—চালাও, দেরী করবার আর সময় নেই।

—মাইল তিনেক খুব ঘোড়া ছুটিয়ে এল ওরা। সামনেই 'বাথ' শহরে যাওয়ার বড রাস্তা, গ্রামের রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তায় ওঠার মুখে একটা চেক-পোষ্ট আছে। কোগান বলল—এইবার শালাকে আমরা ধরে ফেলব।

—কি করে?

—ঐ যে টার্ণ পাইকের গেট—গেটকীপার ব্যাটা ভীষণ ঘুমকাতুরে—ও ক্যাষ্টার ব্রিজের গেটে থাকতেই আমি চিনি ওকে। ব্যস মার দিয়া—ঘোড়াও খোঁড়া আব সামনে গেট, যাবে কোথায়? এখন তারা খুব সাবধানে এগুতে লাগল। সামনেই গেটটা আবছা আবছা দেখা যাচ্ছিল। গ্যাব্রিয়েল বলল—ঘাসের উপর দিয়ে চালাও ঘোড়া।

আরও কাছে আসতে গেটের সামনেটা অন্ধকার মনে হ'ল, কিছু একটা আছে। একজন কেউ চেঁচিয়ে বলল—এইও! আস্তে, সামনে গেট। ওরা পৌঁছনোর আগেই কেউ গেটম্যানকে জাগিয়েছিল। একটা মোমবাতি হাতে করে করে লোকটা এগিয়ে এল।

—সেই আলোয় পুরো দৃশ্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

গ্যাব্রিয়েল চেঁচিয়ে বলল—গেট বন্ধ রাখো।—ও ঘোড়া চুরি করেছে।

—কে? জিজ্ঞাসা করল গেটম্যান।

গ্যাব্রিয়েল গাড়ীর চালকের দিকে তাকিয়ে দেখে একটি মেয়েছেলে। তার মনিব বাথশেবা গাড়ীতে বসে। গ্যাব্রিয়েলের কথা শুনে সে আলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এইটুকু সময়ের মধ্যে তার মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে গেল। প্রেমের ক্ষেত্রে না পারলেও, অন্য বিপদে বাথশেবা খুব মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারত। বিস্ময়ের ভান করে সে বলল—গ্যাব্রিয়েল! কোথায় চলেছ এই রাত্রে?

—আমরা ভেবেছিলাম—গ্যাব্রিয়েল বলতে গেল।

—আমার একটা বিশেষ দরকার পড়ে গেল—তাই 'বাথ' এ যেতে হচ্ছে—বাথশেবা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল—(যে গুণটার অভাবে গ্যাব্রিয়েল থমকে

গিয়েছিল)—লিডির কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিতে হ'ল—তাছাড়া আর উপায় ছিল না। তোমরা কি আমাকে ফলো করছ।

—আমরা ভেবেছিলাম ঘোড়াটা চুরি হয়ে গেছে।

—কি আশ্চর্য্য! বোকার মত কথা। তোমরা একবার ভেবে দেখলে না আমিই লাগামটা আর ঘোড়া খুলে নিয়ে গেছি। ম্যারিয়ানকেও জাগাতে পারলাম না, বাড়ীতেও ঢুকতে পারলাম না—ওর জানালায় আমি অন্ততঃ দশ মিনিট ধরে আওয়াজ করেছি—অবশেষে চাবীটা পেয়ে গেলাম তাই রক্ষে। কাউকে কষ্ট না দিয়ে ঘোড়াটা খুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তোমরা বুঝতে পারলে না? আমিই এনেছি ঘোড়া।

—কি করে বুঝব?

—কোগান বলল—তাছাড়া আপনি তো কিছু বলে আসেন নি—আর এত রাত্রে কোনও মেয়েছেলে ঘোড়া নিয়ে বেরোয় না। সেটাই সমাজের নিয়ম—

—কেন আমি তো লিখে এসেছি—সকাল হলেই তোমরা দেখতে পেতে। গাড়ীর ঘরের দরজায় আমি খড়ি দিয়ে লিখে এসেছি—ঘোড়ার জন্য ফিরে এসেছিলাম—নিয়ে গেলাম, কাউকে জাগাতে পারলাম না, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

—কিন্তু দিনের আলো ছাড়া সে আমরা টের পাব কি করে?

—তা ঠিক! বাথশেবা প্রথমে একটু বিরক্ত হলেও, এদের দায়িত্ববোধ এবং ভালমন্দের প্রতি নজর দেখে মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হ'ল, বলল—তোমাদের এত কষ্ট করার জন্যে ধন্যবাদ।

—কিন্তু ডেইন্টি তো খোঁড়াচ্ছে—আপনি যেতে পারবেন? বলল কোগান।

—ও! ওটা ওর পায়ে একটা পাথরের কুচি ঢুকে গিয়েছিল তাই। আমি একটু আগে নেমে বার করে দিয়েছি। দিনের আলো ফুটতেই আমি পৌছে যাব বোধ হয়। তোমরা ফিরে যাও, কেমন? বলে বাথশেবা খোলা গেট দিয়ে এগিয়ে গেল। কোগান আর গ্যাব্রিয়েল তাদের ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে চলল তাদের পুরনো পথে ওয়েদারবেরীর দিকে।

—কি অদ্ভুত খেয়াল! তাই না, ওক? বলল কোগান।

—হুঁ—গ্যাব্রিয়েল ছোট করে উত্তর দিল।

—রাতের মধ্যে উনি কিছুতেই পৌছতে পারবেন না।

—আচ্ছা কোগান! আমরা যদি আজ রাত্রের এসব ঘটনা আর কাউকে না বলি?

—ঠিক হ্যায়—আমার আপত্তি নেই।

—বেশ! তাহলে আর কাউকে কিছু না বলে আমরা ভোরের আগেই গিয়ে যার যার ঘরে শুয়ে পড়ব।

বোল্ডউডের সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যেবেলা দেখা হওয়াব পর বাথশেবা অনেকক্ষণ একা একা বসে চিন্তা করেছিল। দুটি প্রতিকারের কথা তার মনে এল—প্রথমটি হল, অবিলম্বে ট্রয়ের সঙ্গে দেখা করে তাকে এখনই ওয়েদারবেরী আসা থেকে বিরত করা, যাতে বোল্ডউডের রাগ এবং দ্বেষ ঠাণ্ডা হয় আর দ্বিতীয় হল ওকের পরামর্শমত ট্রয়ের চিন্তা মন থেকে একেবারেই পরিহার করা। কিন্তু হায়! সে কি সম্ভব হবে? ট্রয়কে কি সে কোনদিন বলতে পারবে, যে সে তাকে পছন্দ করে না, ট্রয় যেন আর কোনদিন ওয়েদারবেরীতে তার সঙ্গে দেখা না করে।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ল বাথশেবা। ভেবেচিন্তে সে ঠিক করল এখনই ট্রয়ের সঙ্গে দেখা করে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার—যাতে ট্রয় তাকে এই বিপদে সাহায্য করতে পারে। এখন চিঠি লিখলে—আর পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ট্রয় হয়তো ওয়েদারবেরীতেই এসে হাজির হবে। বাথশেবা মোটেই ভাবে নি যে প্রেমিককে ভুলে থাকতে হলে তার সঙ্গেই যুক্তি করে সে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না? না কি এক অবচেতন আনন্দের প্রেরণায় এ ছিল তার প্রেমিকের সঙ্গে আর একবার দেখা করার এক অছিলা?

অন্ধকার হয়ে এল, বোধ হয় দশটা কি সাড়ে দশটা বাজল,—বাথশেবা ইয়ালবেরীতে লিডির ভগ্নীপতির বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করল—ফিরে চলল ওয়েদারবেরীতে। ঠিক করল নিজের আস্তাবল থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে বাথের দিকে রওনা দেবে। এই যাত্রা যে খুব কষ্টকর হবে সে চিন্তা বাথশেবা করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে যা ভেবেছিল—তার থেকেও বহুগুণ বেশী দুরূহ ছিল ব্যাপারটা—মেয়েছেলে হয়ে, একা একা এই রাত্রে, এত দূরের পথে পাড়ি দেওয়া। কিন্তু তাই বলে সে এই চিন্তা ত্যাগ করার কথা ভাবতেও পারল না।

কারণ আর কোনও উপায় ছিল না—সকাল হওয়ার আগেই ট্রয়ের সঙ্গে গিয়ে না দেখা করতে পারলে সে হয়তো বেরিয়ে পড়বে ওয়েদারবেরীর উদ্দেশ্যে।

বাথশেবা ঠিক করল ট্রয়কে বিদায় জানিয়ে সে ঘোড়াটাকে বিশ্রাম করতে দেবে সারাদিনের জন্যে (আর নিজে মনের দুঃখে সারাদিন বসে কাঁদবে)। তার পরের দিন ভোরবেলা বেরিয়ে সে সহজেই পৌঁছে যাবে লিডির কাছে ইয়ালবেরীতে। তারপর যখন খুশী, সুবিধামত দুজনে ওয়েদারবেরীতে ফিরে আসবে—তাহলে আর কেউ তার গোপনে 'বাথ' শহরে যাওয়ার কথা জানতে পারবে না। বাথশেবার পরিকল্পনায় হিসেবের ভুল ছিল অনেক—কারণ সে এই এলাকায় নতুন—তথাপি বাথশেবা ভয় পাওয়ার মেয়ে ছিল না।

॥ ২৯ ॥

এক সপ্তাহের বেশী হয়ে গেল। বাথশেবার কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে ম্যারিয়ানের কাছে এক চিঠি এসে পৌঁছুল যে তার দিদিমণি যে বিশেষ দরকারে বাথ শহরে গিয়েছিল, সেই কাজেই এখনো আটকে আছে—তবে আশা করা যায় যে আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সে বাড়ী ফিরতে পারবে।

আরও এক সপ্তাহ কেটে গেল। মাঠে ভুট্টা পেকে গেছে—কাটবার সময় হয়েছে—ঝেড়ে পরিষ্কার করে গোলায় তুলতে হবে। খামারের সকলেই সেই কাজে ব্যস্ত—দম ফেলবার ফুরসৎ নেই।

কড়া রোদ্দুরে একনাগাড়ে পরিশ্রম করে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই এক গাছতলায় একটু বসে বিশ্রাম করছিল। এমন সময় দূরে একজনকে দেখা গেল ছুটতে ছুটতে এইদিকে আসছে।

কোগানই তাকে প্রথম দেখতে পেয়েছিল, বলল—কে আসছে ওটা ?

—আমার দিদিমণির কিছু না হলে বাঁচি—ম্যারিয়ান বলল—আজ সকাল থেকেই মনটা এমন খচখচ করছে। দরজার তালাটা খুলতে গিয়ে চাবিটা পড়ে গেল হাত থেকে। আমি তখনই ভেবেছি, দিদিমণি বাড়ী নেই—কেমন আছে কে জানে ?

—ও! কেইন বল! বলল গ্যাব্রিয়েল। এই ফসল কাটা ইত্যাদি, গ্যাব্রিয়েলের করনীয় কাজের মধ্যে পড়ে না—তবুও বাথশেবার ক্ষতি হতে পারে এই আশঙ্কায় সেও হাত লাগিয়েছিল।

ম্যাথু মুন বলল—হ্যাঁ, ছোঁড়াটা কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিল। দেখছ না কেমন রঙ চঙে জামা পরেছে।

—বাঃ বেশ, বেশ। আমারও ইচ্ছে করে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি—বলল জোসেফ পুয়োরগ্রাস।

ইতিমধ্যে কেইনি পৌঁছে গেছে সেখানে। তার মুখ ভর্তি শুকনো পাউরুটি—আর হাতে বাকীটুকু—খেতে খেতেই দৌড়চ্ছিল সে। দৌড় থামিয়েই সে খুব কাশতে লাগল। গ্যাব্রিয়েল বলল—কেইনি! তোকে কতদিন বলেছি খেতে খেতে দৌড়বি না। দম আটকে যেদিন মরে যাবি সেইদিন মজা টের পাবি।

খক্ খক্ খক্—কেইন উত্তর দিল—খানিকটা রুটি আটকে গেছে গলায়—সেই জন্যে। আমি এখন সেই 'বাথ' শহর থেকে আসছি—খক খক্—আমি যা দেখেছি না—

'বাথ' এর কথা শুনে সকলেরই কান খাড়া হয়ে উঠল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেইনের -গলায় তখনও রুটি আটকে ছিল—অনেক চেষ্টা করেও সে তার অভিজ্ঞতার কথা তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে পারছিল না। অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে, কেইন বলল—অবশেষে দুনিয়াটা দেখা হোল। আর বাথশহরে তো আমি আমাদের ম্যাডামকে দেখেছি—খক খক।

—ধুত্তোর! কাশির নিকুচি করেছে—গ্যাব্রিয়েল মুখ ফিরিয়ে নিল।

—প্লীজ, মিষ্টার ওক, একটা মশা কামড়েছিল এই পেটের মধ্যে—সেইজন্যে আবাব কাশি লাগল।

—বেশ হয়েছে—'বাথ' শহরে কি দেখেছ তাই বল—বলল গ্যাব্রিয়েল।

—দেখলাম, আমাদের মালকিন একজন সোলজারের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একদম কাছাকাছি, দুজনে হাত ধরাধরি করে, তারপরে পার্কে গিয়ে বসলেন পাশাপাশি। সোলজার আমার মনে হ'ল সার্জেণ্ট ট্রয়। অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেল দুজনে। ম্যাডাম আবার কাঁদছিল বোধহয়।

—তুই ঠিক দেখেছিস—আমাদের ম্যাডাম? ভুল হয় নি? জিজ্ঞাসা করল একজন।

গ্যাব্রিয়েলকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। আর সকলেই কেইনের সঙ্গে নানা-রকম আলাপ করছিল। কেইন কোথায় ছিল, কি কি দেখল, জুতোয় ফিতে পরিয়েছে কিনা, গীর্জায় বেড়াতে গিয়েছিল কি না ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ হ ল। গ্যাব্রিয়েল তারপর বলল—কেইন্, তোমাকে দিব্যি করে বলতে হবে, তুমি সত্যি সত্যি আমাদেব মিস এভার্ডিনকে

সোলজারের সঙ্গে ঘুরতে দেখেছ কিনা?

—কেইন বল্! তুমি এখন আর বাচ্চা খোকাটি নও—জোসেফ পুয়োরগ্রাস খুব গম্ভীরভাবে বলল—দিব্যি করার পরিণাম জান তো? যদি মিথ্যে হয় তাহলে শাস্ত্রে বলেছে চব্বিশ ঘণ্টাব মধ্যে মাটির তলায় যাবে—এখন আমাদের শেফার্ড যেমন বলেছে—দিব্যি করে বলতে পারবে তুমি ম্যাডাম ছাড়া অন্য কাউকে দেখ নি?

কেইন বল একজনের থেকে আরেকজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। পরিণামেব কথা চিন্তা করে তাব মুখ শুকিয়ে গেল। বলল—প্লীজ, মিষ্টার ওক—আমি বলছি তো সত্যি কথা—কিন্তু দিব্যি আমি গালতে পারব না।

—তাহলে সত্যিমিথ্যে কিছু প্রমাণ হয় না—বলল গ্যাব্রিয়েল।

সকলেই আবার কাজে ফিরে গেল। আগের মত কাস্তেগুলো ঝলসে উঠতে লাগল রোদ্দুরে। কিন্তু গ্যাব্রিয়েলকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। সে খুব নিবাসক্তভাবে, খুব ধীবেও না, আবাব খুব উৎসাহের সঙ্গেও না, কাজ করে যাচ্ছিল। কোগান লক্ষ্য করেছিল গ্যাব্রিয়েলকে, সে বলল—গ্যাব্রিয়েল, ও কথা চিন্তা করে আর কি লাভ? সে যাকেই ভালবাসুক না কেন, তোমার তো আর হবে না?—হ্যাঁ, আমিও মনে মনে সেই কথা ভাবছি—গ্যাব্রিয়েল উত্তর দিল।

॥ ৩০ ॥

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা ওক বিশ্রাম করতে যাওয়ার আগে, কোগানের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে খামারের দিকে তাকিয়ে সবদিক একবার দেখে নিচ্ছিল। একটা গাড়ী এগিয়ে আসার শব্দ শোনা গেল। গাড়ীর মধ্যে দুটি মহিলা বেশ স্বাভাবিক গলায় কথাবার্তা বলছিল। ওক চিনতে পারল যে ওরা বাথশেবা এবং লিডি। গাড়ীটা পাশ দিয়ে চলে গেল। লিডি বাথ শহরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল আর বাথশেবা খুব ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিচ্ছিল। মনে হ'ল বাথশেবা এবং তার ঘোড়াটি দুজনেই খুব ক্লান্ত।

বাথশেবাকে নিরাপদে ফিরতে দেখে এমন একটা স্বস্তির ভাব এল ওকের মনে যে, নানারকম সংবাদ পেয়ে তার যে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল তা মুহূর্তে কেটে গেল। ওক অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাকাশের শোভা

দেখতে লাগল। এইভাবে হয়তো সে আধঘণ্টাটাক দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় একটি লোক পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে তাকে বলল—গুড নাইট গ্যাব্রিয়েল!

গ্যাব্রিয়েল তাকিয়ে দেখল মিঃ বোল্ডউড, সেও প্রতিনমস্কার জানাল। বোল্ডউড আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে, গ্যাব্রিয়েল ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ফার্মার বোল্ডউড মিস এভাডিনের বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিল। সদর দরজায় পৌঁছে দেখল বসবার ঘরে একটা আলো জলছে। ঘরের মধ্যে বাথশেবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু কাগজ বা চিঠি পত্র দেখছিল। বোল্ডউড আস্তে আস্তে গিয়ে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষায় দরজায় টোকা দিল।

ইয়ালবেরীর রাস্তায় বাথশেবার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে বোল্ডউড আর বাইরে বেরোয় নি। একা একা মনে মনে 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম' বিষয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করেছে। নারী চিত্তের এই রহস্যের কথা ভেবে ক্ষমা আর উদারতায় তাব মন ভরে গিয়েছিল। আজকের এই সন্ধ্যেবেলা বাথশেবা লিডির বোনের বাড়ী থেকে ফিরে এসেছে শুনেই ('বাথ' শহরের ব্যাপার কিছুই জানা ছিল না তার) বোল্ডউড সলজ্জ মার্জনা ভিক্ষা করতে এসেছিল বাথশেবার কাছে, সেদিনকার আচরনের জন্যে।

লিডি দরজা খুললে, মিস এভার্ডিন আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করল বোল্ডউড। লিডি যেন বিশেষ পাত্তা দিল না। বোল্ডউড সেটা লক্ষ্য করে নি। তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে লিডি ভেতরে গেল। এমন সময় যে জানলাটা দিয়ে বাইরে আলো দেখা যাচ্ছিল সেটা বন্ধ করে দেয়া হ'ল। লক্ষণটা বোল্ডউডের ভাল মনে হল না। লিডি বেরিয়ে এসে বলল—মিস এভাডিন এখন আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

বোল্ডউড তক্ষুনি বেরিয়ে গেল সদর দরজা দিয়ে। নিজের আচরণের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করতে পারল না—তাই তার মনে কষ্ট থেকে গেল। সে ভাবছিল এই কিছুদিন আগেও যার বাড়ীতে ভোজসভায় সে ছিল সম্মানীয় অতিথি আজ সেই বসবার ঘরেই তার প্রবেশের অধিকায় পর্য্যন্ত নেই।

বাড়ী ফিরবার জন্যে এমন কিছু তাড়া ছিল না বোল্ডউডের। প্রায় দশটা বাজল। ঘুরতে ঘুরতে বোল্ডউড লোয়ার ওয়েদারবেরীতে, যেখান থেকে ভাড়ার গাড়ী ছাড়ে সেখানে এসে পৌছুল। গাড়ীটা নিয়মিত প্যাসেঞ্জার নিয়ে এখান থেকে উত্তরের দিকে যায়, আবার ফিরে আসে—এই গ্রামেরই একটি লোক এই গাড়ীর চালক এবং মালিক। সেই সময় গাড়ীটা ফিরে এসে দাঁড়াল—

ছইএর মাথায় ঝোলানো লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল ঝকঝকে পোষাকপরা একটি ভদ্রলোক নামছে। বোল্ডউড মনে মনে বলল—ও! প্রেমিকাকে দেখতে এসেছে আবার।

ট্রয় গাড়ী থেকে নেমে গাড়োয়ানের বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকল। গাড়োয়ানের একটা পান্থশালা ছিল, যেখানে দু'চার দিনের মত থাকার আশ্রয় মিলত। ট্রয় গতবারে এসে এখানেই উঠেছিল। দূর থেকে এই দেখে বোল্ডউড নিজের বাড়ীর দিকে এগুল। মিনিট দশেক পরে কি ভেবে সে ফিরল আবার। ঠিক গাড়োয়ানের বাড়ীর দরজায় এসে দেখে ট্রয় তার যে ব্যাগটা নিয়ে নেমেছিল—সেটাই কাঁধে তুলে ঘর থেকে বাইরে আসছে। বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সে রওনা দিল। মনে হচ্ছিল আজই রাত্রে সে ফিরে যাবে আবার—এই 'লজিং'এ রাত্রে থাকার কোনও পরিকল্পনা তার নেই।

বোল্ডউড এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরল—সার্জেণ্ট ট্রয়?

—হ্যাঁ, আমি সার্জেণ্ট ট্রয়।

—এখুনি আসা হ'ল বুঝি দেশ থেকে?

—আমি এখন 'বাথ' থেকে আসছি।

—আমি উইলিয়ম বোল্ডউড।

—ও আচ্ছা—যে ভঙ্গিতে ও স্বরে এই শেষ কথাটা উচ্চারিত হ'ল বোল্ডউড তার আলাপ শুরু করার জন্যে এইটারই অপেক্ষা করছিল। সে বলল—

—আমার কিছু কথা আছে।

—কি বিষয়ে?

—ঐ যে ওখানে যে ভদ্রমহিলা বাস করেন, যাঁর সর্ব্বোনাশ করেছ তুমি—সেই সম্বন্ধে—

—তোমার ঔদ্ধত্য দেখে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—ট্রয় বলল চলতে চলতে।

বোল্ডউড তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল—শোন, আশ্চর্য্য হও না হও, তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে।

বোল্ডউডের দৃঢ়তা দেখে ট্রয় থমকে গেল। তার সমর্থ চেহারা এবং হাতে মোটা লাঠির দিকে তাকাল একবার। রাত্রি প্রায় দশটা বাজে। ট্রয় ভাবল—বোল্ডউডের সাথে ভদ্রআচরণ করাই এখন সমীচীন।

—নিশ্চয়ই, আমি সব সময়েই শুনতে রাজী—ট্রয় হাতের ব্যাগটা মাটিতে

নামিয়ে রেখে বলল—শুধু একটা অনুরোধ—কথাগুলো যেন একটু আস্তে আস্তে হয়, নইলে ঐ খামার বাড়ীর অন্য কেউ শুনে ফেলতে পারে।

—শোন, তোমার সঙ্গে ফ্যানি রবিনের ব্যাপার স্যাপার সব আমি জানি—আর আমি ছাড়া একমাত্র গ্যাব্রিয়েল ওক জানে। এ গ্রামের আর কেউ জানে না বোধ হয়। তোমার তাকে বিয়ে করা উচিত।

—নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু আমি চাইলেও তো পারছি না।

—কেন?

ট্রয় তাড়াতাড়িতে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল—আমি গরীব মানুষ। তার গলার স্বরে কৃত্রিমতা এবং ধূর্ততা প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু বোল্ডউডের এসবদিকে নজর দেওয়ার সময় ছিল না। সে বলে যেতে লাগল—ন্যায়—অন্যায়ের কথা ছেড়ে দাও—তোমার সঙ্গে আমি একটা দেনাপাওনার সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চাই।

—তাই নাকি? বলল ট্রয়—তা'লে এখানে বসা যাক।

উল্টো দিকেই একটা পুরণো গাছের গুঁড়ি কাটা পড়েছিল। দু'জনে সেখানে বসল।

—আমার সঙ্গে মিস এভার্ডিনের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল।—বোল্ডউড বলল—কিন্তু তুমি এসে—

—কথা তো ছিল না—ট্রয় বলল।

—হ্যাঁ, প্রায় তাই—

—আমি না এসে পড়লে হয়তো ঠিকঠাক হ'ত—

—হয়তো আবার কি? তুমি না এলে, এতদিনে আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেত নিশ্চিত। আর তোমার এতদিনে বিয়ে হওয়ার কথা ফ্যানি রবিনের সঙ্গে। মিস্ এভার্ডিনের সামাজিক স্ট্যাটাসের সঙ্গে তোমার তুলনাই চলে না —অতএব আর ক্ষতি কোর না তাঁর—তুমি ফ্যানিকে বিয়ে কর—আমিই সব ব্যবস্থাদি করে দেব।

—কি রকম?

—এখুনি তোমাকে কিছু টাকা দিয়ে দিচ্ছি, আর ভবিষ্যতে যাতে দারিদ্র্যে না পড়তে হয় তারও ব্যবস্থা করে দেব। তাছাড়া বাথশেবা তোমাকে নাচাচ্ছে —তার সামাজিক সম্মান তোমার অনেক উপরে। অতএব আর সময় নষ্ট না করে, তোমার সঙ্গে খাপ খায় এমন সঙ্গী খুঁজে নাও। তোমার ঐ ব্যাগ

নিয়ে, এখুনি এই রাত্রে ওয়েদারবেরী থেকে সরে পড়—তার জন্যে তোমাকে অন্ততঃ পঞ্চাশ পাউণ্ড দেব আমি। আর ফ্যানিকে দিচ্ছি পঞ্চাশ পাউণ্ড তার বিয়ের প্রস্তুতির জন্যে। বিয়ের দিন দেব আরো নগদে অন্ততঃ পাঁচশ পাউণ্ড।

বোল্ডউডের কথাবার্তায় কেমন যেন অসহায়তা প্রকাশ পাচ্ছিল। তার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার দুর্বলতা ধরা পড়ে যাচ্ছিল। আগেকার সেই দৃঢ় মর্য্যাদা সম্পন্ন বোল্ডউড এখন হারিয়ে গেছে। আরও কিছুদিন আগে হলে তার নিজের এই শিশুসুলভ অপরিপক্ক আচরণে নিজেরই হয়তো হাসি পেত। প্রেমে পড়লে মানুষের এমনই হয় বোধহয়। ভালবাসা যত বড় শক্তিই হোক, মানুষকে নিশ্চয়ই কিছুটা সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর করে তোলে। হৃদয় একমুখী হলেও বিশালতা হারিয়ে ফেলে। বোল্ডউডই ছিল তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। ফ্যানির বর্তমান অবস্থা বা ট্রয়ের সামর্থ্য-সঙ্গতি সম্পর্কে কিছু না জেনেও বোল্ডউড এইকথা বলে ফেলল।

—হ্যাঁ, ফ্যানিকে আমাব খুব ভাল লাগে, বলল ট্রয়—আর তুমি যেমন বলছ মিস্ এভার্ডিনেব সঙ্গে আমার তুলনা চলে না তাহলে ফ্যানিকে বিয়ে করাই ভাল—আর ফাউ পাওয়া যাবে তোমার টাকা।

—তা'লে তুমি আমার এ প্রস্তাবে রাজী?

—রাজী।

—হায়! বোল্ডউড দীর্ঘশ্বাস ফেলল—তুমি যদি ফ্যানিকেই ভালবাস তবে কেন এখানে এসে আমার শান্তি নষ্ট করলে?

—ফ্যানিকে আমি এখমও ভালবাসি—ট্রয় বলল—কিন্তু বাথশেবা, মানে মিস এভাডিনকে দেখে ভুলে গিয়েছিলাম—এখন কেটে গেছে সে সব।

—এত তাড়াতাড়ি কি করে কেটে গেল? আর তুমি তা'লে কেনই বা আসছ ব [illegible]?

[illegible] যথেষ্ট আছে—এক নম্বর হ'ল নগদ পঞ্চাশ পাউণ্ড—তুমি বলেছ এখুনি।

—হ্যাঁ বলেছি।—বলে বোল্ডউড একটা প্যাকেট বার করে ট্রয়কে দিল—এই নাও?

—একেবারে রেডী—তুমি কি ভেবেই রেখেছিলে যে আমি রাজী হয়ে যাব—ট্রয় প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বলল।

—আমি আশা করেছিলাম তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু থাকলে—তুমি রাজী

হবে—কারণ পাঁচশো পাউণ্ড তো আর খুব কম নয়। তাছাড়া যে লোকটি তোমার একজন নির্ভরযোগ্য বন্ধু হতে চায় তাকে শুধু শুধু শত্রু করে তোলারও মানে হয় না।

—আস্তে, ঐ শোন—ট্রয় ফিস ফিস করে বলল।

তাদের সামনে একটু আগে চপ্পলের হাল্কা চটবপটর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

—মনে হয়, বাথশেবা আসছে—এগিয়ে যাই, আমাকে দেখা করতে হবে—ট্রয় বলল।

—বাথশেবা? একা এত রাত্রে? বোল্ডউড আশ্চর্য্য হয়ে বলল—তোমাকে দেখা করতে হবে কেন?

—আমার জন্যে সে অপেক্ষা করছে—যাই দেখা করে আসি, আর তোমার কথামত বিদায় জানিয়ে আসি।

—সেজন্যে তো দেখা করতে যাওয়ার কোন প্রয়োজন দেখি না।

—তাতে ক্ষতি কি আছে? দেখা না করলে সে হয়ত ভেবে মরবে—তার থেকে তুমি না হয় শোন—আমি কি কথা বলি না বলি—পরে তুমি যখন ভালবাসবে তখন তোমার কাজে লাগবে।

—ইয়ার্কি করছ?

—না গো—তুমি বুঝতে পারছ না—কিছু না বলে চলে গেলে সে আমার সম্পর্কে আরও বেশী চিন্তা করবে—তার থেকে বলে কয়ে ছেড়ে আসাই ভাল না?

—তুমি ঐ ছাড়া আর কোনও কথা বলবে না তো—ঠিক?

—তুমি এখানে চুপ করে বসে থাক আর আমার এই ব্যাগটা রেখে দাও—আমাদের সব কথাবার্তা শুনতে পাবে।

পায়ের শব্দটা আরও এগিয়ে আসছিল। মাঝে মাঝে যেন আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়াচ্ছিল। ট্রয় খুব নরম করে দু'বার বাঁশির সুরের মত শিস দিল।

—ওঃ এই ব্যাপার!—বোল্ডউড একটু নড়ে উঠল।

—তোমার কিন্তু চুপ করে থাকার কথা—বলল ট্রয়।

—আচ্ছা আবার কথা দিচ্ছি—বোল্ডউড উত্তর দিল।

ট্রয় কিছুটা এগিয়ে গেল।

—প্রিয়তম, তুমি এসেছ?—বাথশেবার গলা শোনা গেল।

—হায় ভগবান—বোল্ডউড দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—হ্যাঁ—উত্তর দিল ট্রয়।

—এত দেরী করলে কেন? বাথশেবা আদুরে গলায় বলল—ভাড়ার গাড়ীতে এসেছ তো? সে তো কতক্ষণ আগে শব্দ শুনলাম—তারপর এত সময় লাগে? আমি তো ভাবছিলাম তুমি আর এলে না—

—আমার তো আসবার কথা ছিল—তাই না?—বলল ট্রয়।

—আমি জানতাম, তুমি আসবে—বাথশেবা খুশী খুশী ভাবে বলল।

—ও ফ্রাংক! কি মজা! আজ রাত্রে আমার বাড়ীতে আর কেউ নেই। কেউ জানবে না—তুমি কখন এলে আর আর কখন গেলে। লিডি গেছে তার দাদুর কাছে ছুটির গল্প করতে। আমি তাকে কাল বিকেলে আসতে বলেছি—ততক্ষণে তো তুমি বেরিয়ে যাবে।

—তোফা! বলল ট্রয়—কিন্তু ডার্লিং, আমি দৌড়ে আমার ব্যাগটা নিয়ে আসি—ওতে আমার চপ্পল, ব্রাশ সব রয়ে গেছে। তুমি এগোও, দশ মিনিটের মধ্যে আমি তোমার বাড়ী পৌছে যাব।

—আচ্ছা—বলে বাথশেবা এগিয়ে গেল।

এইসব কথাবার্তার সময় বোল্ডউড দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে সব শুনছি —মুখ যেন তার কালিমাখা। একটু একটু করে সে ট্রয়ের দিকে এগিয়ে গেল ট্রয় তার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে হাসতে হাসতে বলল—বলব নাকি ওকে— এই শেষ দেখা, আমাদের বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়?

—না, একটু দাঁড়াও, আর একটু কথা আছে। বোল্ডউড খুব মোট গলায় বলল।

—আমার অবস্থাটা দেখছো তো—ট্রয় বলল—আমি হয়তো খুব খারা লোক—আবেগের বশে যা করে ফেলেছি, হয়তো উচিত ছিল না। কিং এদের দুজনকেই তো আর আমি বিয়ে করতে পারি না। ফ্যানিই আমা পছন্দ কারণ ওকেই আমার ভাল লাগে বেশী আর তোমার কথামত সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কথাগুলো শেষ হওয়ার আগেই বোল্ডউড লাফ দিয়ে উঠে ট্রয়ের টুঁটি টি ধরল। এত হঠাৎ হয়ে গেল ব্যাপারটা, ট্রয় আন্দাজ করতে পারে নি। বুঝতে পারছিল বোল্ডউডের হাত গলায় চেপে বসছে।

—একটু শোন—ট্রয় কোনরকমে বলল—তুমি কিন্তু যাকে ভালবাসো তার

ক্ষতি করছ।

—তার মানে ?

—একটু শ্বাস নিতে দাও—বলল ট্রয়।

বোল্ডউড একটু আলগা দিল—বলল—আজই মেরেই ফেলব তোকে।

—এতে লোকসানটি হবে তার—বলল ট্রয়।

—সে বেঁচে যাবে।

—এখন আর কি করে বাঁচবে ? আমি বিয়ে না করলে তো গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে যাবে। বোল্ডউড গরগর করতে লাগল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ট্রয়কে ছেড়ে দিল। জোরে ধাক্কা দিয়ে বেড়ার গায়ে ঠেলে দিয়ে বলল—শালা! তুই আমার সর্বনাশ করেছিস!

ট্রয় একটা বলের মত ছিটকে ফিরে এল। নিজেকে যথেষ্ট সংযত করে বলল—তোমার সঙ্গে আমার শক্তি পরীক্ষার কোন মানে হয় না—ওসব ছোটলোকেরা করে। সেজন্তেই আমি সৈনিকের চাকরি ছেড়ে দেব। এখন কথা হচ্ছে—বাথশেবার আলাপ তো শুনলে—এরপরে কি আমাকে মেরে ফেলাটা যুক্তিযুক্ত ? না, তোমাকে মেরে ফেলাটা ঠিক নয়—বোল্ডউড যন্ত্রের মত বলল মাথা নীচু করে।

—বরং তুমি নিজেকে মেরে ফেল—

—সেটা বরং ভাল—

—যাক্, তুমি যে বুঝতে পেরেছ তাতেই আমি খুশী।

—ট্রয়! তুমি বাথশেবাকে বিয়ে কর—এছাড়া কোনও বিকল্প নেই—আমি আমার সমস্ত দাবী ছেড়ে দিচ্ছি। বাথশেবা তোমাকেই তার দেহমন দান করেছে—আর কিছু করবার নেই। দুর্ভাগিনী বোকা মেয়ে।

—কিন্তু ফ্যানি ?

—শোন। বাথশেবার অর্থ বিত্ত আছে—বোল্ডউড বলতে লাগল—তাছাড়া সে খুব ভাল গৃহিনী হবে—তুমি তাড়াতাড়িই সেরে ফেল বিয়েটা।

—কিন্তু ওর মেজাজের ঠিক পাওয়া ভার। আমাকে ওর দাস হয়ে থাকতে হবে। বেচারী ফ্যানি রবিনকে বরং আমি যেমন খুশী চালাতে পারব।

—না, ট্রয়! ওকে ছেড়ে যেও না—বোল্ডউড অনুরোধের স্বরে বলল—যত শিগগিরই পার বিয়েটা সেরে ফেল। তোমরা পরস্পরকে ভালবাসো, আর আমিও যথাসম্ভব সাহায্য করব।

—কি করে ?

—ফ্যানির বদলে যাতে তুমি বাথশেবাকে এখনই বিয়ে করতে পার, সেজন্যে তোমাকে আমি পাঁচশো পাউণ্ড দেব। বাথশেবা তো আমার থেকে নেবে না, তোমাকেই দেব আমি বিয়ের দিন হাতে হাতে—

ট্রয় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। বোল্ডউডের ভালবাসা সে ঠিক বুঝতে পারছিল না, খুব হাল্কাভাবে বলল—এখন আর কিছু পাওয়া যাবে না কি ?

—এখন তো আমার কাছে বেশী টাকা নেই—যা আছে সব দিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও—বোল্ডউড যেন ঘুমের ঘোরে তার ব্যাগ হাতড়িয়ে বার করল আরও একুশ পাউণ্ড। দেওয়ার আগে সে বলল—কিন্তু তোমাকে দিয়ে একটা লিখিয়ে নিতে হবে—

—ঠিক আছে। তুমি টাকাটা দাও—চলো বাথশেবার বসার ঘরে গিয়ে তুমি যেমন বলবে আমি লিখে দিচ্ছি। কিন্তু এই টাকা পয়সার কথা সে যেন কিছু না জানতে পারে।

—না, কিছু জানবে না।—বোল্ডউড বলল—এই নাও টাকা, আর চল আমার বাড়ী চল—সেখানে বসে চুক্তিটা লিখে পড়ে বাকী টাকাটা নিয়ে নিও।

—আগে ওর সঙ্গে দেখা করা উচিত।

—কি দরকার ? তুমি রাত্রে আমার বাড়ীতে থেকে, কাল সকালে পাশেই গীর্জাতে গিয়ে সেরে ফেললে হয় না ?

—কিন্তু ওর সঙ্গে তো পরামর্শ করতে হবে—অন্ততঃ জানাতে হবে তো বটে।

—ঠিক আছে, চল।

তারা হাঁটতে হাঁটতে বাথশেবার বাড়ীতে এসে পৌঁছল। দরজার ঠিক বাইরে এসে ট্রয় বলল—এক মিনিট দাঁড়াও। বলে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সে—একটু ফাঁক হয়ে থাকল দরজাটা।

বোল্ডউড অপেক্ষা করতে লাগল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে একটা মৃদু আলো দেখা গেল। বোল্ডউড দেখল ট্রয় একটা শোয়ার ঘরের বাতি নিয়ে এগিয়ে আসছে। দরজার ফাঁক দিয়ে সে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ বাড়িয়ে দিল —তারপর বাতিটা এগিয়ে এনে বলল—দেখ তো পড়া যাচ্ছে ? সে আঙুল দিয়ে একটা লাইন দেখিয়ে দিল। বোল্ডউড পড়ল—

শুভ বিবাহ

'আগামী সতের তারিখে বাথশহরের সেণ্ট এণ্ড্রুজ গীর্জায় শুভবিবাহ—পুরোহিত—রেভাঃ জি মিন্সিং বি, এ; পাত্র—ওয়েদারবেরীর পরলোকগত ডঃ এর্ডওয়ার্ড ট্রয়ের পুত্র সার্জেণ্ট ফ্রান্সিস ট্রয়; পাত্রী—ক্যাষ্টারব্রিজের পরলোকগত মিঃ জন এভার্ডিনের একমাত্র কন্যা বাথশেবা।

—বোল্ডউড! একেই বলে চোবের উপর বাটপাড়ি বুঝলে? বলে ট্রয় কুল কুল করে হেসে উঠল।

বোল্ডউডের হাত থেকে কাগজটা পড়ে গেল। ট্রয় বলতে লাগল—ফ্যানিকে বিয়ে করার জন্যে পঞ্চাশ পাউণ্ড, বেশ! আবার ফ্যানিকে ছেড়ে দিয়ে বাথশেবাকে বিয়ে করার জন্যে একুশ পাউণ্ড, আরও ভাল। আর এখন অলরেডী বাথশেবার বিবাহিত বর। বোল্ডউড! অপরের দাম্পত্য জীবনে কেন নাক গলাতে যাও অ্যাঁ!—শোনো, আমি যতই খারাপ হই, মেয়েছেলের ভালবাসাকে আমি অন্ততঃ কেনাবেচার সামগ্রী মনে করি না, বুঝলে? ফ্যানি অনেকদিন আগেই আমাকে ছেড়ে গেছে—কোথায় আছে সে এখন, কিছুই জানি না। তুমি বলছ বাথশেবাকে তুমি ভালবাস—কিন্তু এ কেমন ভালবাসা যে মুহূর্তের মধ্যে তুমি তাকে অন্য পুরুষের হাতে সঁপে দিতে পার? নাও অনেক শিক্ষা হয়েছে—এবার তোমার টাকা ফেরৎ নাও—

—কক্ষনো না, কিছুতেই না—

—না নাও, না নেবে—বলে ট্রয় ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তার ওপর। বোল্ডউড মুষ্টিবদ্ধ করে ট্রয়ের দিকে উঁচিয়ে বলল—হারামজাদা, শয়তান, শালা, কুকুরের বাচ্চা—আমিও তোকে শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়ব—

আবার হি হি করে হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপর ট্রয় দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেল।

সেদিন বাকী রাতটুকু হয়তো বোল্ডউড ওয়েদারবেরীর টিলায় টিলায় পায়চারী করে বেড়িয়েছিল।

॥ ৩০ ॥

পরের দিন খুব ভোরবেলা। পূবাকাশে তখনও সূর্য্য ওঠে নি। বহু বিচিত্র পাখীর কলকাকলি ভোরের বাতাসে মিশে যাচ্ছিল—আকাশের ঢালা নীলে ইতস্ততঃ মেঘের বাহি—শরৎকাল এসে গেছে। পাঁচটা বাজার আগেই গ্যাব্রিয়েল

আর কোগান বেরিয়ে প:ড়ছিল মাঠের উদ্দেশ্যে। তাদের মনিবের বাড়ীটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। ওকের যেন মনে হল—দোতলার একটা জানালার কপাট খোলা। ওরা দুজনে তখন একটা ঝোপের আড়ালে পড়ে গে:ছ—সেখা:নে দাঁড়িয়ে দুজনে দেখল—জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে দেখছে একটি সুপুরুষ ভদ্রলোক। লোকটি পূবে পশ্চিমে সব দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। এরা তাকে সা:র্জেন্ট ট্রয় বলে চিনতে পারল। কোগান খুব নিস্পন্দ দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল—শ্রীমতী তা'লে এ'কে বিয়ে করলেন।

গ্যাব্রিয়েল আগেই দেখেছিল—সে এখন পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকল—কোনও উত্তর দিল না।

—আমার মনে হয় আজকে কিছু কাহিনী শোনা যাবে—কোগান বলতে লাগল—কাল সন্ধ্যেবেলাই আমি গাড়ীর শব্দ শুনেছি—তুমি বোধহয় কোথাও গিয়েছিলে তখন।

ওকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল কোগান—সে কি? ওক! তোমার মুখ যে সাদা হয়ে গেছে—মড়ার মত দেখাচ্ছে তোমাকে।

—তাই নাকি? ওক ম্লান হেসে বলল।

—এই বেড়াটা ধরে দাঁড়াও একটু এখানে।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

তারা দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ওক মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল চুপচাপ, তার মন তখন সুদূর ভবিষ্যতে চ:লে গেছে। এই অপরিণামদর্শিতা, হঠকারিতার ফলে এক অসীম অনুশোচনা আগামী দিনের অবসরকে কী গভীর বেদনায় জীর্ণ করে দেবে—ওক তাই ভাবছিল। ওদের বিয়ে হয়েছে ঠিকই—কিন্তু ব্যাপারটা এত রহস্যজনক করে তোলার কি ছিল? বাথ:শবার হয়তো বা শহরে পৌঁছুতে খুবই কষ্ট হয়েছিল—তারপরে অসুস্থ ঘোড়াটার জন্যে তাকে আটকে যেতে হয়েছিল সেখানে। তাহ:লে কি বাথশেবা সেখানেই ধরা পড়ে গিয়েছিল। এই অসম বিবাহে ওকের দুঃখ প্রকাশের কোনও ভাষা ছিল না সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। যদিও গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে তার মনে এই রকম একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল—বিশেষতঃ মাঠের প্রান্তে সেই দুজনের একান্ত সাক্ষাৎকার চোখে পড়ার পর থেকে। কিন্তু লিডির সঙ্গে বাথ:শবা ফিরে আসায় তার দুর্ভাবনা কেটে গিয়েছিল। আশার মরীচিকায় যে

[ত]োশাকে সে ঠেকিয়ে রেখেছিল—সেটাই আরও নিষ্ঠুর আঘাত হেনে উপস্থিত [হ]ল তার কাছে।

কিছুক্ষণ পরেই তারা আবার হাঁটতে শুরু করল খামার বাড়ীর দিকে। [জ]ানালা দিয়ে সার্জেন্ট ট্রয় তাদের উদ্দেশ্যে বলল—মর্ণিং কমরেডস। বেশ [খু]শী খুশী তার বলার ধরণ।

কোগান প্রত্যভিবাদন করল, তারপর গ্যাব্রিয়েলকে বলল—তুমি কিছু [ব]ল্‌লে না? লোকটির সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার তো করা উচিত।

গ্যাব্রিয়েলও মনে মনে ভাবল—এখন যেহেতু যা হবার তা হয়ে গেছে, অতএব সর্বকিছু মেনে নিয়ে সহজ আচরণ করাই তার প্রেমিকার প্রতি যথার্থ ভালবাসা। সে খুব ধরা গলায় বলল—গুড মর্ণিং, সার্জেন্ট ট্রয়।

ট্রয় হাসতে হাসতে বলল—এ বাড়ীটা যেন বুড়ো বুড়ো—মনমরা ভাব—

—কেন, বাড়ীটা তো বেশ ভালই, বলল গ্যাব্রিয়েল।

—হুঁ! আমার যেন নিজেকে পুরনো বোতলে নতুন মদের মত মনে হচ্ছে। এই জানালাগুলো সব বদলে দেওয়া দরকার—আর দেয়াল টেয়ালগুলো আরও ঝকঝকে হওয়া উচিত—রঙীন কাগজ দিয়ে মুড়ে দিলে বেশ দেখাবে—

—তাতে বোধহয় ভাল হবে না—

—হ্যাঁ ঐরকমই মনে হয়। পুরনোকে পাল্টাতে গেলেই অস্বস্তি লাগে—কিন্তু নতুন সৃষ্টি পুরনোকে রক্ষা করার থেকে হাজার গুণে ভাল। আমি এখানে একটা আধুনিকতার হাওয়া নিয়ে আসতে চাই—যতক্ষণ থাকব যেন আনন্দে থাকতে পারি।

সৈনিক ভদ্রলোকটি ঘরের ভেতরটা বেশ ঘুরে ঘুরে দেখছিল। হঠাৎ যেন [ক]িছু একটা মনে হওয়ায় জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা কোগান! মিঃ বোল্ডউডের পরিবারের কেউ কি কখনও পাগল হয়েছিল নাকি?

কোগান কিছুক্ষণ চিন্তা করল, তারপর বলল—একবার ওর এক কাকার মাথা খারাপ হয়েছিল শুনেছিলাম—সত্যি মিথ্যে বলতে পারি নে।

—না, এমনি জানতে চাইছিলাম—ট্রয় হাল্কা স্বরে বলল। যাই হোক, এই হপ্তার মধ্যে একবার তোমাদের সঙ্গে আমি মাঠে যাব, কেমন? আগে অন্য অন্য কাজকর্মগুলো সেরে নিই। আমার অত হামবড়া ভাব নেই, আগের মতই মেলামেশা করা যাবে কেমন। তাহলে এস তোমরা।

গ্যাব্রিয়েল আর কোগান এগিয়ে চলল। দূর থেকে একজনকে ঘোড়ায়

চড়ে আসতে দেখা যাচ্ছিল—এখন একেবারে সামনাসামনি এসে পড়ল তারা। ঐ যে মিঃ বোল্ডউড—ওক বলল—ট্রয়ের অমন প্রশ্নের কিন্তু মানে বুঝতে পারলাম না।

কোগান এবং ওক ভদ্রলোককে দেখে সরে দাঁড়াল, কিন্তু কোনও কথাবার্তা হল না বলে চলতে শুরু করল আবার।

সারারাত্রি ধরে বোল্ডউড যে গভীর বেদনা বয়ে বেড়াচ্ছিল তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছিল তার বিবর্ণ মুখে। কপাল আর রগের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে—ঘোড়াটার চলার ভঙ্গিতেও যেন এক চরম হতাশার চিহ্ন। বোল্ডউডকে দেখে গ্যাব্রিয়েল নিজের দুঃখ খানিকটা ভুলে গেল।

॥ ৩১ ॥

আগস্টের শেষে এক রাত্রে—বাথশেবা তখনও সবেমাত্র নববধূ—একটি লোক ওয়েদারবেরীর আপার ফার্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ আর চাঁদ দেখছিল। রাতটা ভাল না, গরম বাতাস বইছে কিছুক্ষণ থেকে। আকাশে মেঘ ঘোরাফেরা করছে ইতস্ততঃ। চাঁদকে কেমন যেন ধাতবপদার্থ বলে মনে হচ্ছে। রঙীন কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখার মত, চতুর্দিক কেমন যেন ঝাপসা। সন্ধ্যে না হতেই ভেড়াগুলো কিসের ভয়ে লেজ গুটিয়ে ঘরে এসে ঢুকেছিল—এমন কি ঘোড়াগুলোরও যেন মনে স্ফূর্তি নেই।

বিরাট এক ঝড় আসছে—তাতে কোনও সন্দেহ নেই। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামবে ভয়ঙ্কর বেগে। ফসল কাটার সময়ে এহেন প্রাকৃতিক রোষ ফার্মারদের কাছে সমূহ বিপদ। ওক খানিকটা সন্দেহ আর অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকল আটটি খোলা আঢাকা বিচুলি গাদার দিকে। সারা বছরের উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক ঐ গাদাগুলোয় সাজানো আছে, বাইরে খোলা আকাশের তলায়। ওক আস্তে খামার বাড়ীর দিকে এগুলো।

এই রাত্রেই সার্জেন্ট ট্রয় আয়োজন করেছে নবান্ন-উৎসবের। সেখানে খাওয়া-দাওয়া নাচগান হবে। ওক যেতে যেতে শুনছিল—বেহালা, টাম্বুরিন ইত্যাদি যন্ত্রের বাদ্য—আর সেই সঙ্গে বহু মিলিত পদক্ষেপের সংযুক্ত আওয়াজ। বিশাল দরজাটা বন্ধ থাকলেও একটুখানি ফাঁক ছিল। ওক ভিতরে উঁকি দিল। ঘরের ভেতরটা সাজানো গুছোনো—মাঝখানটা ফাঁকা। বাথশেবা

ক কোনের দিকে বসে আছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে ট্রয়। যে লোকটি
শী বাজাচ্ছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল—আমি বলি কি, আজকের নাচ হোক—
দি সোলজার'স জয়'। একজন সাহসী সোলজার যেহেতু আমাদের খামারের
লিককে বিয়ে করেছেন—অতএব! কি, অন্যরা সবাই কি বলে—কি গো!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ 'সোলজার'স জয়'—সবাই সমস্বরে বলে উঠল।

সার্জেন্ট ট্রয় তখন 'ধন্যবাদ' বলে বাথশেবার হাত ধরে, হলঘরের মাঝখানে
সে দাঁড়াল। নাচ শুরু হল।

শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গ্যাব্রিয়েলকে অপেক্ষা করতে হল। সে অধৈর্য্য হয়ে
চছিল—কিন্তু উপায় ছিল না আর। অবশেষে নাচ থামলে সে আর দেরী
বল না, ভেতরে ঢুকে পড়ল। বাথশেবাকে কোনরকমে এড়িয়ে যেখানে
র্জেন্ট ট্রয় বসেছিল—সেইদিকে গেল। নাচের পরে অন্যেরা সাইডার এর
াল্কা পানীয় খাচ্ছিল কিন্তু সার্জেন্ট ট্রয় বসেছিল কড়াধাতের ব্রাণ্ডির
াতল নিয়ে।

গ্যাব্রিয়েল তার কাছাকাছি পৌছতে পারল না। তাই খবর পাঠাল একবার
কটু নেমে আসতে। সার্জেন্ট জানাল সে আসতে পারবে না। গ্যাব্রিয়েল
খন বলে পাঠাল—তুমি একটু বলে দিও, আমি দেখা করতে এসেছিলাম, কারণ
ানক ঝড়বৃষ্টি আসছে—খড়ের গাদাগুলো বাঁচানোর জন্যে কিছু করা দরকার।

—সার্জেন্ট ট্রয় বলছেন বৃষ্টি হবে না—বার্তাবাহক এসে জানাল, ওসব গপ্পো-
াছা শুনবার তার সময় নেই এখন।

ট্রয়ের তুলনায় ওকের এমন একটা বিষণ্ণভাব ছিল, ঠিক যেন গ্যাস বাতির
লনায় মোমবাতির আলো। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ফিরে চললো বাড়ীর
িকে। ঐ আনন্দের উৎসবে আর কিছু করার ছিল না। দরজার কাছে
ে এক মিনিট দাঁড়াল ওক—শুনতে পেল, ট্রয় বলছে—বন্ধুগণ! এ শুধু
ানর উৎসবই নয়—এটাকে বিয়ের ভোজও তোমরা মনে করতে পার।
কছুদিন আগে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, তোমাদের মনিব এই ভদ্রমহিলাকে
িয়ের পিঁড়িতে নিয়ে বসিয়েছিলাম কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত সে বাবদে কোনও
ামাজিক অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নি—আজকের এই আনন্দ আর খুশীর উৎসবে
ামি কয়েক বোতল ব্রাণ্ডির অর্ডার দিয়েছি—বন্ধুগণ এস, কিছু হল্লোড় আর
জা করা যাক—আমাদের প্রত্যেক অতিথিকে ব্র্যাণ্ডি গ্রহণ করার জন্যে সাদর
ামন্ত্রণ।

বাথশেবা পেছন থেকে ট্রয়ের হাত টেনে ধরল। খুব ব্যাজার মুখ ক
বলল—এটা কোর না, লক্ষ্মীটি, ফ্রাংক!—এতে খুব খারাপ হবে—অনেক তে
আনন্দ হল।

তাদের মধ্যে দু'একজন বলল—হ্যাঁ অনেক হয়েছে—আর থাক।

—ধুব—মুখ বেঁকিয়ে নিল ট্রয়। হঠাৎ নতুন কিছু ভেবে সে বলল-
বন্ধুগণ, মেয়েদের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়া যাক—তারপর রাতভোর এসো, আম
একটু আমোদ আহ্লাদ করি—আর কোনও ভদ্রলোকের যদি লজ্জা থেকে
থাকে তো তিনি চলে যেতে পারেন।

বাথশেবা অপমানিত বোধ করে বেরিয়ে গেল। তার পেছন পেছন অ
স্ত্রীলোক ও শিশুরা বেরিয়ে গেল। বাজনদারেরা নিজেদের অবাঞ্ছিত মনে ক
চেপে বসল গাড়ীতে। গ্যাব্রিয়েলও বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে। রয়ে গে
শুধু ট্রয় আর ফার্মের অন্যান্য লোকেরা।

গ্যাব্রিয়েল তার বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াতে কি যেন একটা লাগল তা
পায়ে—নরম, অনেকটা বক্সিং দস্তানার মত। একটা বড় কুনো ব্যাং থপথ
করে রাস্তা পার হচ্ছিল। ওক আস্তে করে সরিয়ে দিল তাকে ঘাসের মধ্যে
ওক বুঝতে পারল প্রকৃতি তাঁর ইঙ্গিত পাঠাচ্ছেন এক এক করে। একটু পরে
বিদ্যুৎ চমকে উঠল—আকাশের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো কেউ যেন তুলি দি
রঙের একটা দাগ টেনে দিল। ওক ভাবল ভেড়াগুলোকে একবার দে
দরকার, ওদের দেখলেও কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। দুটো তিনটে জা
পেরিয়ে ওক দৌড়ে গেল ভেড়াগুলোর ঘরের কাছে, উঁকি মেরে দেখল-
ভেড়াগুলো সব একত্র জড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওককে হঠাৎ আসতে দেখে
তারা একটুও নড়াচড়া করল না—যেন কোনও গভীর আতঙ্কে তারা প্রস্
হয়ে আছে আগে থেকেই। এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল তারা, যে প্রত্যেকটার
পেছন অর্থাৎ লেজ, যেদিক থেকে ঝড় উঠবার সম্ভাবনা, সেইদিকে।

ওকের ধারণা আরও দৃঢ় হল। সে বুঝল, তার ধারণাই ঠিক—ট্রয় ভুল
প্রকৃতি ও জীবজগতের বিভিন্ন লক্ষণ থেকে মনে হচ্ছিল—প্রথমে ভয়ঙ্কর ঝ
তারপরে একনাগাড়ে বৃষ্টি হবে। ওক খড়ের গাদাগুলোর দিকে এগুল—বিরা
বিরাট পালাগুলোর চুড়ো যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। পাঁচটা হল গমে
গাদা আর তিনটে যবের। এখনও যদি দানাগুলো বিচুলি থেকে ঝেড়ে ঘ
তোলা যায় তো এক একটা গাদায় অন্ততঃ পক্ষে তিরিশমণ করে গম পাও

যাবে—আর যব কোনটাতেই চল্লিশমণের কম নেই। ওক হিসেব করে দেখল, পাঁচ পাউণ্ড করেও যদি গমের মণ ধরা যায় আর যব মণপ্রতি তিন পাউণ্ড করে—তো কমসে কম সাড়ে সাতশো পাউণ্ড মূল্যের শস্যদানা বাইরে পড়ে আছে। শুধু বাথশেবা কেন, যে কোনও লোকের পক্ষেই এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। আজ রাত্রির ঝড় আর বৃষ্টির পরে, এর অর্দ্ধেক মূল্যও এই অমূল্য সম্পদ বিক্রী করা সম্ভব হবে না—আর, এসবই কেবলমাত্র ঐ অপরিণামদর্শী মহিলার ভুলের মাশুল। ওক ভাবল—নাঃ, চেষ্টা করে দেখি, কতটা কি করা যায়।

এইসব ভেবেচিন্তে ওক খামারবাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল—যদি আর কারও সাহায্য পাওয়া যায়। ঘরের ভেতর একেবারে নিঃস্তব্ধ। ওক ভাবল তাহলে বোধ হয় সবাই যে যার বাড়ী চলে গেছে। তবুও একটা ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল সে ভিতরে। যা দেখল তাতে সে হতমান হয়ে গেল।

ঘরের ভিতরে ক্ষীণ আলো—বাতি অনেকগুলোই নিভে গেছে—মানুষগুলো কেউ শুয়ে, বা হেলান দিয়ে, বা বসে আছে—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই কেউ। কারও মাথা টেবিলের তলায়, কারও বা চেয়ারের হাতলের উপর। ট্রয় একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে—কোগান পড়ে আছে চিৎ হয়ে, মুখ হাঁ করে। অন্য অনেকের মত তারও নাক ডাকছে। জোসেফ পুয়োর গ্রাস সজারুর মত কুঁকড়ে শুয়ে আছে—মার্ক ক্লার্ক, উইলিয়ম স্মলবরী সকলেরই অবস্থা তথৈবচ।

গ্যাব্রিয়েল তাদের দেখে নিরাশ হয়ে ভাবল, আজ রাত্রি বা কাল সকালের মধ্যে যদি খড়ের গাদাগুলো বাঁচাতে হয় তো, কেবলমাত্র তার নিজের সামর্থ্যই ভরসা।

কোগানের কোটের পকেট ঘড়িতে টিং টিং করে দুটো বাজল। ওক ভেতরে ঢুকে ম্যাথু মূনকে ধাক্কা দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করল—সে'ই এইসব গাদা দেওয়ার এবং ছাওয়ার কাজ করত। কিন্তু ধাক্কা দিয়ে কোন লাভ হল না। ওক তার কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল—তোমার ঘরামির কাঠিটা আর যন্ত্রপাতি কোথায়?

অন্য কোনও মিডিয়মের মধ্যে থেকে যেন ম্যাথুমূনের উত্তর ভেসে এল—চালের বাতায় গোঁজা আছে। ওক তারপর সুসান টলের বরকে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করল—গোয়ালঘরের চাবি কোথায়?—কোন উত্তর নেই। এই রাত্তিরে বেশী চেল্লাচেল্লি করে কোনও ফল হবে না—তাই ওক বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে নিভন্ত বাতিগুলো নিভিয়ে দিল সে—যাতে না আবার আগুন ধরে কোনও বিপদ বাধে।

এই সরলপ্রাণ লোকগুলোর প্রকৃতপক্ষে দোষ ছিল না কিছু। ট্রয়ের পীড়াপীড়িতেই তারা মাত্রাতিরিক্ত পান করে ফেলেছিল। তা'ও ব্রাণ্ডির মত কড়া পানীয়—তাদের জীবনে এই প্রথম। এতদিন তাদের গ্রাম্যজীবনে হাল্কা পানীয়তেই তারা অভ্যস্ত—তাই বেসামাল হওয়াটাই ছিল তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

গ্যাব্রিয়েল খুব বিপন্ন বোধ করতে লাগল। কী ভয়ানক অনাচার এসে ঢুকল বাথশেবার ঘরে—বাথশেবাকে সে এখনও সকল সৌন্দর্য্য ও সংগুণের প্রতিমূর্ত্তি বলে মনে করত। একাকী এই নির্জন রাত্রিতে গ্যাব্রিয়েল কিছু ঠিক করতে পারছিল না। হঠাৎ এক ঝলক গরম বাতাস এসে লাগল গায়ে—ওক তাকিয়ে দেখল উত্তর পশ্চিম কোণে বিরাট এক খণ্ড মেঘ দৈত্যের মত এগিয়ে আসছে। কোথাও কিছু ছিল না। হঠাৎ যেন যন্ত্রের সাহায্যে মেঘখানাকে কেউ তুলে দিল আকাশে। তাকে দেখে অন্য ছোট ছোট মেঘগুলো ভয়ে ছুটে পালাল আকাশের দক্ষিণদিকে।

গাঁয়ের মধ্যে এসে, ওক ছোট একটা নুড়ি পাথর ছুঁড়ে মারল লাবান টলের শোয়ার ঘরের জানালায়।—ভাবল, সুসান হয়তো জানালা খুলে দেবে। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সে পিছন দিকে গিয়ে দেখল, দরজায় খিল দেওয়া নেই—হয়তো লাবান আসবে এই ভেবে দেওয়া হয় নি। গ্যাব্রিয়েল দরজা খুলে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল।

—মিসেস টল! আমার একটু গোলাঘরের চাবিগুলো দরকার ছিল—ত্রিপল বার করতে হবে—গ্যাব্রিয়েল ভয় মিশ্রিত স্বরে বলল।

—তুমি এলে নাকি? মিসেস সুসান টল অর্দ্ধচেতনভাবে বলল।

—হ্যাঁ—উত্তর দিল গ্যাব্রিয়েল।

—এসে শুতে পারছ না—ভ্যানতাড়া করার কি মানে হয়? সোমত্ত বৌ জেগে পড়ে আছে সে খেয়াল নেই?

—আমি লাবান না—আমি গ্যাব্রিয়েল ওক। আমার একটু গোলাঘরের চাবিটা দরকার।

—গ্যাব্রিয়েল! কোন হিসেবে তুমি লাবানের মত ভান করলে?

—কই না তো! তুমি বোধ হয় বুঝতে ভুল করেছ—

—নিশ্চই করেছ। কি চাই তোমার এখানে?

—গোলাঘরের চাবিটা।

—ঐ তো নাও না—পেরেকে ঝোলানো আছে। এত রাত্রে এসে মেয়ে-ছেলেকে বিরক্ত করা!

গ্যাব্রিয়েল চাবিটা নিয়ে বাকী কথাটুকু শোনার অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেল। মিনিট দশেক পরে বিরাট বিরাট চারখানা ত্রিপল হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সে একাই নিয়ে চলল খড়ের গাদার দিকে। দুটো গাদা কোনরকমে ঢাকা গেল—এক একটা গাদায় দুটো করে ত্রিপল লাগল। ওক ভাবল যাক—দুশো পাউণ্ড বাঁচানো গেল। তখনও গমের গাদা তিনটে ঢাকা দিতে বাকী। গাদার উপরে উঠে পড়ল সে—একটার পর একটা বিচুলি এমনভাবে সাজাতে লাগল—যাতে জল পড়লে, ভিতরে না ঢুকে, গড়িয়ে পড়ে যায় নীচে।

রাত কত হয়েছিল খেয়াল নেই। যবের তিনটে গাদা তখনও কিছু করা হয় নি। সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত—চাঁদ অস্ত গেল—ঠিক যেন যুদ্ধের আগে রাষ্ট্র-দূতকে ফিরিয়ে দেয়া হল। রাত্রিটা আরও ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগল। চতুর্দিকের নিঃস্তব্ধতার মধ্যে মাঝে মাঝে শুধু বিচুলির খসখস আওয়াজ—গ্যাব্রিয়েলের ছাওয়া চলছে তখনও। অন্ধকারে কেবলমাত্র হাতের স্পর্শ ছাড়া সে ঠাওর পাচ্ছিল না কিছুই। দূরে তাকিয়ে বাথশেবার শোয়ার ঘরে একটা বাতি দেখা গেল। সেই আলোয় মনে হল ঘরের মধ্যে একটি ছায়া নড়াচড়া করছে।

উঁচু জায়গায় বসে, গ্যাব্রিয়েল একটা বিরাট এলাকা দেখতে পাচ্ছিল তার পায়ের নীচে। দূরে একটা পপলার গাছকে মনে হচ্ছিল আকাশের পশ্চাৎপটে একটা কালির আঁচড়ের মত। কড়কড় করে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। আস্তে আস্তে বিদ্যুতের রঙ হয়ে উঠল রুপালী। চার পাঁচবার ঐরকম হওয়ার পর গ্যাব্রিয়েল ভেবে দেখল—এত উপরে বসে থাকা আর নিরাপদ নয়। তখনও বৃষ্টি পড়ে নি এক ফোঁটাও। খড়ের গাদাগুলো ঐভাবে ফেলে রেখে সে নামতেও পারছিল না, আবার দেরী করতেও ভরসা হচ্ছিল না। হঠাৎ একবার পান্নার মত সবুজ আলো ঝলমল করে উঠল—তার সঙ্গে সঙ্গে গগনবিদারী আওয়াজ। নীচের দিকে তাকিয়ে ওকের মনে হল—একটি মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কে হতে পারে? এই গ্রামের মধ্যে এত সাহসী মহিলা একজনই হতে পারে—আরও কিছু ভাবার আগেই চেহারাটা যেন মই বেয়ে একটু উপরে উঠে এল। অন্ধকারে আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। গ্যাব্রিয়েল অন্ধকারের উদ্দেশ্যে বলল—কে। ম্যাডাম নাকি?

কে ওখানে? বাথশেবার গলা শোনা গেল।

—আমি গ্যাব্রিয়েল—ওপরে—ছাওয়ার চেষ্টা করছি—

—ও গ্যাব্রিয়েল, তুমি? হঠাৎ ঘুম ভেঙেই আমার গমের গাদাগুলোর কথা খেয়াল হল—কি করা যাবে এখন!—বাঁচানো যাবে? আমার স্বামীকেও তো দেখছি না—তিনি কি আছেন তোমার ওখানে?

—না এখানে তো নেই।

—কোথায় আছেন বলতে পার?

—ঐ যে হলঘরে ঘুমোচ্ছেন বোধ হয়।

—আমাকে কথা দিল গাদাগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখবে—কিন্তু কিছুই করা হয় নি—আমি কোনও সাহায্য করতে পারি? লিডি ভয়ে বেরোতে চাইছে না। তোমাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—দেখ তো, আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারি।

—হ্যাঁ, তুমি এই আলগা বিচুলিগুলো তুলে দিতে পার—যদি এই মই দিয়ে ওপরে উঠতে ভয় না লাগে। এখন প্রতিটি মুহূর্তই খুব মূল্যবান—এতে অনেকটা সময় বাঁচতে পারে।

—খুব পারব—বলে বাথশেবা নীচ থেকে বিচুলি কাঁধে করে তুলতে লাগল।

গ্যাব্রিয়েল ওপর থেকে ছাইতে ছাইতে নীচের দিকে একবার তাকিয়ে দুটি মানুষের ছায়া দেখতে পেল—পরমুহূর্তেই ছায়া দুটো মিলিয়ে গেল। হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানিতে সে তার এবং বাথশেবারই ছায়া দেখল বলে বুঝতে পারল—তার পরেই বিকট আওয়াজ। এমন স্বর্গীয় দ্যুতি যে এত নারকীয় শব্দের জন্ম দিতে পারে, ভাবা যায় না।

—কী ভয়ঙ্কর!—বাথশেবা কেঁপে উঠে গ্যাব্রিয়েলের জামার হাতা ধরল। গ্যাব্রিয়েল ঘুরে তাকিয়ে হাত ধরল তার—শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করার জন্য। আবার বিদ্যুৎ চমকাল—পপলার গাছটার লম্বা ছায়া পড়ল সারা মাঠ জুড়ে।

বাথশেবা তখনও বিচুলি এনে তুলছিল। তারপর মিনিট পাঁচেক আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। গ্যাব্রিয়েল ভাবল—ঝড়ের ভয়টা বোধ হয় কেটে গেল, কিন্তু তারপরেই এক ভয়ঙ্কর ঝলকানি। বাথশেবার হাতটা ধরে ফেলল গ্যাব্রিয়েল। বলল—দাঁড়াও। দিগ্বিদিক আলোয় আলো হয়ে গেল—পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সর্বত্রই যেন মৃত্যুর নাচন শুরু হয়েছে। তারা দুজন কেবলমাত্র অনুভব করছিল এই বিশাল ভয়ঙ্করের সৌন্দর্য। আলোর ছটায়

গ্যাব্রিয়েলের চোখে আঁধার দিচ্ছিল—সে খালি অনুভব করছিল তার হাতের মধ্যে বাথশেবার উষ্ণ কোমল হাতের মৃদু কম্পন। ঐ এক অদ্ভুত অনুভূতি—প্রেম, মৃত্যু, ভালবাসা, জীবন, যৌবন সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায় এমন রুদ্ররোষের সম্মুখীন হলে।

এত কথা চিন্তা করবার আগেই আবার বাজ পড়ল এক গাছের মাথায়—মুহূর্তে যেন লম্বা গাছটার মাজা থেকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলল কেউ—তার পরেই আবার সব নিঃস্তব্ধ।

—আমরা খুব বেঁচে গেছি—গ্যাব্রিয়েল বলল—তুমি বরং নীচে চলে যাও।

বাথশেবা কিছু বলল না—শুধু তার শরীরের ওঠানামা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সে আস্তে আস্তে নেমে গেল, গ্যাব্রিয়েলও নীচে চলে এল। অন্ধকার এখন নিশ্ছিদ্র। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে—বাথশেবা ভাবছিল ভয়ঙ্কর প্রকৃতির কথা আর ওক শুধুমাত্র বাথশেবার কথাই ভাবছিল।

কিছুক্ষণ পরে ওকই প্রথম কথা বলল—ঝড় বোধহয় কেটে গেল মনে হচ্ছে, —বৃষ্টিও তো হ'ল না এক ফোঁটা।—যাক, আমাদের ভালই হ'ল—ঈশ্বর আমাদের বাঁচিয়েছেন। আমি দেখি বাকীটুকু সেরে ফেলি।

—গ্যাব্রিয়েল, তুমি আমার জন্য অনেক করেছ—বাথশেবা বলল—কিন্তু অন্যেরা কেউ আসে নি কেন?

—তাদের আসার মত অবস্থা নেই—গ্যাব্রিয়েল ইতস্ততঃ করে বলল।

—ও বুঝেছি। তার মানে সব বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে—আর আমার স্বামীও আছেন তাদের মধ্যে। তাই না?

—না দেখে ঠিক বলা যাচ্ছে না। আচ্ছা আমি দেখছি—বলে গ্যাব্রিয়েল বাথশেবাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এগিয়ে গেল।

হলঘরের কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল—সব অন্ধকার। আগের মতই সকলের গরগর করে নাক ডাকছে। হঠাৎ তার মুখের উপরে দখিনা বাতাসের মত স্পর্শ পেয়ে তাকিয়ে দেখল—বাথশেবাও তার পেছন পেছন এসেছে এবং উঁকি দিয়ে দেখছে ভেতরে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যে গ্যাব্রিয়েল বলল—আমরা বরং ফিরে যাই—দেখা যাক আর একটুখানি ছেয়ে ফেলতে পারলে কিছুটা রক্ষে হবে।

তারা দুজনেই ফিরে গেল এবং আবার ছাওয়ার কাজ চলতে লাগল। ফিরে আসার পর থেকে ওক একটাও কথা বলে নি। বাথশেবা হঠাৎ কথা বলল—

গ্যাব্রিয়েল! তুমি বোধহয় ভেবেছ যে সেদিন রাত্রে আমি 'বাথ' শহরে গিয়েছিলাম বিয়ে করবার উদ্দেশ্য নিয়েই?

গ্যাব্রিয়েল হঠাৎ এই প্রসঙ্গের অবতারণায় কিছুটা বিস্মিত হয়ে উত্তর দিল —প্রথমে তা না ভাবলেও, পরে ভেবেছিলাম।

—অন্যেরাও তাই ভেবেছে নিশ্চয়ই—

—হুঁ।

—আমাকে অনেক দোষ দিয়েছ মনে মনে—

—এ্যাঁ—কিছুটা—

—তা আমি জানতাম। অবশ্যি তোমার মতামতে কিছুই আসে যায় না —তথাপি আমি ফিরে আসার পর থেকেই তোমাকে আসল ব্যাপারটা বলব বলে সুযোগ খুঁজছি—কিন্তু তুমি এমন গম্ভীরভাবে তাকাও আমার দিকে— তাছাড়া আমি যদি কাল মরে যাই—তো একটা ভুল ধারণা থেকে যাবে তোমার মনে—তাই শোন—

গ্যাব্রিয়েল হাতের কাজ বন্ধ করে দিল। আমি সেদিন রাত্রে 'বাথ' শহরে গিয়েছিলাম মিঃ ট্রয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে আসব বলে। কিন্তু ওখানে যাওয়ার পরে—এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল যে বিয়ে ছাড়া আর উপায় ছিল না। অপরিচিত শহরে আমি সম্পূর্ণ একা। তাতে ঘোড়াটাও খোঁড়াচ্ছিল—আমি বুঝতে পারছিলাম না কি করি—তারপরে ভাবলাম একা একা এভাবে দেখা করতে এসেছি বলে হয়তো সমাজে নিন্দে হবে—চলে আসব বলে ঠিক করলাম —এমন সময় ও একদিন এসে বলল—আমার থেকেও সুন্দরী একটা মেয়েকে দেখেছে—আমি ভাবলাম আমি চলে গেলে হয়তো তাকেই বিয়ে করে বসবে— বাথশেবা একটু গলা পরিষ্কার করে নিল—তাই নিরুপায় হয়ে বিয়ে করতে হল আমাকে।

গ্যাব্রিয়েল কোন উত্তর দিল না।—ওর কোনও দোষ ছিল না—কারণ সে তো আরও সুন্দরী কাউকে দেখতেই পারে—বাথশেবা বলতে লাগল—সে যাই হোক, তোমার অজানা ঘটনাগুলো জানিয়ে দিলাম—তোমার কোনও মন্তব্য অবশ্যই আমি শুনতে চাই না।—নাও—আর বিচুলি লাগবে?

বাথশেবা মই বেয়ে নীচে নেমে গেল, আরও বিচুলি নিয়ে এল। কিছুক্ষণ পরে গ্যাব্রিয়েলের কেমন যেন মমতা বোধ হল। সে বলল—তুমি খুবই ক্লান্ত— এখন বরং বাড়ী যাও, বাকীটুকু আমি শেষ করে ফেলব। বাতাস ঘুরে গেছে—

বৃষ্টিও মনে হয় হবে না।

—আমাকে প্রয়োজন না থাকলে চলে যেতে পারি—বাথশেবা থেমে থেমে বলল—কিন্তু তোমার যদি কিছু হয়?

—না, প্রয়োজন নেই তা তো বলছি না—তবে তুমি অনেক খেটেছ, তুমি ক্লান্ত—

—আর তুমি।—বাথশেবা কৃতজ্ঞতার সুরে বলল—গ্যাব্রিয়েল। তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব—তুমি যে আমার জন্যে অনেক করেছ।

বাথশেবা আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। একটু পরে দরজাটা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। গ্যাব্রিয়েল যেন একটা দিবাস্বপ্নের মধ্যে কাজ করছিল—আর মনে মনে এতক্ষণ যা শুনল সেই চিন্তা করছিল। বাথশেবা অবিবাহিত অবস্থায় কোন দিনও তার সঙ্গে এত অন্তরঙ্গভাবে কথা বলে নি—নারীচিত্তের এ এক দুর্বোধ্য রহস্য।

হঠাৎ এক শব্দে তার তন্ময়তা ভেঙে গেল। জোর বাতাস উঠেছে। চালের খড় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রায়। জোর বৃষ্টি আসছে—আর কোনও সন্দেহ নেই।

উল্টোপাল্টা বাতাসের মধ্যে বড় বড় ফোঁটায় নেমে এল বরষার ধারা। তখনও রাত শেষ হয়নি। ধূসর রংয়ের সকাল যেন খুব ধীরে ধীরে আসছে। ওকের হাতের বিরাম ছিল না। জোর এক ঝাপটা বৃষ্টি এসে লাগল তার মুখে—পিঠ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল টপটপ করে জলের ফোঁটা—কিন্তু কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার অন্য কিছুই মনে হচ্ছিল না। ওকের হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ থেকে ঠিক আটমাস আগে, এইরকমই এক ভোরের বেলা, এই জায়গাতেই মরিয়া হয়ে সে লড়েছিল আগুনের বিরুদ্ধে। আজকের এই অসমযুদ্ধ জলের বিরুদ্ধে। আর এ সবেরই উপলক্ষ্য এক নারীর প্রতি তার নিষ্ফল ভালবাসা।

সকাল সাতটা বেজে গেল—তবু আকাশের ঘোর যেন কাটে না। মেঘে মেঘে কালো হয়ে আছে। দূর দূরান্ত থেকে যেন কিসের নিমন্ত্রণে আরও আরও মেঘ ছুটে আসছে এই ছোট আকাশ ঘিরে। অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গ্যাব্রিয়েল শেষ গাদাটার মাথা থেকে নেমে এল—যাক্, বাঁচানো গেছে। জামা-কাপড় তার ভিজে চপচপ করছে। ক্লান্ত এবং কেমন যেন বিষণ্ণ—তবে বিষাদের থেকে ক্লান্তিই বেশী।

দূরে হলঘরের দিক থেকে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। গ্যাব্রিয়েল তাকিয়ে দেখল—একজন, দুজন করে মানুষকে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে। তারা যেন লজ্জায়

অধোবদন হয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে। কেবলমাত্র একজনকে দেখা গেল অন্যরকম।—সে-ই সবার আগে, গায়ে একটা লাল রংয়ের জ্যাকেট, হাত দুটো পকেটে ঢোকান। শিস দিতে দিতে যাচ্ছে। অন্যেরা যেন তার বন্দী—অপরাধীর মত তাদের চলার ভঙ্গি। ট্রয় ছাড়া আর সকলেই গ্রামের রাস্তা ধরল—কিন্তু তাদের কেউই, একবারও, বিচুলির গাদাগুলোর দিকে তাকিয়েও দেখল না।

একটু পরে ওকও বাড়ীর দিকে এগুল—অন্য পথ দিয়ে। কিছুটা যাওয়ার পরে দেখল, আরও একজন ভদ্রলোক তার সামনে সামনে চলেছে। ছাতি মাথায়—তার থেকেও আস্তে আস্তে হাঁটছে। ভদ্রলোক ফিরে তাকাল—সে মিঃ বোল্ডউড।

গ্যাব্রিয়েল বলল—কেমন আছেন?

—আমি! আমি মন্দ কি—বেশ ভালই তো আছি। বোল্ডউড যেন কিছুক্ষণ পরে আশপাশে তাকিয়ে তবে পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হল। উদ্বিগ্ন-ভাবে বলল—কিন্তু তোমাকে কেমন যেন পরিশ্রান্ত আর অসুস্থ মনে হচ্ছে, ওক।

—হুঁ, আমি একটু ক্লান্ত। আপনার কিন্তু শরীর খারাপ হয়ে গেছে।

—আমার? একটুও না—আমি খুউব ভাল আছি—কিন্তু তোমার এরকম মনে হওয়ার কারণ?

—না, মানে আপনাকে আগের মত আর ফিটফাট দেখায় না।

—ও তোমার বোঝার ভুল, আমার ওতে কিছুই হয় না—আমি লোহার মত শক্ত।

—আমার আজ খুব খাটুনি গেছে—কোনরকমে গম আর যবের গাদাগুলো বাঁচাতে পেরেছি। জীবনে কখনও এত কষ্ট হয় নি। আপনার ফসলপাতি বোধ হয় গোছগাছ করে তোলা হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—বোল্ডউড উত্তর দিল—তারপর কি একটু ভেবে বলল—কি বললে ওক?

—বলছি, আপনার গমের গাদাগুলো বেশ ঢাকা ঢোকা আছে তো?

—না।

—বেশ উঁচু জায়গায় রেখেছেন তো?

—না তো।

—অন্ততঃ তলায় পাথর টাথর দিয়ে উঁচু—

—কই না।

—আর ছাউনির ব্যবস্থা ?

—কিছুই করা হয় নি—আসলে ওদিকে এবার লক্ষ্যই দিতে পারি নি আমি।

—তাহলে তো আপনার খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে। ঐ গাদা থেকে দশভাগের একভাগ গমও পাবেন না।

—হয়তো পাব না।

—লক্ষ্যাই দিতে পারেন নি—গ্যাব্রিয়েল নিজের মনে আস্তে আস্তে বলল। এই মুহূর্তে এই কয়েকটি কথা তার মনে যে গভীর নাটকীয় প্রভাব ফেলেছিল তা ভাষার অতীত। সারারাত ধরে কাজ করতে করতে সে ভাবছিল বাথশেবার ফার্মেই বুঝি অবহেলার চূড়ান্ত—এতদঞ্চলে এমনটি আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু একই গ্রামের মধ্যে আরও বড় যে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে. সে সম্পর্কে অভিযোগ করার কেউ নেই, আক্ষেপ করারও কেউ নেই। গত কয়েক মাস ধরে বোল্ডউড-এর এই বেহিসেবী আচরণ, ঠিক যেন জাহাজে বসে কোন নাবিকের জাহাজের কথা ভুলে থাকার মত। ওক মনে মনে ভাবছিল, বাথশেবার বিয়েতে তার নিজের যতই ক্ষতি হয়ে থাকুক, তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে এই লোকটির।

—ওক! তুমি তো জানই, কিছুদিন যাবং আমার আর কিছুই ভাল লাগে না—আমি নিজেই অবশ্য দায়ী সেজন্যে। জীবনে সব কিছু বেশ গুছিয়ে নিয়ে আসছিলাম কিন্তু হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেল—বোল্ডউড বলল।

—আমি ভেবেছিলাম উনি হয়তো আপনাকেই বিয়ে করবেন—গ্যাব্রিয়েল সরল প্রাণে বলে ফেলল। বোল্ডউড নিজে যে এই প্রসঙ্গ তুলতে চায় না, অত গভীর চিন্তা সে করল না। তবে কি জানেন—এরকমই হয় মাঝে মাঝে, আমরা যা চাই তা পাই না—গ্যাব্রিয়েল এমনভাবে কথাগুলি বলল যেন দুর্ভাগ্য তাকে হতাশ না করে বরং উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে।

—আমার সম্পর্কে গ্রামে সকলেই নিশ্চয়ই টিটকারি দেয়?—বোল্ডউড যেন কথাগুলো আর চেপে রাখতে পারছিল না। এক চরম অনাসক্তি-মিশ্রিত হাল্কাস্বরে সে প্রশ্নটা করল।

—না, তেমন তো শুনি নি।

—অনেকে হয়তো ভাবে, যে—উনি কথার খেলাপ করেছেন, কিন্তু প্রকৃত সত্যটি তা নয়। আমার সঙ্গে মিস্ এভার্ডিনের কখনই কোনও এনগেজমেণ্ট

ছিল না। লোকে সে কথা বললেও, তা সত্যি নয়—উনি আমাকে কখনই কথা দেননি—বোল্ডউড ওকের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বলতে লাগল—ও গ্যাব্রিয়েল, আমি নিতান্তই বোকা আর দুর্বল। আমি জানি না, কি করে এ দুঃখ ভুলে থাকব। এতকাল ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার বিশ্বাস ছিল। ভেবেছিলাম তিনিই বোধ হয় আমার একটি আশ্রয় এর ব্যবস্থা করে দিলেন—মনে মনে অনেক ধন্যবাদ দিয়েছি তাঁকে। কিন্তু তিনিই আবার ছিনিয়ে নিলেন। ভগবানের দয়াতেও আর বিশ্বাস নেই আমার—এখন আমার মৃত্যুই ভাল।

বেশ কিছুক্ষণ নিঃস্তব্ধতার পর বোল্ডউড যেন হঠাৎ জেগে উঠল—এবং স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে আবার হাঁটতে শুরু করল। যেন সে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে এমনভাবে বলল—না, গ্যাব্রিয়েল। লোকে যতটা প্রচার করেছে—আমাদের মধ্যে ততখানি কিছু কোনদিনই ছিল না। আমার কখনও কখনও কষ্ট হয় বটে কিন্তু কোন নারীই আমাকে খুব বেশীদিন মুগ্ধ করে রাখতে পারে নি। যাক গে, চলি—আশা করি তুমি আজকের এই কথাবার্তা আর কারও কাছে প্রকাশ করবে না—বোল্ডউডের কথাগুলো যেন মড়ার খুলির হাসির মত নিষ্প্রাণ শোনাচ্ছিল।

॥ ৩২ ॥

ওয়েদারবেরী থেকে ক্যাষ্টারব্রিজ যাওয়ার পথে, ক্যাষ্টারব্রিজের মাইলখানেক আগে পড়ে ইয়ালবেরী হিল। ওয়েসেক্স জেলার দক্ষিণাংশের উঁচু নীচু মালভূমির এই একটা প্রশস্ত উঁচু জায়গা। ক্যাষ্টারব্রিজের হাটে যাওয়া আসার পথে, এখানে ফার্মার বা ভদ্রলোকেদের গাড়ী থেকে নেমে পড়তে হয়—নেমে খালি গাড়ীকে হাঁটিয়ে নিয়ে উঠতে হয়।

অক্টোবর মাসের এক শনিবারের সন্ধ্যেবেলা বাথশেবার গাড়ীকে এইরকম উঠতে দেখা যাচ্ছিল। বাথশেবা নিজে গাড়ীর উপরে বসে—আর নীচে হেঁটে হেঁটে উঠছিল লম্বা, শক্ত সমর্থ, চোস্ত পোষাকপরা এক তরুণ ফার্মার। পায়ে হেঁটে চললেও তারই হাতে ঘোড়ার লাগাম এবং চাবুক—মাঝে মাঝে যেন মজা করার জন্যে সে ঘোড়ার কানে ঠোনা দিচ্ছিল। এই-ই বাথশেবার স্বামী, প্রাক্তন সৈনিক সার্জেন্ট ট্রয়, যে এখন নিজেকে এক আধুনিক এবং ব্যক্তিত্ব

সম্পন্ন ফার্মাব করে গড়ে তুলেছে। অপবিবর্তনশীল চিন্তাধারার লোকে অবশ্যি এখনও দেখা হলে তাকে 'সার্জেণ্ট' বলেই ডাকে—তাব কিছুটা কারণ যদিও তার সৈনিক জীবনেব পুরুষ্টু গোঁফজোড়া, যেটাকে সে ত্যাগ কবতে পারেনি আর ত্যাগ করতে পাবে নি তাব কিছু কিছু প্রাক্তন চালচলন।

—সেদিনকাব ভয়ানক বৃষ্টিটা না হ'লে আমার অন্ততঃ দুশো পাউণ্ড জিৎ হতো আজ। কিন্তু কি কবব ডালিং—সবদিন তো সমান যায় না—ট্রয় বলছিল।

—আবহাওয়া তো এখন পবিবর্তনেবই সময়, বাথশেবা উত্তব দিল।

—হ্যাঁ ঠিকই। কিন্তু এই শরৎকালে ঘোড দৌড়ের খেলা বড অনিশ্চিত।

—কিন্তু ফ্র্যাংক।—বাথশেবা খুব দুঃখিতভাবে বলতে লাগল—তার কণ্ঠে আগের সেই উচ্ছ্বাস আব নেই—এই ক'দিনে তুমি একশো পাউণ্ডেরও বেশী হেরেছ। এভাবে পয়সা নষ্ট করার আমি কোনও অর্থ খুঁজে পাইনে। এবকম চলতে থাকলে আমাদেব ফার্মও একদিন বন্ধ হয়ে যাবে। এ চবম নির্বুদ্ধিতা।

—বেখে দাও তো নির্বুদ্ধিতা। তোমার কাজ তুমি কব—আমাবটা আমি বুঝব।

—কিন্তু তুমি কথা দাও, বাডমাউথে আব রেস খেলতে যাবে না—বাথশেবা কাঁদ কাঁদ হযে বলল।

—কেন যাব না, তা তো বুঝতে পাবছিনা—আমাব তো খুব ভাল লাগে তাই তোমাকেও নিয়ে যাব ভাবছি।

—কক্ষোনো না, মোটেই ভাল না—আমি মবে গেলেও ওদিকে যাব না।

—অবশ্যি যাওযা না যাওয়াব সঙ্গে হাবজিতেব কোনও সম্পর্ক নেই। হাবি বা জিতি সামনেব সোমবাব আমরা এম্নিই যেতে পাবি।

—তুমি কি এই খেলাতেও,—তাব মানে, বাজী ধবেছ? বাথশেবা উদ্বেগের সঙ্গে বলল।

—বোকাব মত করো না তো—আগে আমাকে বলতে দাও। আমি বুঝি না—বাথশেবা, তুমি আগেকার সেই সহজ আনন্দ কেন হারিয়ে ফেলছ? আগে যদি জানতাম যে তুমি এত ভীতু আর খুৎখুঁতে—তাহলে আমি কক্ষনো—কি আব বলব।

বাথশেবা এই উত্তর শুনে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। অবজ্ঞায় তার কালো চোখে যেন আগুনের ফুলকি ঠিকরে বেরুচ্ছিল। দুজনের কেউ আর কোনও কথাবার্তা বলল না।—শুধু শুকনো পাতার খসখস আওয়াজ

পাচ্ছিল মাঝে মাঝে।

টিলাটার মাথায় একটা নারীমূর্তি দেখা গেল। রাস্তাটা এখানে মোড় ঘুরে উঠেছে, তাই সামনাসামনি আসার আগে সে চোখে পড়ে নি। ট্রয় পাশ দিয়ে সরে দাঁড়াল—মেয়েলোকটি আস্তে আস্তে পিছনে পড়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার এবং গাছপালার আবছা ছায়া সত্বেও বাথশেবা পরিষ্কার বুঝতে পারছিল যে মেয়েটি অত্যন্ত দুঃস্থ এবং তার পোষাক পরিচ্ছদ জরাজীর্ণ।

—দয়া করে বলতে পারেন, ক্যাষ্টারব্রিজের লঙ্গরখানা বাত্রি কটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে?—মেয়েলোকটি ট্রয়কে উদ্দেশ্য করে বলল।

ট্রয় কথাকটা শুনে যেন চমকে উঠল—কিন্তু মুহূর্তে সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে—আস্তে আস্তে উত্তর দিল—বলতে পারবনা। মেয়েলোকটি উত্তর শুনে ভাল করে তার মুখের দিকে তাকাল—এবং ফার্মারের পোষাকের অন্তরালে তার সোলজারকে চিনতে পারল। মুখে যেন তার খুশী ভাব এবং দুশ্চিন্তা উভয়ই প্রকাশ পাচ্ছিল। বিকট এক চীৎকার করে মেয়েটি পড়ে গেল মাটিতে।

—আহা হা, বলে বাথশেবা তখুনি গাড়ী থেকে নামতে যাচ্ছিল।

—না, না, তুমি নেমো না—লাগামটা ধর—বলে ট্রয় লাগামটা আর চাবুকটা ছুঁড়ে দিল বাথশেবার হাতে—ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাও ওপরে—আমি এদিকে দেখছি।

বাথশেবা এগিয়ে গেল, ট্রয় মেয়েটিকে হাত ধরে তুলল, খুব কোমল অথচ দ্রুত স্বরে বলল—তুমি এখানে কোত্থেকে হাজির হলে? আমি ভেবেছি তুমি কোথাও চলে গেছ নয়তো মরে গেছ—আমাকে কেন চিঠি লেখ নি?

—আমিও সেই ভয় পেয়েছিলাম।

—তোমার কাছে টাকা পয়সা আছে?

—কিছু নেই।

—হা ভগবান! আমার যদি কিছু থাকত তোমাকে দেওয়ার মত! এই নাও যে কয় পয়সা আছে আমার—জানো তো, আমার স্ত্রী আমাকে যা দেয়, এ ছাড়া নিজের তো কোনও রোজগার নেই।

মেয়েলোকটি কোন উত্তর দিল না। শোনো, আর সময় নেই—ট্রয় বলল—কোথায় যাচ্ছ আজ রাত্রে? ক্যাষ্টার ব্রিজের লঙ্গরখানায়?

—হ্যাঁ, সেইরকমই ভেবেছি।

—ওখানে তোমাকে যেতে হবে না।—আচ্ছা দাঁড়াও, আজ রাত্রের মত

ওখানে থাকো—আর তো কোনও উপায় দেখছি না। কালকের দিনটাও থাকো। সোমবারের আগে আমার সময় নেই—সোমবার সকালে ঠিক দশটার সময় শহরের বাইরে ঠিক পুলটার মাথায় আমার সঙ্গে দেখা কোর।—দেখি, যতটা পারি, পয়সাকড়ি যোগাড় করে দেব। তোমাকে যাতে অভাবে পড়তে না হয়—আমি দেখব ফ্যানি!—তোমার একটা বাসার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন তাহলে চলি—আমি একটা পাষণ্ড কিন্তু কি আব করব। বাথশেবা পাহাড়টার মাথায় উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল। মেয়েটি তখন উঠে দাঁড়িয়েছে এবং ট্রয়ের থেকে বিদায় নিয়ে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। ট্রয় ফিরে এসে গাড়ীতে উঠল—লাগামটা নিল তাব হাতে—তারপর কোন কথা না বলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল তুলকি চালে। ট্রয়কে যেন উত্তেজিত মনে হচ্ছিল।

—মেয়েটিকে চেন নাকি?—বাথশেবা সন্দেহের চোখে তাকাল ট্রয়ের মুখেব দিকে।

—হ্যাঁ চিনি—বলে ট্রয় নির্ভীকভাবে তাকাল বাথশেবার দিকে।

—সেইবকমই মনে হচ্ছিল—বাথশেবা বাঁকাভাবে বলল—মেয়েটি কে?

ট্রয়েব হঠাৎ মনে হল, সত্যিকথা বললে মেয়েলোক দুটির কারোরই কোন উপকার হবে না। সে বলল—আমাদের কেউ নয়। মুখ চিনি।

—নাম কি?

—কি করে জানব?

—তুমি জান, মনে হচ্ছে।

—মনে হচ্ছে তো হোক—ঘোড়ার পিঠে সপাং করে চাবুক মেরে কথাটি হঠাৎ শেষ করে দেয়া হল। ঘোড়াটা লাফ মেরে জোরে দৌড়তে শুরু করল। এব পরে দু জনে আর কোনও কথাবার্তা হল না।

॥ ৩৩ ॥

মেয়েটি একা একা হেঁটে এল অনেকক্ষণ। আর যেন পা উঠছে না—আক্রহীন পথের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও তার কষ্ট হচ্ছে। রাত্রির আবছায়ায় অস্পষ্ট হয়ে আসছে চারদিক। অবশেষে তার অগ্রগতি কোনরকম নড়াচড়ায় পর্য্যবসিত হল। তারপর বাড়ীর পাশেই একটা গেট খুলে ঢুকে পড়ল সে—সামনেই একটা বিচুলি-গাদা। মেয়েটি বসে পড়ল তার নীচে—একটু

পরেই ঘুমিয়ে পড়ল সেখানে।

ঘুম ভেঙে উঠল সে যখন, নিশীথ রাত্রির আকাশে তখন চাঁদ নেই, একটি তারাও নেই—থমথমে অন্ধকার। বিশাল একখানা অভগ্ন মেঘ গগন জুড়ে বিস্তৃত—এক চিলতে আকাশও দেখা যাচ্ছে না। প্রকাণ্ড এই কৃষ্ণবর্ণের নিচে, অনেক দূরে, ক্যাস্টারব্রিজ শহরের আলোর দীপ্তি আঁধারের প্রেক্ষাপটে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—সেই নরম, ক্ষীণ আলোর দিকে চোখ মেলে তাকাল মেয়েটি।

—শুধু ঐ পর্যন্ত পৌছুতে পারলেই হবে—মনে মনে বলল মেয়েটি—কাল বাদে পরশু দেখা হবে তার সাথে—হে ভগবান, শক্তি দাও—হয়তো বা তার আগেই মাটির তলায় যেতে হবে আমায়।

দূরে, অন্ধকারে, কোথায় যেন খামারবাড়ীতে, ঘণ্টা বাজল—একটা—খুব মৃদু দুর্বল আওয়াজ। মধ্যরাত্রির পরে ঘণ্টাধ্বনি যেন লম্বা-চওড়ায় খাটো হয়ে যায়—তীক্ষ্ণতা ক্ষীণ প্রতিধ্বনিতে পরিণত হয়।

একটু পরে—প্রথমে একটা, তারপর দুটো আলোর বিন্দু দেখা গেল। আস্তে আস্তে বড় আকার পেল আলো দুটো। রাস্তা বেয়ে একটা গাড়ী এগিয়ে গেল। হয়তো কেউ রাত করে বাড়ী ফিরছে। আলোর রেখা এসে পড়ল মেয়েটির মুখে—মুখখানা এমনিতে কচি হলেও, বৃদ্ধার মত দেখাচ্ছে। সাধারণ গড়নটা অল্পবয়সী মেয়ের মত। কিন্তু ধরণধারণ চোখাচোখা এবং দুর্বল।

আপাততঃ স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল—তাকাল চারদিকে রাস্তা যেন তার চেনা। খুব সাবধানে, সামাল করে হাঁটতে লাগল সে আস্তে আস্তে। একটু পরে আবছা সাদা কি একটা দেখা গেল। আর একখানা মাইল ষ্টোন। হাত বুলিয়ে দেখল সে ভাল করে—আর দু মাইল—বলল মনে মনে।

একটুখানি জিরিয়ে নেওয়ার জন্যে, মাইল ষ্টোনটার গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল সে, তারপর যেন চমকে উঠে চলতে শুরু করল আবার। কিছুক্ষণ বেশ জোর কদমে, সাহস করে হাঁটল—তারপর সেই আগের মত হয়ে গেল। রাস্তার পাশেই লতাপাতার জঙ্গল—দিনের বেলা হয়তো কেউ এখানে কাঠকুটো কেটেছে—তারই দু একখানা সাদা সাদা টুকরো ছিটকে পড়ে আছে এদিক ওদিক কোথাও কোনো শব্দ নেই—একটু বাতাস নেই—এমন কি তাকে সঙ্গ দেওয়ার মত দু একটা কচি-পল্লবের নড়াচড়াও নেই কোথাও।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে এই পথিক দাঁড়িয়ে পড়ল নিঃশব্দে—যার অর্থ যাত্রার

শেষ নয়, শুধুমাত্র আগেকার গতির বিরতি। তার ভঙ্গিটা ঠিক একজন শ্রোতার মত—বাহ্য জাগতিক ধ্বনি অথবা নিজ অন্তরের চিন্তা শোনাব জন্যেও হতে পারে, ভাল করে বিচার করলে বোঝা যায় দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই বেশী ঠিক। একটু পবেই বোঝা গেল, সে খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা খুঁজছে।

ক্যাষ্টারব্রিজেব ম্লান আলোব সাহায্যে আব নিজেব হাত দিয়ে পবখ করে কবে, সে স্তূপীকৃত কাঠেব মধ্যে থেকে দুটি কাঠ বেছে নিল—কাঠ দুটোই প্রায় তিন চাব ফুট লম্বা, আব মাথার দিকটা y-এর মত বাঁকানো। বসে পড়ে মেয়েটি ডাল দুটোব থেকে পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলল, তারপব নেমে পড়ল বাস্তায়। ক্রাচের মত ভর দিয়ে দেখে নিল একবার। ধীবে ধীবে দেহের সমস্ত ভাবটাই সে চাপিয়ে দিল কাঠ-দুটোব ওপব। ছোট্ট একটুখানি তার শবীব। তাবপর দুলে দুলে এগিয়ে চলল, এতক্ষণে যথার্থ নির্ভর করাব মত কিছু খুঁজে পেল সে।

ক্রাচদুটো কাজে দিল বেশ, রাস্তাব বুকে কাঠদুটোব শব্দ আর মৃদুভাবে তার পা ঠেকানো ছাড়া কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। আগের মাইল-ষ্টোনটা সে পেরিয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। নিতান্ত আগ্রহ ভরে তাকিয়ে আছে সামনেব দিকে, যেন আর একটা মাইলষ্টোনও এসে পডবে এক্ষুণি। ক্রাচদুটো যতই উপকারে লাগুক না কেন, তাবও সাধ্যের একটা সীমা আছে। যন্ত্র পরিশ্রমকে লাঘব কবে মাত্র কিন্তু ক্লান্তি মুছে দিতে পারে না। মেয়েটি তখন এতই শ্রান্ত, যে দোল খেয়ে এগুনোর গতিও কমে গেল তার, অবশেষে একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে থাকল মেয়েটি খানিকক্ষণ। ভোরেব হাওয়া বইতে শুরু করেছে মৃদুমন্দ। বাড়ীর চালের ওপর দিয়ে গতকালের ঝরা পাতাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটু আধটু। মরিয়া হয়ে মেয়েটি হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, পা বাড়াল একবার, তারপর আরেকবার, তৃতীয়বার আবার, ক্রাচটা এখন খঞ্জের যষ্টিব মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবেই এগুল সে আরও খানিকটা পথ। আরেকটা মাইলষ্টোন দেখা গেল, তারপরেই লোহার রেলিং দেওয়া একটা প্রাচীর। প্রথম খুঁটিটাকেই কোন রকমে জড়িয়ে ধরে সে চতুর্দিকে দেখল।

ক্যাষ্টারব্রিজের আলোগুলোকে এখন একটা একটা করে আলাদা দেখা যাচ্ছে। সকাল হয়ে এসেছে প্রায়। এখুনি গাড়ী ঘোড়ার দেখা না মিললেও হয়তো আশা করা যেতে পারে। কান পেতে শুনতে লাগল সে, জীবনের সাড়া কোথাও নেই শুধু বিকট নানারকম ধ্বনির সম্মিলিত একটা ঐকতান ভেসে

আসছে। একটা শেয়াল ডেকে উঠল—এক এক মিনিটের ব্যবধানে তিনবারের সেই ফাঁকা আওয়াজ যেন শোকবাদ্যের ঘন্টাধ্বনির মত তীক্ষ্ণ।

—আব এক মাইলও নেই—মেয়েটি বিড়বিড় করে বলল—না, বেশী হবে, একটু থেমে বলল আবাব। টাউন হলটা পর্য্যন্ত এক মাইল—তারপব আবও খানিকটা এগিয়ে যেতে হবে আমায়। এক মাইলেব একটু বেশী, তাহলেই পৌছে যাব। বেশ কিছুক্ষণ থেমে থেকে সে বলতে লাগল আবাব—পাঁচবাব কি ছ'বার পা ফেললে একগজ, ছ'বাবই হবে বোধহয়। সতেরোশ' গজ যেতে হবে তাহলে একশোকে ছয দিয়ে গুণ কবলে ছয় শো—তাবও সতেব গুণ—হায় রে কপাল! ভগবান!

রেলিংটা ধরে এগুতে লাগল সে—একহাত বাড়িযে ভব দিযে আবার দ্বিতীয় হাত—তারপব পা দুটোকে কোনও উপায়ে টেনে টেনে এগিযে নেওয়া

মেয়েটি যে নিজের মনে কিছু বলছিল তা নয়। অনুভূতিব তীব্রতা শক্তিমান লোকদের স্বাতন্ত্র্যকে জাগিয়ে তোলে, কিন্তু দুর্বল লোকদেব স্বাতন্ত্র্য একেবারে হরণ করে নেয়। আগেব মতই ক্ষীণ স্ববে সে বলল—আর পাঁচটা খুঁটি পেবোতে পাবলেই বোধহয় শেষ—এইটুকু যাওয়াব মত শক্তি চাই।

একেবাবে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলাব থেকে কাল্পনিক অর্ধজ্ঞাত একটা বিশ্বাসবে ভর করে এগিয়ে চলাব এই হল বাস্তব উদাহরণ। পাঁচটা খুঁটি পেবিয়ে সে পঞ্চমটিব গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

—আব পাঁচটা পেবোতে পারলেই আমার যাত্রা শেষ, এই বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাব। নিশ্চই পাবব পৌছতে।

আরও পাঁচটা খুঁটি সে পেবিয়ে গেল।

—আব পাঁচটা যেতে পাবলেই হয।

আবও পাঁচখানাব দূরত্ব সে এগিয়ে গেল।

—কিন্তু আরও পাঁচটা যেতে হবে যে।

সেগুলোও পাব হযে এল মেয়েটি।

একটু পরেই খালের ওপব পাথরের ব্রিজটা যেই দেখা গেল, মেয়েটি মনে মনে বলল—ঐ ব্রিজ পেরোতে পারলেই আমাব যাত্রার শেষ।

হামাগুড়ি দিয়ে সে এগিয়ে গেল ব্রিজেব দিকে। এত করুণ আর কষ্টদায়ক তার এই অগ্রগতি, যে প্রতিবারই মনে হচ্ছিল, মেয়েটি যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করল আর বোধহয় ফিরে পাবে না।

—এখন কথাটা হল, মেয়েটি বসে পড়ে ভাবল—আসল কথা হল, আর আধ মাইলও নেই। মিথ্যা জেনেও সে আত্ম-প্রবঞ্চনার জোরেই এই যতটুকু সম্ভব এগিয়েছে, নইলে এই আধ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করার মত আদৌ সামর্থ্য ছিল না তার। কি এক রহস্যময় প্রেরণার শক্তিতে মেয়েটি যেন গূঢ়তত্ত্বটি বুঝে ফেলেছে যে, দৃষ্টিমান হওয়ার থেকে অন্ধত্বই আঘাত হানার পক্ষে উপযোগী আর দূরদৃষ্টির তুলনায় কাছের বস্তু দেখতে পারাটাই বেশি ফলদায়ক। অথবা বলতে পারা যায় কার্যসিদ্ধির জন্যে সর্বব্যাপী না হয়ে বরং সীমিত জ্ঞানই প্রকৃত প্রয়োজন।

এই অসুস্থ এবং শ্রান্ত মেয়েটির সামনে এখন এই আধ-মাইল দূরত্ব অচল অনড় ঠুঁটো জগন্নাথের মত দাঁড়িয়ে—তার জগতের ভাবলেশহীন রাজা। রাস্তাটা এখানে ডার্ণওভার মুর পার হয়ে এগিয়ে গেছে। দিগন্তবিস্তৃত আকাশ, আলো আর নিজেকে দেখল মেয়েটি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা পাথরের গায়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল।

বুদ্ধিবৃত্তির এত সফল ব্যবহার আর কেউ করতে পারে নি আগে। অবশিষ্ট আটশ গজের দূরত্ব অতিক্রম করতে যত রকম সাহায্য, পদ্ধতি, কৌশল ইত্যাদি মানুষের মাথায় আসে সবগুলোই তার ব্যস্ত মস্তিষ্কে ঘোরাফেরা করে বাতিল হয়ে গেল। লাঠি, চাকা এবং হামাগুড়ির কথা সে আগেই ভেবেছিল—এমনকি গড়িয়ে গড়িয়ে বাকী রাস্তাটুকু পার হওয়া যায় কিনা, তা ও ভেবে দেখেছিল। কিন্তু সোজা হয়ে হাঁটার থেকে তাতেও পরিশ্রম কিছু কম নয়। তাই নতুন পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টায় ইতি পড়ল। অবশিষ্ট রইল শুধু চরম নিরাশা—আর পারছি না। বিড়বিড় করে বলে মেয়েটি চোখ বুঁজল।

ব্রিজের উল্টোদিকে লম্বা লম্বা দাগটানার মত ছায়া পড়েছে। সেই ছায়ার মধ্যে কিছু একটা যেন নড়ে উঠল, বিবর্ণ ধূসর রাস্তার উপর উঠে এল, নিঃশব্দে এগিয়ে এল এই ধরাশায়ী মেয়েলোকটির দিকে।

মেয়েটি টের পেল, তার হাতে কিসের একটা স্পর্শ—কোমল এবং উষ্ণ। চোখ মেলে তাকাল সে, ছোঁয়াটা এখন তার মুখে অনুভব করতে লাগল। একটা কুকুর পরম স্নেহে তার গাল চাটছে।

বেশ বড়সড় শান্ত একটা জানোয়ার। মেয়েটির দৃষ্টিপথের থেকে অন্ততঃ ফুট দুয়েক তার উচ্চতা। কোন জাতের কুকুর তা বলা সম্ভব নয়। এত আশ্চর্য্য-জনক আর রহস্যময় তার ধরণধারণ যে সাধারণ কোনও উপজাতির মধ্যে তাকে

ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না। সমস্ত কুকুর জাতের যে মহত্ত্ব তারই প্রতিমূর্তি হয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে। অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মনেও, অন্ধকারে কবিত্ব জেগে ওঠে, এই মেয়েটির বেলাতেও প্রায় তাই হল।

এর আগে যখন দাঁড়াতে পারত, পুরুষ মানুষের চোখের দিকে যেমনভাবে তাকাত সে, এখন শুয়ে শুয়ে ঠিক তেমনি করে তাকাল কুকুরটার দিকে। তারই মত এই জন্তুটাও গৃহহারা। মেয়েটি নড়ে উঠলে সে সসম্মানে দু'এক পা সরে দাঁড়াচ্ছিল—তারপর যখন দেখল যে মেয়েটি তাকে দেখে ভয় পায় নি, আবার তার হাত চাটতে লাগল।

বিদ্যুতের মত একটা চিন্তা খেলে গেল মেয়েটির মাথায়—আমি বোধ হয় ওকে কাজে লাগাতে পারি। তাহলে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে।

মেয়েটি কাস্টারব্রিজের দিকে দেখাল ইঙ্গিতে। কিন্তু কুকুরটা যেন বুঝতে পারল না। খানিকটা হেঁটে গেল সে, কিন্তু মেয়েটি আসছে না দেখে, ফিরে এল আবার, আর গরগর করতে লাগল।

প্রবলতম এবং করুণতম প্রচেষ্টা দেখা গেল মেয়েটির, যখন সে আপ্রাণ-শক্তিতে, বুক ভরে শ্বাস নিয়ে, কোনরকমে একটু উঁচু হয়ে, দুই হাত দিয়ে, কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরল—শক্ত করে ধরে বিড়বিড় করে তাকে উৎসাহ জোগাতে লাগল। অন্তরে তার যতই দুঃখ থাক, গলার স্বরে প্রেরণার আভাস, তার থেকেও বেশী আশ্চর্যের কথা, যে দুর্বলকেও কখনও কখনও শক্তি মানের মনে বল ভরসা জোগাতে হয়—এবং সে ভরসা আবার দুঃখের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। কুকুরটা এগুতে লাগল অল্প অল্প করে, আর মেয়েটি অর্ধেক ভর তার ওপর দিয়ে পা ফেলতে লাগল অতি ধীরে ধীরে। কখনও কখনও সে হতাশ হয়ে দম ছেড়ে দিচ্ছিল, যেমন আগেও দিয়েছে বারবার। কুকুরটা এখন তার মানসিক ইচ্ছা এবং একান্ত অক্ষমতা বুঝতে পেরে, মরিয়া হয়ে পড়ল তাকে সাহায্য করতে। তার জামার টুকরো মুখে করে ছুটে যেতে চাইছিল—কিন্তু মেয়েটি ডাক দিয়ে ফিরিয়ে আনছিল। এটা এখন পরিষ্কার যে মেয়েটি মানুষকে এড়িয়ে চলতে চায়, রাস্তার ওপরেই তার থাকা দরকার, কিন্তু সেটা যেন কোনও মানুষের গোচরে না আসে।

খুবই ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল তারা—শহরের প্রান্তে কোনমতে পৌঁছন গেল—এতক্ষণে গন্তব্যস্থানটি চোখে পড়ল।

শহরের প্রায় বাইরে এইখানটিতে একটা মনোরম প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষ থাকার জন্যেই তৈরী হয়েছিল নিশ্চয়। কিন্তু কালে কালে প্রকৃতির হাত এসে পড়েছে। আইভিলতার গাছ ছেয়ে ফেলেছে সমস্ত দেয়াল। অনেকটা যেন গোরস্থানের মত পরিত্যক্ত জায়গা বলে মনে হয়। ক্যাষ্টাবব্রিজ শহর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে, একটু তফাতের এই দৃশ্য কিন্তু ভারী সুন্দর দেখায়।

বিশাল এই অট্টালিকার দুপাশে দুটি ডানার মত বেরিয়ে গেছে—আর মাঝখানে বড একটা প্রাসাদ। দেয়ালের গায়ে একটা গেট—আর গেটের পায়েই একটা তার ঝোলানো—টান দিলে ঘণ্টা বেজে ওঠে। মেয়েটি হাঁটুতে ভর দিয়ে যথাশক্তি উঁচু হয়ে কোনরকমে তারটা ধরতে পারল। টান দিয়েই সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সামনে—মুখটা তার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। ঠিক প্রণাম করার ভঙ্গিতে।

প্রায় ছটা বাজে। বাড়ীটার মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। বড় গেটটার পাশেই একটা ছোট দরজা খুলে গেল। একটা লোক উঁকি দিল ভেতর থেকে। স্তূপীকৃত কিছু কাপড় চোপড় আন্দাজ করে সে ভেতরে গেল আলো আনতে। ফিরে এসে ভাল করে দেখে, আবার দুটি মেয়ে লোককে ডেকে আনল।

তারা সবাই মিলে এই ধরাশায়ী দেহখানাকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে এল। লোকটা তারপর দরজা বন্ধ করে দিল।

—এখানে এল কি করে?—একটি মেয়েলোক প্রশ্ন করল।

—ভগবান জানে—বলল অপরজন।

এতক্ষণে সেই পথিকের গলা শোনা গেল—বাইরে একটা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় গেল সে?—সেই তো নিয়ে এল আমাকে এখানে।

—আমি তো তাকে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিলাম—পুরুষ লোকটা বলল।

তারপর এই ছোট মিছিলটা এগিয়ে চলল ধীরে। সম্মুখে পুরুষ লোকটি বাতি নিয়ে—তারপরে দুটি রোগা স্ত্রীলোক—তাদের মধ্যিখানে ছোট কোমল মেয়েটিকে দুদিক থেকে কোনমতে ধরে আছে—বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ ৩৪ ॥

ফেরার পরে সেদিন সন্ধ্যেবেলা বাথশেবা তার স্বামীর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলল না—আর ট্রয়েরও কথা বলার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। কিন্তু মুখ না ফুটলেও, কোনও কারণে যে তার বুক ফাটছিল তাতে সন্দেহ নেই। পরের দিন রবিবার। সেদিনটিও সাদামাটা কেটে গেল। বাথশেবা সকাল বিকেল দু'বেলাই গীর্জায় গেল উপাসনা করতে। পরের দিন 'বাড মাউথে' রেসখেলার দিন। সন্ধ্যেবেলা ট্রয় হঠাৎ এসে বলল—বাথশেবা, আমাকে কুড়ি পাউণ্ডের মত টাকা দিতে পার?

বাথশেবা যেন তক্ষুনি নিভে গেল, বলল—কুড়ি পাউণ্ড?

—আসলে টাকাটা আমার ভীষণ দরকার—ট্রয়ের মুখে এক গভীর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের ছাপ। সারাদিন মনে মনে যে কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছিল—এখন তার প্রকাশ হ'ল।

—ও। কালকের রেস খেলার জন্যে?

ট্রয় তক্ষুনি কোন উত্তর দিল না, একটু সময় নিয়ে বলল—

—মনে কর যদি তাই হয়?

—ও ফ্রাংক!—বাথশেবার কথায় কাকুতি-মিনতির ধারা বয়ে গেল—এই কয়েক সপ্তাহ আগে তুমি বলতে, জগতের অন্য যাবতীয় আনন্দের চাইতে আমি ছিলাম তোমার বেশী প্রিয়—আমার জন্যে সে স-অ-ব তুমি ত্যাগ করতে রাজী ছিলে—আর এখন? এখন তুমি আমার জন্যে এই বদখেয়ালটুকু ছাড়তে পারবে না? ফ্র্যাংক! প্লীজ—কথা শোন—আমি তোমাকে খুশী করার জন্য সবকিছুতেই রাজী। লক্ষ্মীটি, বাড়ী ছেড়ে যেয়ো না। আমি সারাদিন তোমাকে আনন্দে রাখব।

কোমলতা এবং আর্দ্রতা যেন বাথশেবার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠল। কোন পুরুষই এমন মুহূর্তে বশ্যতা স্বীকার না করে পারে না—সুন্দর মুখের সলাজ কাতর চাহনি, কথার থেকেও অনেক বেশী মুখর—মনে হয় যেন এইসব মুহূর্তের জন্যেই সুন্দর মুখের সার্থকতা। এই মহিলা যদি তার স্ত্রী না হ'ত, ট্রয় নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণ করে বসত। কিন্তু সে তার স্ত্রী বলেই ট্রয়কে সত্যি কথাটা বলতে হ'ল—

—টাকাটা আদৌ রেস খেলার জন্য নয়।

—তবে কি জন্যে? বাথশেবা জিজ্ঞাসা করল—কেন যে তোমার এত

পয়সাকড়ি দরকার হয়, আমি কিছুই বুঝি না।

ট্রয় ইতঃস্তত: করতে লাগল। তার প্রেমে এখন ভাঁটা পড়েছে তাই বাথশেবাকে খুশী করার জন্যে সে তত উদ্‌গ্রীব নয়—তথাপি স্বাভাবিক সৌজন্য থাকা উচিত। ট্রয় বলল—তুমি আমাকে বৃথা সন্দেহ করছ। এত তাড়াতাড়ি যে তুমি অবিশ্বাস করতে শুরু করবে এটা মোটেই শোভা পায় না।

—পয়সা যখন আমিই দেব, বাজিয়ে একটু নিতে হবে বৈকি?—ঈষৎ হাসি ও গাম্ভীর্য্য মিশিয়ে বলল বাথশেবা।

—ঠাট্টা তামাসারও একটা সীমা থাকা দরকার, বাথশেবা! নইলে কিন্তু দুঃখ পেতে হয় পরে। বাথশেবা রাঙা হয়ে উঠল, বলল—দুঃখ পেতে আর বাকি আছে কোথায়?

—কেন, দুঃখ পাওয়ার কারণ?

—আমার রোমান্স ফুরিয়ে গেছে।

—সব রোমান্সই বিয়ের পরে শেষ হয়ে যায়।

—এসব কথাবার্ত্তা কি না বললেই নয়? আমারই কাঁধে বসে আমাকে লম্বা লম্বা কথা শোনাবে এ আমার একটুও পছন্দ নয়।

—শুধু অপছন্দ নয়, তুমি বোধহয় আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছ।

—তোমাকে নয়, তোমার বদ স্বভাবগুলোকে আমি সত্যিসত্যিই ঘৃণা করি।

—কিন্তু সেগুলোকে তুমি সংশোধন করার চেষ্টা করলেই ভাল হত বোধহয়। যাকগে ছেড়ে দাও—এখন কুড়িটা পাউণ্ড দিয়ে, এসো মিটমাট করে ফেলা যাক।

বাথশেবা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—সংসার খরচের জন্যে আমার কাছে ঐরকম টাকাই আছে। তুমি যদি নেবেই তবে নিয়ে নাও।

—ধন্যবাদ। কালকে খুব ভোরবেলাতেই আমাকে বেরুতে হবে। তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে না।

—তোমাকে যেতেই হবে? হায় ক্র্যাংক! এমন সময়ও ছিল যখন আমাকে ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে পাঁচটা লোকের কাছে দেওয়া কথার খেলাপ করতে তোমার আটকাত না একটুও। আর এখন আমার দিন কিভাবে কাটে তার খবরও রাখ না তুমি।

—তোমার শত সেণ্টিমেণ্ট সত্ত্বেও আমাকে যেতে হবে, ট্রয় তার ঘড়ির দিকে

তাকাল। তারপব অন্যমনস্ক ভাবে পকেট থেকে একটা কৌটো বার করে খুলে ফেলল—তাবমধ্যে ছোট একগাছা চুল।

বাথশেবা হঠাৎ সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। বেদনা ও বিস্ময়ে সে যেন জ্বলে উঠল। কোনও কিছু বুঝতে পারার আগেই সে বলে ফেলল—মেয়েছেলের চুল? ফ্রাংক! কার চুল ওটা?

ট্রয় কৌটোটা বন্ধ করে ফেলল। খুব সহজভাবেই বলল সে—তোমারই তো—আবার কার হবে? আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম কোথায় রেখেছি।

—কি মিথ্যুক তুমি ফ্র্যাংক!

—সত্যি বলছি ভুলে গিয়েছিলাম তাই। ট্রয় জোর গলায় বলল।

—কক্ষনো না—ওটা সোনালী বংয়ের চুল। আমাকে বলতে হবে কার চুল ওটা?

—বেশ বলছি। আব চেঁচামেচি কোব না। তোমার সঙ্গে পরিচয় হওযাব আগে আমি ওই মেয়েটিকে বিয়ে কবতে যাচ্ছিলাম।

—কি নাম তাব বল তাহলে?

—না, সে বলতে পাবব না।

—এখন তাব বিয়ে হযে গেছে?

—না।

—বেঁচে আছে সে এখনও?

—হ্যাঁ।

—দেখতে সুন্দব?

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য!

—না, চুলেব রঙটা আমার ভাল লাগে তাই—ট্রয় বলল—তাকে যেই দেখেছে, চুলের রঙ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে।

—হুঁ। রেখে দাও, রেখে দাও—বাথশেবা চেঁচিয়ে উঠল। তোমাকে ভাল না লাগলে আমিও ওরকম বলতাম, অমুকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত অমুকে আমাকে ভালবাসত।

—বাথশেবা! ছেলেমানুষি কোর না। এতই যদি তোমার মনে সন্দেহ আর ভয় থাকে তো বিবাহিত জীবনে প্রবেশ না করাই উচিত ছিল।

ট্রয়ের কথায় তিক্ততার চূড়ান্ত হল। বাথশেবার গলা বুজে আসছে; চোখে

টলটল করছে জল। কান্নায় ভেঙে পড়ার মত মেয়ে বাথশেবা নয়। তাই সে ফুঁসে উঠল—এইই আমার ভালবাসার পরিণাম। বিয়ের আগে আমার নিজের থেকেও তোমার জীবন আমার কাছে বেশী প্রিয়তর ছিল। তোমার জন্যে কি না করেছি, মৃত্যুও সে তুলনায় কিছু নয়—আর এখন ? তোমায় বিয়ে করে বোকামি করেছি এই ছিছিক্কার শুনতে হচ্ছে ! আমার বুদ্ধি বিবেচনা সম্পর্কে তোমার মনে যাই থাক, তোমাব অধীন বলে সে কথা কি এত নিষ্ঠুরভাবে না বললেই নয় ?

—জানি না বাপু, তোমাদের কিসে কি হয়। ট্রয় বলল—মেয়েলোক মাত্রেই বোধহয় আমার জীবনে শুধু অশান্তি।

—তুমি অন্যকারও চুল রাখতে পারবে না। ও তোমাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ট্রয় যেন কথাগুলো শুনতে পেল না, বলল—তোমার সঙ্গে আমার যে বন্ধন, তার থেকেও গভীরতর বন্ধন থাকতে পারে—সে এমনই সম্পর্ক যে অভিজ্ঞতা এখনও তোমার হয় নি। আজকে এই বিয়ের জন্যে তোমার মনে যদি দুঃখ এসে থাকে, আমারও অনুতাপ কিছু কম নয়।

বাথশেবা বিপন্নের মত কাঁপতে লাগল। ট্রয়ের হাত টেনে ধরে বিষাদ ও সান্ত্বনা মিশ্রিত স্বরে বলল—তুমি যদি অন্য কোন মেয়েকে আমার থেকে বেশী না ভালবাস, তবে তো আমার দুঃখের কিছু নেই। আমার মনে আর কিছু নেই বিশ্বাস কর—বল, সত্যি করে বল, তুমি আমার থেকে আর কাউকে বেশী ভালবাস না।

—জানি না—এ কথা তোলার কি মানে থাকতে পারে, তাও বুঝি না।

—ঐ চুলটা তুমি তাহলে পোড়াবে না ? ঐ মেয়েটাকেই তাহলে তোমার বেশী পছন্দ ? জানি আমার এই ঘোড়ার লেজের মত কালো চুলের থেকে ঐ চুল অনেক বেশী সুন্দর—কুৎসিত হলেও তো কিছু করবার নেই আমার। তোমার পছন্দ অপছন্দ ব্যাপারেও কিছু বলবার নেই।

—আমি দিব্যি করে বলতে পারি, গত কয়েক মাসে একবারও আমাব ঐ চুলের কথা মনে হয় নি।

—কিন্তু এখনই যে তুমি কি সব 'বন্ধনের' কথা বললে—তাহলে কি যে মেয়েটির সঙ্গে আমাদের দেখা হল সেদিন ?

—দেখা হওয়ার জন্যেই চুলের কথাটা মনে পড়ল।

—ভুল কি তবে তার ?

—হ্যাঁ। এখন সব শুনে স্বস্তি পেয়েছ তো ?

—তাহলে বন্ধনটা কি ?

—ও কিছু না। এম্নি বলছিলাম।

—মজা করার জন্যে ? বাথশেবা বিস্মিত হয়ে বলল—আমার মনে কষ্ট দিয়ে তুমি এতই খুশী হও ? সত্যি কথা বল ফ্রাংক ! মেয়ে হলেও আমি তো বোকা নই, এটা তোমাব বোঝা উচিত। মিথ্যে প্রবোধ দিও না।

বাথশেবা নির্ভীক এবং সবলভাবে বলল—আমি তোমার কাছে বেশী কিছু চাই না, শুধু সততা। হায়, একদিন আমি ভাবতাম আমার স্বামী আমাকে তাব সব কিছু উজাড করে দেবে, আর আজ শুধু ভদ্র ব্যবহারই আমার কাছে যথেষ্ট ! স্বাধীনচেতা বাথশেবার আজ এই পবিণতি !

—দয়া করে একটু ভেবেচিন্তে কথাবার্তা বোল।—বলে ট্রয় উঠে পডল এবং ঘব থেকে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বাথশেবার বুকে যেন বিলাপের বেগ নেমে এল। কিন্তু অশ্রুধারা এসে সেই স্রোতকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল না। অন্তবে অন্তরে ফুঁসে উঠতে লাগল বাথশেবা। বেঁচে থাকতে সে এই পরাজয় মেনে নেবে না। বিবাহের এই অসুখী পরিণতি তার গর্ব ভেঙে চুরচুর করে দিল। খাঁচায় পোরা চিতাবাঘের মত বাথশেবা খালি পায়চারি করতে লাগল ঘরের মধ্যে। সারা শরীরের রক্ত যেন মুখে এসে উঠেছে। ট্রযেব সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্য্যন্ত তার মনে নারীত্বের এক গর্ববোধ ছিল। সে ভাবত কোনও পুরুষেব ওষ্ঠ তার অধরকে কলঙ্কিত করে নি। কোনও প্রেমিক তার কটিদেশ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নি। এখন তার মনে দেখা দিল নিজের প্রতি অবমাননা-বোধ। আগেকার সেই সব দিনে, বাথশেবা, জীবনে প্রথম প্রেমিকের কাছেই আত্মসমর্পণকারিণী হ্যাংলা মেয়েদের কত হীন চোখে দেখত। অধিকাংশ মেয়েরাই যেমন বিয়ের কথা ভেবে সারা হয়, বাথশেবার কাছে বিবাহ ব্যাপারটা কোন প্রসঙ্গই ছিল না। ভালবাসার পাত্র সম্পর্কে উদ্বেগের কারণেই সে রাজী হয়ে গেল বিয়েতে। কিন্তু পরিণামে সুখ-সম্মান তো দূরের কথা, শুধু আত্মত্যাগই মেনে নিতে হল তাকে। হায় ! এমন ভুল সে কেন করল ! কেন সে ফিরে দাঁড়াতে পারল না—নরকুম্বে যেমন আত্মসচেতন হয়ে দাঁড়িয়েছিল একদিন—ট্রয় কেন, কোন পুরুষই তাকে স্পর্শও করতে পারত না কোন কালে।

পরের দিন একটু তাড়াতাড়িই ঘুম থেকে উঠে পড়ল বাথশেবা। কিন্তু নীচে নেমে শুনল যে তার স্বামী ভোরে উঠে সকালের খাবার খেয়ে ঘোড়া এবং গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেছেন ক্যাস্টার ব্রিজের দিকে। সকালবেলার ক্রিয়াকর্ম সেরে বাথশেবা বেরুল ফার্মের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখার জন্যে। আজকাল সে নিজেই সব তত্ত্বাবধান করে, যদিও সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় গ্যাব্রিয়েল ওক তার আগেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইত্যাদি ব্যবস্থা সারা করে রেখেছে। ওকের প্রতি বাথশেবার নির্ভরতা এবং বন্ধুত্ব এখন অনেকাংশে ভাই এর প্রতি বোনের মত। কখনও কখনও অবশ্যি তাকে পুরনো প্রেমিক বলেও মনে করে আর ভাবে তার সঙ্গে বিয়ে হলে জীবনটা কেমন হত। অথবা বোল্ডউডের সঙ্গে হলেও বা কেমন কাটত দিনগুলো। কিন্তু বাথশেবা এসব ফালতু দিবাস্বপ্ন দেখার মেয়ে নয়—এই প্রবণতা তার জন্মেছিল, ট্রয়ের অবহেলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য।

দূর থেকে বাথশেবা মিঃ বোল্ডউডের মত কাকে আসতে দেখল, মনে মনে সে দুঃখের হাসি হাসল আর দেখতে লাগল, মিঃ বোল্ডউড বেশ দূরে থাকতেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন, গ্যাব্রিয়েলকে হাত তুলে ডাকলেন, তারপর দুজনে কি যেন গম্ভীর কথাবার্তা হল। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলছিল দুজনে। জোসেফ পুয়োরগ্রাস মাথায় এক ঝুড়ি আপেল নিয়ে বাথশেবার বাড়ীর দিকে আসছিল। বোল্ডউড এবং গ্যাব্রিয়েল তাকে ডেকে কি যেন বলল, তারপর তিনজনেই পৃথক হয়ে গেল। জোসেফ একটু পরেই আপেলের ঝুড়ি নিয়ে এগিয়ে এল।

বাথশেবা বিস্মিত হয়ে এই মূক দৃশ্য দেখছিল। বোল্ডউড ফিরে যাওয়াতে কিছুটা স্বস্তি পেল। জোসেফকে সে জিজ্ঞাসা করল—কি খবর জোসেফ?

জোসেফ মাথা থেকে ঝুড়িটা নামাল। তারপর একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে যে ভাবে কথাবলা উচিত, বেশ প্রস্তুতি নিয়ে বলল—ম্যাডাম, ফ্যানি রবিনকে আর কোনদিন দেখতে পাবেন না।

—কেন?

—সে ঐ লঙ্গরখানায় মারা গেছে।

—ফ্যানি মারা গেছে! সে কি?

—হ্যাঁ ম্যাডাম।

—কি করে-এ?

—আমি ঠিক জানি না—তবে মনে হয় শরীরটা খারাপ হয়ে পড়েছিল। এমনিই তো রোগা পটকা। কষ্ট সইতে পারত না, দেখেছি তো। আজ সকাল থেকেই অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল। অত দুর্বল আর রুগ্ন তো—বিকেলের দিকে মারা গেল। এই গ্রামেরই মেয়ে ছিল তো—তাই মিঃ বোল্ডউড বললেন আজ বেলা তিনটের সময় গাড়ী পাঠাবেন—ডেডবডি নিয়ে আসাব জন্য, এখানেই মাটি দেওয়া হবে।

—মিঃ বোল্ডউড পাঠাবেন কেন? আমিই পাঠাচ্ছি। ফ্যানি আমার কাকার কাছে কাজ করত, আমি অবশ্যি দু দিনের জন্য দেখেছি, তবুও সে আমারই কর্মচারী। কিন্তু—কি দুর্ভাগ্য! ফ্যানি লঙ্গরখানায় মারা গেছে? দুঃখকষ্ট যে কি বাথশেবা আস্তে আস্তে টের পাচ্ছিল, তাই তার কথায় আন্তরিকতা ছিল।—মিঃ বোল্ডউডের কাছে লোক পাঠাও, বলে দাও যে, মিসেস ট্রয় তাঁর গাড়ী পাঠাচ্ছেন। তাঁদের পুরনো কর্মচারীর সৎকারের ব্যবস্থাও তিনিই করবেন। তুমি চলে যাও, জোসেফ, আমাদেব ওয়াগনটা বেশ ধুয়েটুয়ে পরিষ্কার করে নিও। আর শোনো—

—কি ম্যাডাম?

—কিছু ফুল নিয়ে যেও। কফিনের ওপরে বেশ ফুল দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে আসবে।

—আচ্ছা ম্যাডাম!

—হায় হায়, ক্যাষ্টারব্রিজের লঙ্গরখানায় মারা গেল ফ্যানি! শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা হয়েছিল! বাথশেবা বিড়বিড় করে বলল—আহা আগে যদি জানতে পারতাম! আমি ভেবেছিলাম সে কোথাও চলে গেছে, কতদিন ছিল ওখানে?

—এই তো দু'একদিন আগে গেছে।

—অ! তাহলে ওখানেই বাস করত না!

—না, প্রথমে তো ঐ ক্যাণ্টনমেণ্টে চলে গিয়েছিল। তাবপর মেলচেষ্টারে এক বুড়ীর বাড়ি রান্নাবান্নার কাজ করত। আমার তো মনে হয় লঙ্গরখানায় গেছে ও রবিবার দিন সকালে! খুব কষ্ট করেই গিছল বোধ হয়—কেন যে ঐ বুড়ীর কাজটা ছেড়ে এল কি জানি—মিছে কথা বলব কেন, ম্যাডাম! এর বেশী কিছু জানি নে।

—আহা হা!

বাথশেবা একটা লম্বা শ্বাস নিল। পোখরাজের রং যেমন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে

দেখতে গেলে, মুহূর্তের মধ্যে সোনালী থেকে সাদা হয়ে যায়—বাথশেবার মুখের ভাবও তেমনি হয়ে গেল। কি ভেবে সে হঠাৎ আগ্রহভরে বলল—আচ্ছা, ও কি আমাদের এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছিল?

—হুঁ, তাই তো মনে হয় আমার। কিন্তু ম্যাডাম, আপনাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে—পড়ে টড়ে যান যদি—লিডিকে ডাকব?

—না, না, দরকার নেই, ও কিছু না। আচ্ছা ওয়েদারবেরীর ওপর দিয়ে কখন গেছে?

—গত শনিবার রাত্রিতে—

—ঠিক আছে জোসেফ! তুমি এসো কেমন।

—আচ্ছা ম্যাডাম।

—জোসেফ! এক মিনিট শোনো তো—আচ্ছা ফ্যানি রবিনের চুলের রং কেমন ছিল মনে আছে?

—ম্যাডাম! আপনি এমন উকিলের মত জেরা করছেন। আমি কিন্তু সত্যি সত্যি মনে করতে পারছি না।

—ও আচ্ছা, তবে যাও। যেমন বললাম—সেইরকম কোর সব কিছু। দাঁড়াও—আচ্ছা তুমি গ্রামে আর কোনও গল্প শোনো নি ফ্যানির সম্পর্কে? ও কাকে ভালবাসত বা কিছু?

—না, ম্যাডাম! কিছু না—গ্রামের কেউ এখনও জানেই না এসব খবর। মিঃ বোল্ডউড আর গ্যাব্রিয়েল আমাকে ডেকে শুধু এইটুকুই বললে—নইলে আমিও জানতাম না কিছুই।

—বুঝলাম না, গ্যাব্রিয়েল নিজে কেন এসে আমাকে খবরটা দিল না? সব খুঁটিনাটি ব্যাপারই তো সে আমাকে ডেকে দেখায়। বাথশেবা মাটির দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলল।

—বোধ হয় সময় পায় নি—জোসেফ আন্দাজ করল—তাছাড়া ওর আজ কাল প্রায়ই বোধ হয় মন খারাপ লাগে। আগে কত বড়লোক ছিল! আর এখন কিভাবে আছে এইসব ভাবে বোধ হয়। খুব আশ্চর্য্য লোক ম্যাডাম! তবে খুউব ভালো—আর পড়াশুনোও জানে অনেক।

—তোমাকে যখন এইসব কথা বলল তখন কি ওর মন খুব খারাপ দেখলে?

—না, তেমন কিছু বলতে পারি নে—তবে ও আর ফার্মার বোল্ডউড দুজনেই বেশ ভেঙে পড়েছেন দেখলাম।

—ঠিক আছে জোসেফ, তুমি চলে যাও, আর দেরী কোর না।

বাথশেবা মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছিল না। সে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

বিকেলের দিকে, ওপর থেকে নেমে, বাথশেবা লিডিকে জিজ্ঞাসা করল— —লিডি আগেই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনেছিল—আচ্ছা লিডি! ফ্যানি রবিনের চুলের রং কেমন ছিল বলতে পারিস? আমার ঠিক মনে পড়ছে না—একদিন দুদিন মাত্তর দেখেছি।

—খুব হাল্কা রংয়ের, ম্যাডাম। তাছাড়া ওর চুল তো ছোট ছিল, সব সময় বেঁধে রাখত টুপির মধ্যে, তাই দেখা যেত না। তবে শুতে যাওয়ার সময় তো দেখেছি আমি—একেবারে ঠিক সোনালী রংয়ের চুল।

—ও তো এক সোলজারকে ভালবাসতো তাই না?

—হ্যাঁ, মিঃ ট্রয়ের সঙ্গে একই বাহিনীতে সেও ছিল। মিঃ ট্রয় তো চিনতেন তাকে।

—মিঃ ট্রয় বলেছে বুঝি? ওকথা উঠলো কেন?

—আমিই একদিন বলছিলাম যে উনি লোকটাকে চেনেন কিনা—তা উনি বললেন, হ্যাঁ খুব ভালই চিনি, সমস্ত বাহিনীর মধ্যে তাকেই আমি ভালবাসতাম সবচেয়ে বেশী।

—ও! তাই বলল?

—আর বলছিলেন যে ওঁদের দুজনকেই নাকি একই রকম দেখতে—লোকে অনেক সময় ভুলও করে বসতো—

—লিডি, আর কিছু বলতে হবে না, দয়া করে চুপ কর। বাথশেবার স্নায়ুগুলো যেন শিথিল হয়ে পড়েছিল উদ্বেগ ও অস্থিরতায়।

॥ ৩৫ ॥

জোসেফ পুয়োরগ্রাস যখন তার গাড়ী নিয়ে ক্যাষ্টারব্রিজের লঙ্গরখানায় পৌঁছল তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। গাড়ী নিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক গাড়ী লাগানোর জায়গা দেখিয়ে দিল। তারপর দুটো ষণ্ডামার্কা লোক ধরাধরি করে একটা শবাধার তুলে দিল গাড়ীর ওপর। তাদের মধ্যে একজন আবার পকেট থেকে বিরাট একখণ্ড খড়ি বের করে কি সব লিখে দিল বাক্সটার ওপর। তারপর একটা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হ'ল সব। জোসেফ

বাইরে বসে থাকলো। একজন ভিতর থেকে একটা সার্টিফিকেট ছিঁড়ে এনে দিল জোসেফের হাতে। তারপর দুজনেই ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল—যেন ফ্যানির প্রতি তাদের সমস্ত দায়িত্ব ফুরিয়ে গেছে।

জোসেফ তারপর উঠে, ফুল দিয়ে বেশ করে সাজিয়ে দিল শবাধারটা। সন্ধ্যের কিছু আগে সে গাড়ী ছেড়ে দিল ওয়েদারবেরীর উদ্দেশ্যে। পথের ডান দিক ধরে একটানা সমুদ্র। কিছুক্ষণের মধ্যেই জোসেফ দেখল সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সমুদ্রের ওপর অনেকা মেঘের আনাগোনা—চারিদিক যেন ঘন ভারী হয়ে আসছে। ইয়ালবেরীর জঙ্গলে যখন তারা ঢুকল, জোসেফ, তার ঘোড়া, আর বেচারা ফ্যানির শবদেহ—তখন চারিদিক নিঃস্তব্ধ। ঘন কুয়াশায় সবকিছু আচ্ছন্ন। গাছের পাতা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। জোসেফ ভাবছিল একটা বাচ্চাছেলে বা একটা কুকুরও যদি তার সাথে থাকত তবে নিঃসঙ্গতা কাটত কিছুটা। এই বনটা পেরোলেই ছোট্টগ্রাম রয়-টাউনের প্রান্তে এক সরাইখানা আছে। ওয়েদারবেরী সেখান থেকে মাইল দেড়েক দূর।

সরাইখানার সাইনবোর্ডটা দূর থেকে দেখে জোসেফ মনে একটু বল পেল। অনেকক্ষণ থেকেই সে মনে মনে ভাবছিল গলাটা একটু ভেজান দরকার। ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে সে ভেতরে ঢুকল এক ঢোক পানীয়ের খোঁজে। ভেতরে একপা দিয়েই সে দেখে, আহা মরি! কি দৃশ্য! জান কোগান আর মার্ক ক্লার্ক বসে আছে। আশে পাশের গ্রামের মধ্যে এদের দুজনের গলার শুকতাই বেশ বিখ্যাত।

—আরে এ যে পুয়োরগ্রাস! মার্ক ক্লার্ক বলে উঠল।

—চার মাইল হাঁটতে হাঁটতে আসছি—বিরাট বোঝা ঘাড়ে করে—বুঝলে! জোসেফ খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল—সকাল থেকে গলা ভেজান'র সুযোগ পাইনি।

জোসেফ বেশ একটু সময় নিয়ে পানকার্য্য সমাধা করল। আর তার থেকেও বেশী সময় নিয়ে বলল—আঃ প্রাণটা জুড়োল। সত্যিই জুড়োল। এমন একটা অখাদ্য কাজে বেরিয়েছি আজ।

—আরে সুরাপানের মত আনন্দ আর কিসে আছে ভাই। কোগান ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ মুদে চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, যেন সে তার মৌজ একটুও নষ্ট করতে রাজী না, অতএব আজেবাজে কথায় কান দিয়ে লাভ নেই।

—আচ্ছা উঠি তা হলে—পুয়োরগ্রাস বলল—তোমাদের সঙ্গে আর এক

ঢোক খেতে পারলে অবশ্যি ভালই হ'ত কিন্তু গাঁয়ের লোকে আমাকে এখানে দেখলে আর আস্ত রাখবে না।

—কি এমন কাজ! কোথায় যাবে হে তুমি, জোসেফ?

—ওয়েদারবেরী ফিরে যাব। আমার গাড়ীতে ফ্যানি রবিন রয়েছে। সন্ধ্যের মধ্যেই আমার গীর্জায় গিয়ে পৌছনর কথা।

—ওঃ হো শুনেছিলাম বটে—গাঁয়ে সব চাঁদা তুলবে না কি?

—না, খরচাপাতি বোধ হয় আমাদের ম্যাডামই করবেন।

—আহা মেয়েটি ভাল ছিল, তা এত তাড়াতাড়ির কি আছে জোসেফ? মেয়েটি তো মরেই গেছে। বেঁচে আর উঠবে না যখন, তুমি আমাদের সঙ্গে বসে অনায়াসে আর এক মগ টেনে দিতে পার।

—আর এক মগ খাওয়া কিছুই নয়—তবে বেশীক্ষণ বসতে পারব না।

—আরে নাও নাও, একবার পেটে পড়লে আবার কথা।

—হ্যাঁ ঠিক বলেছ—মার্ক ক্লার্ক বলল—ভগবান যখন ক্ষ্যামতা দেছেন তখন অবহেলা করা ঠিক নয়, কি বল! আঃ—দেহটা জুড়ুক। ওসব শাস্তর আউড়ে কি হবে হে! ফুর্তি কর বাওয়া—

—নাঃ, এবার ওঠা যাক—জোসেফ বলল।

—আরে চোপ্ বেয়াদব! বলছি মেয়েটা মরে গেছে।

—তোমার ছুটোছুটির কি আছে হে!

—পাপের তো আমার অন্ত নেই। কোন রোববারেই গীর্জায় যাই না। আজকাল মনটাও খুব দুর্বল হয়ে গেছে। নাও, তোমরা বলছ যখন—

—আরে স্বর্গে যে যাবে সে যাবে—কোগান বলল—ও জন্যে পুন্যি করতে হয়। আমরা করি নি যখন, যাবও না, তাতে কি আছে—তাই বলে পানাহারও বন্ধ—অসম্ভব।

—আরে ঠিক, ঠিক। ঠিক বলেছ—জোসেফ বলল—কিন্তু আমাকে তো যেতেই হয়—গীর্জায় পাদ্রী সাহেব দাঁড়িয়ে থাকবে আমার জন্য, তাছাড়া মেয়েলোকটাও অপেক্ষা করছে গাড়ীতে।

—দেখ জোসেফ পুয়োরগ্রাস! কাজের অত আঠা দেখিও না—কিসে কি হবে না হবে আমরাও জানি। পাদ্রীসাহেব খুবই ভাল লোক—কিছু মনে করবে না। বসো তুমি চুপ করে।

জোসেফ যত দেরী করছিল, ততই তার দায়িত্ব সম্পর্কে চেতনাবোধ কমে

আসছিল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে সন্ধ্যে থেকে রাত্রিতে পৌছুল। কোগানের ঘড়িতে টং টং করে কটা যেন বাজল। এমন সময় দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে কে ভিতরে ঢুকে পড়ল। সে গ্যাব্রিয়েল ওক। তার কঠোর দৃষ্টিতে পরিবেশটা থমথমে হয়ে উঠেছে। জোসেফ পুয়োরগ্রাস বসে বসেই যেন আরও বেঁটে হয়ে গেল কয়েক ইঞ্চি। ওক তিরস্কার করে বলল—ছিঃ, ছিঃ, জোসেফ! তোমাকে দেখে আমার লজ্জা হচ্ছে। কোগান! তুমি নিজেকে একজন ভদ্রলোক বলে মনে কর, আর এই কি তার পরিচয়?

কোগান অনির্দিষ্টভাবে ওকের দিকে তাকাল। কখনও তার এক চোখ, কখনও বা দুই চোখই বুজে আসছিল। অবশেষে সে বলল—মরা মেয়েলোকটির প্রতি আমরা তো কোনও অসম্মান করি নি। ওর যা হবার তাতো হয়ে গেছে, আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এখন এই জড় পদার্থটির জন্যে ছুটোছুটি করে কি লাভ? সে দেখবেও না, শুনবেও না—এমন কি জানবেও না, তোমরা তাকে নিয়ে কি করছ। বেঁচে থাকলে আমি নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যেতাম। এখনও যদি সে কিছু খাদ্য বা পানীয় চায়, আমি এখুনি রাজী, এই নাও টাকা—কিন্তু ওতো মরে গেছে। হাজার তাড়াতাড়ি করলেও আর বাঁচবে না—ওর জন্যে সময় নষ্ট করাই তো এখন অর্থহীন। বৃথা কেন চিন্তা করছ, শেফার্ড! এস, এস, এই নাও, মগ নাও—আমরাও তো কালকে ওর মতই হয়ে যেতে পারি।

—ঠিক, ঠিক, কালকেই তো আমাদের হতে পারে। মার্ক ক্লার্ক জোর দিয়ে বলল। অতএব আর সময় নষ্ট না করে সে মগে চুমুক দিল। আর কোগান গান ধরল আগামী কালের চিন্তায়—

কাল—আগামীকাল!
সামনে যা আছে, আমি তাতেই বেসামাল।
অন্তরটা সাদা সিধে,
পেটে যমের মত ক্ষিদে,
ইয়ার-দোস্ত সবকে নিয়ে করেছি কামাল,
কা-লে-র চিন্তা কাল!

—চুপ কর কোগান, তোমার চেল্লানি থামাও—ওক বলল, তারপর পুয়োর গ্রাসের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি কি যেতে পারবে? এত মাল টেনেছ যে দাঁড়াতেই তো পারছ না।

—না শেফার্ড! আসলে ব্যাপারটা কি জান? আমি সব কিছুই তুটে করে দেখছি। এই তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তু'জন শেফার্ড ওক দাঁড়িে আছে আমার সামনে।

—হুম—ডবল দেখা খুব খারাপ, মার্ক ক্লার্ক ঘাড় নেড়ে বলল।

—আমার সব সময়ই অমন হয়, শুঁড়িখানায় ঢুকেছি কি—জোসেষ বিনয়ের সঙ্গে বলল—অম্নি আমি ম-ম-মাতা···মাতাল হ'লাম। সব সময়ই তো—ভ-ভ-ভগবানকে ডাকছি—মরে গেলেই দেখছি চরম শান্তি।

গ্যাব্রিয়েল দেখল এদের কেউই প্রকৃতিস্থ নয়। কাজেই বাকী রাস্তাটু তাকেই গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সে দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে এল গাড়ীর কাছে এসে ঘোড়ার মুখ থেকে জাবনার পাত্রটা সরিয়ে নিল। লাগা পরিয়ে নিয়ে, সেই অন্ধকারে আবার যাত্রা শুরু করল।

বোল্ডউড এবং ওকের বিচক্ষণতায় গ্রামের কেউ জানত না যে ট্রয়ই ছি ফ্যানির প্রেমিক সেই সোলজার। ওক ভেবেছিল ফ্যানির মৃতদেহ গো দেওয়ার অন্ততঃ বেশ কিছুদিন পরে ছাড়া, এ খবর প্রকাশ হয়ে পড়বে না কারণ এটা জানাজানি হয়ে গেলে বাথশেবার পক্ষে সে আঘাত সহ্য করা খু মুস্কিল হবে। গ্যাব্রিয়েল যখন আস্তে আস্তে বাথশেবার বাড়ীর দরজায় এল— কে একজন বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কে, পুয়োরগ্রাস এলে?

গ্যাব্রিয়েল চিনতে পারল, এ পাদ্রী সাহেবের গলা। সে উত্তর দিল—না আমি। কফিনটা নিয়ে এসেছি।

—আমি তো এই মিসেস ট্রয়ের সঙ্গে কথা বলে এলাম। কেন দেরী হচ্ছে তাই। এখন তো অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন কি আর মাটি দেয়া সম্ভ হবে? তাছাড়া রেজিষ্ট্রারের সার্টিফিকেটটা এনেছ তো?

—না তো, সে বোধহয় পুয়োর গ্রাসের কাছে রয়ে গেছে। আমি একদ ভুলে গেছি চেয়ে আনতে।

—তাহলে তো মিটেই গেল, আজ আর হচ্ছে না। কাল সকালেই হবে আর কি, এখনকার মত ডেডবডিটা রেখে দাও এখানে। তাছাড়া লোকজন বোধহয় সবাই চলে গেছে। তু তিন ঘণ্টা ধরে সব অপেক্ষা করছিল—আব থাকে?

গ্যাব্রিয়েল ভেবে দেখল এই পরামর্শ খুব যুক্তিযুক্ত হবে না। ফ্যানি অনেকদিন কাজ করেছে এই বাড়ীতে। মৃতদেহের সৎকার করতে যতই দেরী

হবে ততই নানা বিপদের সম্ভাবনা। বাথশেবাকে বিকালবেলা দেখে খুব সুস্থ মনে হয়নি। ট্রয় ফেরে নি তখনও। এইসব ভেবেচিন্তে কিছু ঠিক করতে পারছিল না সে। অথচ উপায়ও দেখা যাচ্ছে না কিছু। বাথশেবা একটু পরে বেরিয়ে এল। কি করা উচিত ভেবে যখন ঠিক করা যাচ্ছে না, ওক বলল—কফিনটা গাড়ীতেই থাক। আমরা কফিনশুদ্ধ গাড়ীটা গাড়ীঘরে ঢুকিয়ে রাখি। বাথশেবা বলল—সে হয় না। সারারাত বেচারীকে এই গাড়ীঘরে রেখে দেওয়া খুবই নির্দয় এবং অখ্রীষ্টীয় আচরণ হবে।

পাদ্রী সাহেব তখন বলল—ঠিক আছে, তাহলে আমি চলে যাচ্ছি। কাল খুব ভোরেই এর সৎকার করা হবে। ঈশ্বরের করুণায় যাতে এর সদ্গতি হয় সেটা দেখতে হবে বৈ কি! যদিও সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল তবুও তো আমাদেরই বোন, একথা আমরা ভুলতে পারি না।

পাদ্রীসাহেব চলে গেলে, গ্যাব্রিয়েল একটা আলো ধরাল। তারপর আরও তিনজন লোক ডেকে শবাধারটি নামানো হল। বাথশেবার কথা মত সেটাকে নীচের একটা ঘরে রাখা হল। সবাই চলে গেলে গ্যাব্রিয়েল লণ্ঠনের আলোয় দেখল, সে যা ভয় করেছিল তাই। কফিনের উপর খড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে--- 'ফ্যানি রবীন ও তার সন্তান'। গ্যাব্রিয়েল রুমাল বার করে সযত্নে পরের কথা দুটি মুছে ফেলল। এখন লেখা রইল শুধু 'ফ্যানি রবীন'। তারপর নিঃশব্দে সে বেরিয়ে গেল সদর দরজা দিয়ে।

॥ ৩৬ ॥

সবাই চলে যাওয়ার পর সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বাথশেবা আর লিডি বসেছিল ফ্যানির শবাধারের পাশে। ট্রয় তখনও ফেরে নি। অবশেষে লিডি একসময় বলল—ম্যাডাম, সাড়ে দশটা বাজে। রাত তো অনেক হল। আর অপেক্ষা করবে?

—হ্যাঁ, আর একটু দেখি। তুই বরং চলে যা শুতে। আমিও বারটা পর্যন্ত দেখব। যদি এর মধ্যে সে ফেরে তো ভাল, নইলে আমিও শুয়ে পড়ব।

নিরানন্দ বাথশেবার মুখে কেমন যেন মায়াবী দৃষ্টি। ফ্যানির দুর্ভাগ্যের কপাল দেখে বাথশেবারও জাগতিক দুঃখ ভয় সব কিছু বিদায় নিয়েছিল। শুধু ফ্যানির সম্পর্কে তার মনে হচ্ছিল, যেন কিছু খবর তার থেকে গোপন করা

হচ্ছে। শনিবার দিন রাত্রে ফ্যানিকে যে সে রাস্তায় দেখেছিল, একথা সে যেমন ভাঙ্গে নি, তেমনই ফ্যানির সম্পর্কে অকথিত কিছু কাহিনী হয়তো গ্যাব্রিয়েল এবং বোল্ডউড চেপে গেছে। হঠাৎ তার ইচ্ছে হল তাকে বিপদে শক্ত করতে পারে এমন কারও সঙ্গে আলাপ করে। এমন বন্ধু তার কেই বা আছে, বাড়ীতে তো কেউ নেইই—একমাত্র গ্যাব্রিয়েল ওক ছাড়া আর কারও কথা তার মনে এল না। সে ভাবল গ্যাব্রিয়েলের কি অসীম সহ্যশক্তি! নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ তফাতে রেখে, তার ঘটনার বিশ্লেষণ বড় অপূর্ব। বাথশেবা মনে মনে নিশ্চিন্ত হল যে, ফ্যানি সম্পর্কে সে যা জানতে চায় তার সবই ওকের কাছে শোনা যাবে। সে যদি এই মুহূর্তে গিয়ে ওককে জিজ্ঞাসা করতে পারে প্রকৃত ঘটনাটি কি—তাহলে নিশ্চয়ই ওক না বলে পারবে না। আর সেটুকু জানতে পেলেই তার স্বস্তি। ওককে সে এত ভালভাবেই জানত, যে ওক নিশ্চয়ই তার এই অস্বাভাবিক খেয়ালী আচরণকে কিছুতেই ভীতিপ্রদ মনে করবে না।

গায়ে একটা ক্লোক চাপিয়ে বাথশেবা বেরিয়ে পড়ল। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। কুয়াশার ভারে বোধ হয় সব কিছু স্থাণু হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে হেঁটে সে কোগানের বাড়ী ছাড়িয়ে, গ্যাব্রিয়েলের দরজায় এসে দাঁড়াল। একটা জানালা থেকে আলো এসে পড়েছিল রাস্তায়। জানালার কবাট বন্ধ নয়, এমনকি পর্দাও নেই। একা মানুষ গ্যাব্রিয়েল তার গোপনীয় যেমন কিছু নেই তেমনই চোর ডাকাতের ভয় নেই। গ্যাব্রিয়েল বসে বসে পড়ছিল। একটা হাতের উপর মুখ রেখে একমনে পড়ছে। মাঝে মাঝে কেবল প্রদীপের আলোটা উস্কে দিচ্ছে। তারপর ঘড়িতে দেখল অনেক দেরী হয়ে গেছে। বই বন্ধ করে সে উঠে পড়ল। এখন সে শুতে যাবে। বাথশেবা ভাবল দরজায় টোকা দিতে গেলে এখনই দিতে হয়।

বাথশেবার কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হল। তার বিপদ এবং দুঃখের কথা আর কাউকে বলা ভাল লাগল না। ফ্যানির সম্পর্কে কৌতূহলও চেপে রাখাই ভাল, তার দুঃখ শুধু তাকে নিজেকেই বহন করতে হবে। গ্যাব্রিয়েলকে একটু পরে দেখা গেল, জানালায় আলোটা রেখে, সে হাঁটু গেড়ে বসল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে। বাথশেবার অন্তরের অস্থিরতা আর এই গভীর প্রশান্তি যেন দুই বিপরীত মেরুর জগৎ। সে কিছুতেই এই পরিবেশে আর দাঁড়াতে পারল না—নিজের বাড়ীতে ফিরে এল।

মাথায় হাত দিয়ে খানিকক্ষণ বসে চিন্তা করল বাথশেবা। অবশেষে মনে

মনে স্থির করল, রহস্য আমি ভেদ করবই। পাশের ঘর থেকে একটা স্ক্রু ড্রাইভার এনে সে শবাধারের স্ক্রুগুলো খুলে ফেলল। এতক্ষণের সমস্ত কৌতূহল ও দুশ্চিন্তার অবসান হল। খুব খারাপও কখনও কখনও স্বস্তির কারণ হয়, বাথশেবা স্বস্তি পেল। সেই সোনালী চুল, বিষাদমাখা মুখ ফ্যানি রবীন এবং যে আশঙ্কা সে এতক্ষণ করছিল মনে মনে, যে সংবাদ তার কাছে অব্যক্ত বাধা হয়েছিল, ফ্যানি সন্তান-সম্ভবা ছিল।

এমন এক ভয় বাথশেবাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, যে সে নিজের থেকে পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। একটা নিরাপদ আশ্রয়েব প্রয়োজন। কি করা যায়; ওকের প্রার্থনার দৃশ্য মনে ভেসে উঠল তার। নারীজাতি অনুকরণপ্রিয়। সেও ভাবল, হাঁটুগেড়ে বসবে এবং সম্ভব হলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবে।

শবাধারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে, দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকল বাথশেবা। ঘরের ভিতরটা তখন ঠিক যেন গোরস্থানের মত। নিছক যান্ত্রিক কারণেই হোক বা অন্তরের পরিশুদ্ধির জন্যেই হোক বাথশেবা যখন উঠল, তখন সে অনেকটা শান্ত। প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য, জানালার কাছেই ফুলদানি থেকে ফুল পেড়ে মৃত দেহটা সে বেশ করে সাজিয়ে দিল। কতক্ষণ সে এইসব করছিল, খেয়াল নেই। স্থান, কাল, জাগতিক সব চেতনা যেন লোপ পেয়ে গেছে। এমন সময়ে একটা গাড়ী এসে থামার শব্দ হল। সদর দরজা খুলে গাড়ীটা ভেতরে ঢুকল। একটু পরে তার স্বামী এসে দাঁড়াল এই ঘরের দরজায়, দুই চৌকাঠে দুই হাত দিয়ে। সব কিছু দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বাথশেবাও শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। ফ্যানি যে মারা যেতে পারে একথা ট্রয়ের একবারও মনে হয়নি। সে ভাবল বাড়ীর কেউ মারা গেছে।

বাথশেবা ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ট্রয় তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার? কে মারা গেছে?

—জানি না—আমাকে ফাঁকায় যেতে দাও, বাথশেবা উত্তর দিল।

—দাঁড়াও—বলে ট্রয় তার হাত ধরে ফেলল। বাথশেবা যেন তার সমস্ত সত্বা হারিয়ে ফেলেছে। নিজের কোন ইচ্ছা নেই আর। ট্রয় আর বাথশেবা দু'জনে হাত ধরাধরি করে শবাধারটির কাছে গেল।

বাতির আলোয় শবাধারের মধ্যে মা এবং তার সন্তানের চেহারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। ট্রয় ভাল করে তাকাল। চেতনা যেন তার লুপ্ত, স্ত্রীর হাত ছেড়ে দিয়ে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ দুজনেই নিশ্চল হয়ে থাকল।

—চেন তুমি একে ? বাথশেবার কথাগুলো যেন কোনও গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

—হ্যাঁ, চিনি।

—এই কি সে ?

—হ্যাঁ।

এতক্ষণ ট্রয় সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন যেন আস্তে আস্তে সামনে ঝুঁকে পড়তে লাগল। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ট্রয়—মুখে তার অনুতাপ আর শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুভূতি। নীচু হয়ে সে ফ্যানির গালে আলতো করে চুমু খেল। ঘুমন্ত শিশুর গালে যেমন ঘুম না ভাঙিয়ে চুমো খেতে হয়।

বাথশেবার অন্তরে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠল। ফ্যানির কাছে নিজেকে সে পরাজিত মনে করছিল অনেকক্ষণ থেকে। এখন আর তার আবেগ সে চেপে রাখতে পারল না। দুই হাতে ট্রয়ের গলা জড়িয়ে বলল—ও ফ্রাংক! আমি তোমাকে ওদের থেকে বেশী ভালবাসি—আমাকেও চুমু খাও।

বাথশেবার মত মেয়ের মুখে এই শিশুসুলভ সারল্য ও বেদনা বড় বেমানান লাগছিল। ট্রয় আস্তে আস্তে তার হাত দুটো আলগা করে, বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকল তার মুখের দিকে। এইসব মুহূর্তে নারীত্বের সনাতন রূপটি ফুটে ওঠে। ট্রয় বাথশেবার মধ্যে এখন তার গর্বিতা স্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছিল না। ফ্যানির আত্মাই হয়তো বাথশেবার এ আর্তির অনুপ্রেরণা কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল। সে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলল—না, আমি তোমায় চুমু খেতে চাই না।

—কেন ? বাথশেবার গলা অস্বাভাবিক রকমের দৃঢ় এবং নীচু যেন অন্য কারও কণ্ঠস্বর।

—কারণ ? কারণ আমি একটি দুশ্চরিত্র লম্পট।

—ও! আর এই মেয়েটি আমার মতই একটি শিকার।

—আঃ, বিরক্ত করো না। এই মেয়েটি আমার কাছে অনেক কিছু, যা তুমি নও, কোনদিন ছিলে না, হবেও না। কি এক কুক্ষণে তোমায় দেখে ভুলেছিলাম, নইলে আমি একেই বিয়ে করতাম। তোমাকে না দেখা পর্যন্ত আমার এই দুর্মতি হয় নি। এখন, এখন সব শেষ—এজন্যে আমার শাস্তি পাওয়া উচিত। তারপর ট্রয় ফ্যানির দিকে তাকিয়ে বলল—কিছু ভেবনা, ডার্লিং, ঈশ্বরের চোখে, ধর্মের চোখে, তুমিই আমার স্ত্রী।

এই কথার পরে বাথশেবা এমন এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল, যা হয়তো এই প্রাচীন ঘরে এর আগে আব কোনদিন পড়ে নি। হতাশভাবে সে বলল—তাহলে, তাহলে আমি তোমার কে?

—তুমি আমার কিছুই নও—ট্রয় নিষ্ঠুরভাবে উত্তর দিল। পুরুৎঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে মন্তর পড়লেই বিয়ে করা হয় না। তোমার সঙ্গে কোন দিনই আমার অন্তরের মিল হয় নি।

বাথশেবার কাছে এখন একটিই মাত্র রাস্তা খোলা ছিল—দূরে বহুদূরে মৃত্যুব দেশে পালিয়ে যাওয়া, সে ছুটে ঘর থেকে বেবিয়ে গেল অন্ধকাবেব বাজ্যে।

॥ ৩৭ ॥

বাথশেবা চলে গেলে ট্রয় শবাধারটি সযত্নে ঢাকা দিল। বাকী বাতটুক সে শোফার উপরে বসে কাটিয়ে দিল সকালের প্রতীক্ষায়।

সারাদিনে শরীর আর মনের উপরে অনেক ধকল গিয়েছে। ভাগ্যের পরিহাসে—তার ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তব একবারও মেলেনি। বাথশেবাব থেকে কুড়ি পাউণ্ড পাওয়ার পবে সে নিজের কাছে যেখানে যা ছিল, সব একত্র জড করল—মোট সাতাশ পাউণ্ড দশ শিলিং হ'ল—খুব ভোরে উঠে সে ফ্যানি রবিনের সঙ্গে 'অ্যাপয়েন্টমেণ্ট' রাখতে ঘোডা ছুটিয়ে দিল ক্যাষ্টারব্রিজের উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছে এক সরাইখানায় ঘোডা এবং গাড়ীটা বেখে দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে শহরেব প্রান্তে, ব্রিজের নীচে এসে দাঁড়িয়ে থাকল। নির্দ্ধারিত সময় চলে গেলেও ফ্যানির দেখা মিলল না। প্রকৃতপক্ষে ক্যাষ্টার-ব্রিজের লঙ্গরখানায় তখন তার মৃতদেহকে নতুন কাপড দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পনের মিনিট কেটে গেল। আধঘণ্টা কেটে গেল। ট্রয়ের পুরনো সব কথা মনে পড়তে লাগল। এই দ্বিতীয়বার ফ্যানি তার 'সীরিয়াস এনগেজমেণ্ট' রাখতে ব্যর্থ হ'ল। রাগ করে সে ভাবল, ফ্যানিকে আর কোনদিন কথা দেবে না। এগারটা পর্য্যন্ত সে ব্রিজের পাথরগুলো দেখতে লাগল—কোথায় কোথায় ছেৎলা পড়েছে। ঢেউয়ের চিকচিক দেখতে দেখতে সে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। সরাইখানায় ফিরে গিয়ে তার গাড়ী যুতে নিয়ে, অতীতের কথা ভুলে, ট্রয় যাত্রা করল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে। সে বাডমাউথের রাস্তা ধরল।

রেস-কোর্সে পৌছতে পৌছতে দুটো বেজে গেল। সেখান থেকে শহর ঘুরে, সে ন'টার আগে বেরুতে পারল না। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও শনিবারে সন্ধ্যেবেলায় দেখা ফ্যানির সে চেহারা ভুলতে পারে নি। বাথশেবার তিরস্কারের কথা মনে রেখে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল বাজী ধরবে না। —বাজী সে ধরল না।

তাই রাত্রে ফেরার সময় পর্যন্ত তার কয়েক শিলিং মাত্র খরচা হয়েছিল।

আস্তে আস্তে সে বাড়ীর রাস্তা ধরল। এতক্ষণে তার মনে হ'ল ফ্যানি হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে তাই কথা রাখতে পারেনি। সে ভাবল, ক্যাষ্টারব্রিজে থেকে, খোঁজখবর করা উচিত ছিল। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে, অতএব বাড়ী যাওয়াই ভাল।

ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রয় উঠে পড়ল। বাথশেবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা অবান্তর বিবেচনা করে সে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। গীর্জার প্রাঙ্গনে গিয়ে খুঁজে খুঁজে দেখল—একটি সন্থ খোঁড়া গর্ত—নিশ্চয়ই ফ্যানিকে মাটি দেওয়ার জন্যে আগের দিনে করা হয়েছে। জায়গাটা দেখে নিয়ে সে তক্ষুণি ক্যাষ্টারব্রিজের দিকে রওয়ানা দিল। পথে, যেখানে ফ্যানির সঙ্গে আগের দিন দেখা হয়েছিল, সেখানে মাত্র দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ।

শহরে পৌছে সে এক মার্বেল পাথরের দোকানে গেল। পাথরে অনেক নাম খোদাই করা রয়েছে—যাদের হয়তো এখনো মৃত্যু হয়নি। অনেক খুঁজে পেতে সে একখানা পাথর পছন্দ করল। তারপর দরদস্তুর করে ঠিক করল—সাতাশ পাউণ্ডের মধ্যে নাম খোদাই করে, মিস্ত্রি গিয়ে, ওয়েদারবেরীর চার্চের প্রাঙ্গনে ফ্যানি রবিনের কবরে, পাথরটি লাগিয়ে দিয়ে আসবে। তারপর ট্রয় যে কথাগুলো খোদাই করতে হবে তা লিখে দিয়ে, পয়সাকড়ি মিটিয়ে চলে গেল। বিকালবেলা আবার এসে দেখল—খোদাইয়ের কাজ প্রায় শেষ—শেষ হওয়া পর্যন্ত সে বাইরে বসে থাকল। মিস্ত্রিদের গাড়ী ঠিক করে রওনা করে দিয়ে সে ওয়েদারবেরীর রাস্তা ধরল। ক্যাষ্টারব্রিজ যখন সে ছাড়াল, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে—হাতে তার বিরাট একঝুড়ি—তার মধ্যে নানারকম ফুল এবং লতাপাতার গাছ। এই দীর্ঘপথ হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল ট্রয়। মিস্ত্রিরা কাজ সেরে ফেরার সময় তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে। ট্রয় তাদের জিজ্ঞাসা করে জানল যে, কবরটি গাঁথা হয়ে গেছে এবং পাথর বসানো হয়েছে।

ওয়েদারবেরী পৌছতে তার রাত দশটা বেজে গেল। কবরের কাছে ঝুড়িটা

নামিয়ে রেখে সে একটা লণ্ঠন আর কোদাল জোগাড় করে নিয়ে এল। কবরটার চারপাশের মাটি কুপিয়ে নিয়ে কত বাহারী ফুলের গাছ বসাল— হায়াসিন্থ, ক্রোকাস, ফরগেট-মি-নট, কত বাহারী ফুল—বাহারী কত নাম তাদের। ডেইজি, স্নোড্রপ—কেউ ফোটে বসন্তের গোড়ায় আবার কারনেশন, মেঠো লিলি যারা ফোটে গ্রীষ্মের শেষে। আগেকার অবহেলার অনুতাপে দগ্ধ হয়ে রোমান্টিকতার এই আতিশয্য যে নিতান্তই অর্থহীন--এমন কোনও ধারণা ট্রয়ের মনে উদয় হয় নি। রাত কত হয়েছিল খেয়াল নেই। আকাশে মেঘের আনাগোনা চলছিল সন্ধ্যে থেকে –হঠাৎ যেন হুড়মুড় করে বৃষ্টি এল। অসমাপ্ত সাজসজ্জা ফেলে রেখে ট্রয় গীর্জার বারান্দায় গিয়ে উঠল।

গত দু রাত্রি ট্রয়ের এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি। শারীরিক এবং মানসিক ক্লান্তি এত চরমে পৌঁছেছিল যে তার ঘুম আসতে দেরী হ'ল না। সারারাত্রি বৃষ্টির তাণ্ডবে কি যে ঘটে গেল ট্রয় টের পেল না। সকাল হলে ঘুম থেকে উঠে সে কবরের দিকে গেল। গত রাত্রেও রাস্তায় হাঁটতে পায়ে লাগছিল পাথরের ছোট ছোট নুড়ি—আজ তার উপরে নরম কাদার একটা প্রলেপ পড়ে গেছে। আর সেই কাদার মধ্যে তার গতকালের কেনা ফুল সব মাখামাখি। কবরের কাছে এসে দেখে, নরম খোঁড়া মাটিতে সে যত গাছ পুঁতেছিল—সব ভূমিশয্যায় শায়িত। সারা বাগানের জলের ধারা তখনও বয়ে আসছে দূর থেকে। ফ্যানির কবরে সৃষ্টি হয়েছে এক বিরাট গর্ত। জল এসে পড়ছে তার মধ্যে। আওয়াজটা বড় বিচিত্র, ঠিক গরম জল ফোটার মত। টগবগ করে আওয়াজ হচ্ছে—আর রাজ্যের জল গিয়ে জমা হচ্ছে সেই নরম মাটির পথে কোন এক অজানা আস্তানায়। ট্রয়ের মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

কিন্তু দুঃখকে মুলতুবী করে রাখার এক অদ্ভুত শক্তি ছিল তার। কবরে মাটি ঢাকা দিতে আর বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে হচ্ছিল না। ট্রয় সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল আবার অনির্দিষ্টের পথে।

একটু বেলা হলে লিডি উপরে এসে বাথশেবাকে বলল—ম্যাডাম! রাত্তিরে ভয়ানক বৃষ্টি হয়েছে। একবার গীর্জায় গিয়ে দেখলে হ'ত—ফ্যানির কবরের অবস্থা কি হয়েছে?

বাথশেবার ভয় ছিল ট্রয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কিনা। সে জিজ্ঞাসা করল—মিঃ ট্রয় কি রাত্তিরে এসেছিলেন?

—না, তিনি বোধহয় বাডমাউথে গেছেন।

—কেন, এ খবর কোথা থেকে পেলি ?

—লাবান টল তাঁকে বাডমাউথের রাস্তায় দেখেছিল আজ ভোরবেলা।

বাথশেবার যেন একটা ভয় কেটে গেল। অন্ততঃ এক্ষুনি তাকে ট্রয়ের মুখোমুখি হতে হবে না। আর একটু পরে লিডি এবং বাথশেবা দুজনে গোরস্থানে গেল। দূর থেকে দেখা গেল গ্যাব্রিয়েল ফ্যানির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে কি দেখছে। রাতারাতি যে কবরের অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে সেটা তাদেরও দৃষ্টি এড়াল না—এবং গ্যাব্রিয়েলের দৃষ্টি অনুসরণ করে বাথশেবার চোখ আটকে গেল এই লেখাগুলোয়—"ফ্যানি রবিন এর পুণ্যস্মৃতিতে ফ্রান্সিস ট্রয় কর্তৃক নির্মিত হইল।"

ওক বাথশেবার দিকে তাকিয়ে দেখছিল—ঘটনাটি সে কিভাবে গ্রহণ করে কিন্তু সে জানত না যে বাথশেবার কাছে এ সত্য আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে। বাথশেবা তার দিকে তাকিয়ে সাধারণভাবে 'গুডমর্ণিং' বলে সম্ভাষণ করল—ওক তখন কোদাল দিয়ে কবরের মাটিগুলো টেনে দিতে ব্যস্ত। বাথশেবা ফুলগুলো কুড়িয়ে এনে সাজিয়ে দিল কবরের উপর, আর গ্যাব্রিয়েলকে বলল গীর্জার মালীকে ডেকে বলে দিতে, যে তারা যেন নালা কেটে জলের স্রোতটাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়। তারপর বাথশেবা সেই মার্বেল পাথরের উপর কাদার ছিটের দাগগুলো জল দিয়ে সযত্নে মুছে দিল—সমস্ত ঈর্ষা ও সঙ্কীর্ণতা ভুলে বাথশেবার হৃদয় যেন আকাশের মত উদার হয়ে গিয়েছিল।

ট্রয় সেই ভোরের আলো ফোটার আগেই বেরিয়ে পড়েছিল, নির্দ্দিষ্ট কোনও গন্তব্যস্থল ছিল না তার। একজন ফার্মারের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি-জনিত বিতৃষ্ণা, গীর্জার অঙ্গনে শায়িতা নারীর বিষণ্ণস্মৃতি, অনুতাপ এবং তার স্ত্রীর সমাজের প্রতি তার তীব্র অনীহা, সব মিলে তাকে ঘরছাড়া করেছিল - ওয়েদারবেরী ব্যতীত অন্যকোন জায়গায় তার স্থান খুঁজে নেওয়ার জন্যে। সোজা দক্ষিণ দিকে চলতে চলতে বিকেল তিনটে নাগাদ সে সমুদ্রের তীরে এক টিলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাহাড়টা প্রায় মাইলখানেক লম্বা, উঁচু হয়ে উঠে গেছে—সমুদ্র আর তার ফেলে আসা জগতের মধ্যে বেশ একটা ব্যবধান রচনা করেছে। দৃষ্টিগোচর আকাশ, মাটি, বা সমুদ্রে কোনও সচল বস্তু চোখে পড়ল না, শুধু দুধের মত সাদা ফেনরাশি লাইন দিয়ে আছড়ে পড়ছিল একটার পর একটা—সমুদ্রের পাড় ধরে যতদূর চোখ যায় ততদূর।

ট্রয় যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, জায়গাটা একটা খাঁড়ির মত। ট্রয় ভাবল

আরও এগুনোর আগে এখানে নেমে স্নান করে ক্লান্তি দূর করবে। জামাকাপড় ছেড়ে সে জলে নেমে পড়ল। এখানটা পুকুরের জলের মতো স্থির। এ জলে তরঙ্গ নেই। তাই ট্রয় ঢেউয়ের আকর্ষণে সঙ্কীর্ণ প্রণালীটুকু পেরিয়ে বিশাল সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ল। আচমকা এক অচেনা ঢেউয়ের টানে সে ভেসে গেল মহাসমুদ্রের মধ্যিখানে। হঠাৎ তার খেয়াল হল—কাজটা ভাল হয় নি। আগেকার অসংখ্য স্নানার্থীর মত তারও কপালে হয়তো জলে ডুবে মৃত্যুই লেখা আছে। আশেপাশে একটা নৌকাও চোখে পড়ছে না। শুধু বহুদূরে বাডমাউথ বন্দরের দড়িদড়া জেটি ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। সাঁতার কাটতে কাটতে ক্লান্ত হয়ে ট্রয় কোনরকমে জলের উপর ভেসে থাকার চেষ্টা করল। যতই সে তীরের দিকে এগুনোব চেষ্টা করছিল ততই যেন ঢেউয়ের আঘাতে মাঝদরিয়ার দিকে সরে যাচ্ছিল। দিনের আলো নিভে আসছে। তীরে পৌছনোর এবং বেঁচে থাকার যাবতায় আশা যখন সে ত্যাগ করতে বসেছে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায়, যেন একটি পালতোলা নৌকা চোখে পড়ল। টিঁকে থাকার জন্য সংগ্রামের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল তার। কোনরকমে ডান হাত দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে সে বাঁহাত উঁচু করে ধরল, আর প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল। ঢেউয়ের দোলায় কাঁপতে কাঁপতে নৌকোটা তার দিকেই আসছিল। মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যেই নৌকোর আরোহীদের নজরে পড়ল সে। তাড়াতাড়ি নৌকোটা কাছে এনে দুজন লোক মিলে টেনে তাকে উপরে তুলল। তাদের কাছে যে যৎসামান্য পোষাক আশাক ছিল তার কিছু তারা ট্রয়কে দিল। রাত্রির হিম পড়তে শুরু করেছে। এতক্ষণ জলে থেকে ট্রয়ের কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল।

নৌকোটা আস্তে আস্তে বাডমাউথের দিকে এগুতে লাগল। এতক্ষণ অস্পষ্ট বাতিগুলো সমুদ্রের জলের উপর লম্বা তরোয়ালের মত আলো ফেলছিল। আলোগুলো স্পষ্টতর হল। নৌকোর দাঁড়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। আরও কিছুক্ষণ পরে নৌকোটা এসে বাডমাউথের তীরে ভিড়ল।

ট্রয়ের কাছে সমাজ, সংস্কার ইত্যাদির যাও বা মূল্য ছিল এতদিন, এখন সব কিছু হারিয়ে সে যথার্থ পথিকে পরিণত হল।

॥ ৩৮ ॥

বাথশেবা তার স্বামীর অদর্শন ও অপ্রত্যাবর্তনে ধীরে ধীরে ধাতস্থ হয়ে আসছিল। যুগপৎ বিস্ময় ও স্বস্তির মধ্যে তার আশা ছিল—ট্রয় একদিন না একদিন ফিরবে। স্বামীর সম্পর্কে সে একেবারে উদাসীন হয়ে যায় নি বা বিবাহ-বন্ধনও অস্বীকার করবার ইচ্ছা ছিল না তার। তাছাড়া বিবাহের উপযোগিতাও ছিল তার কাছে। কারণ তার কাকার 'উইল' অনুসারে যদিও সে এই বিরাট ফার্মের উত্তরাধিকারিনী হয়েছিল কিন্তু মহিলা ফার্মার হিসেবে লীজ সংক্রান্ত কিছু আইনের জটিলতা দেখা দিয়েছিল এ ব্যাপারে। তাই বাথশেবা পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছিল এবং তার দৃঢ় আশা ছিল ট্রয় একদিন ফিরে এলে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

তারপরের শনিবার ক্যাষ্টারব্রিজের হাটে গেল বাথশেবা একাই। বিয়ের পর থেকে সে হাটে বাজারে একা বেরুত না। বাথশেবা হাটের মধ্যে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াচ্ছিল আর জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করছিল। একজন অপরিচিত ফার্মার তার পিছনেই অপর একজনকে জিজ্ঞাসা করল—আমি মিসেস ট্রয়কে খোঁজ করছি—ইনিই কি সেই ভদ্রমহিলা?

—হ্যাঁ, ইনিই বোধ হয়। উদ্দিষ্ট ফার্মার উত্তর দিল।

—একটা দুঃসংবাদ দিতে হবে আমাকে, ওঁর স্বামী জলে ডুবে মারা গেছেন।

বাথশেবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ সংবাদ সত্য হতে পাবে না। কিন্তু কথা-গুলো তার কাছে বজ্রাঘাতের মত মনে হল। চোখ অন্ধকার হয়ে এল, আতঙ্কে চীৎকার করে পড়ে গেল সে। কিন্তু মাটিতে পড়ার আগেই আর একজন ফার্মার এসে তাকে ধরে ফেলল। সে ফার্মার বোল্ডউড। দূর থেকে সে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল।

—কি হয়েছে? বোল্ডউড সেই অপরিচিত ফার্মারকে জিজ্ঞাসা করল।

—ওঁর স্বামী গত সপ্তাহে লালউইণ্ডের খাঁড়িতে জলে ডুবে মারা গেছেন—একজন চৌকিদার তাঁর জামাকাপড় দেখতে পেয়ে গতকালকে বাডমাউথে নিয়ে এসেছিল।

বোল্ডউডের চোখে যেন হঠাৎ আলো জলে উঠল—বাজারের সকলের দৃষ্টি বোল্ডউড এবং বাথশেবার উপর এসে আটকে গেল। বোল্ডউড তাকে পাঁজা-

কোলা করে বাইরে নিয়ে এল। বাথশেবা তখন অচেতন। একটা দোকানে এনে তাকে ভেতরের একটা ঘরে শুইয়ে দেয়া হল। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরে এলে, বাথশেবা চোখ খুলল। সব কিছু মনে পড়ল তার। প্রথমেই সে বলল, আমি বাড়ী যাব।

বোল্ডউড ঘরের বাইরে গেল। বাথশেবা যখন তার কোলের মধ্যে, সেই স্বর্গীয় মুহূর্তগুলো স্মরণ করে তার মন আনন্দে ভেসে যাচ্ছিল। বাথশেবা জানল কিনা তাতে কিছু আসে যায় না। সে যে তার বুকের কাছে এসেছিল এটাই তার যথেষ্ট আনন্দ। বোল্ডউড একটা মেয়েলোককে ভেতরে পাঠিয়ে, বাইরে গেল। বাথশেবার গাড়ী যুতে দেওয়ার কথা বলে, সে একজন গাড়োয়ানের খোঁজ করতে গেল।

বাথশেবার কোনও গাড়োয়ান নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। তখন বোল্ডউড তাকে নিজের ফিটন গাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিল। কিন্তু বাথশেবা তাতেও রাজী হল না। আধঘণ্টাটাক পরে সুস্থ হয়ে সে নিজেই গাড়ী চালিয়ে ফিরে গেল ওয়েদারবেরী। বাইরের রূপে কিন্তু তার অন্তরের আলোড়নের কথা কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

বাথশেবা পৌছনোর আগেই ওয়েদারবেরীতে খবর চলে গিয়েছিল। লিডি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বাথশেবার মুখের দিকে, কিন্তু বাথশেবার কিছু বলবার ছিল না।

ওপরে গিয়ে সে অনেকক্ষণ জানালার ধারে বসে বসে চিন্তা করতে লাগল। একটু রাত হলে, লিডি এসে দরজায় টোকা দিল। সে ভেতরে এলে, বাথশেবা বলল— কি খবর লিডি?

—বলছিলাম, তুমি জামাকাপড় পাল্টাবে না? লিডি ইতস্ততঃ করে বলল।

—কেন?

—অশৌচ।

—না, না, না, বাথশেবা জোরের সঙ্গে বলল—সে বেঁচে আছে।

লিডি বিস্মিত হল, জিজ্ঞাসা করল, কি করে জানলে?

—জানি না এখনও, তবে মারা গেলে নিশ্চয়ই আরও কিছু জানা যেত। আমার স্থির বিশ্বাস, সে এখনও বেঁচে আছে।

সোমবার পর্য্যন্ত বাথশেবার বিশ্বাসে নড়চড় হল না। সেদিনই স্থানীয় সংবাদপত্রে একটা খবর চোখে পড়ল, মিঃ ট্রয়ের ডুবে যাওয়ার বিস্তারিত বিবরণ

দিয়ে। সেই সঙ্গে একজন লোক ট্রয়ের জামাকাপড় এনে হাজির করল সনাক্ত করণের জন্য। ট্রয়ের নোটবুক এবং অন্য যাবতীয় জিনিসপত্র দেখে সকলের ধারণা হয়েছিল, যে ট্রয় স্নান করতে নেমেছিল সমুদ্রে—তারপর স্রোতের টা ভেসে গেছে।

সকলেই যখন স্থির নিশ্চিত, বাথশেবা আর সন্দেহ বাঁচিয়ে রাখতে পাব না। তার মনে হল, হয়তো পরলোকে ফ্যানির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে ট্র আত্মহত্যা করেছে। সন্ধ্যের পর একা একা হলে বাথশেবা ট্রয়ের সেই কৌটো বার করে, ফ্যানির চুলের গোছাটা দেখল, ভাবল, যাক দুজনে দুজনকে ভালবাসত, দুজনে যদি সুখী হয়ে থাকে ভাল।

॥ ৩৯ ॥

শীত বড় দ্রুত এগিয়ে এল। এখন পাতা বেরুবার সময়। বাথশেবার সম সন্দেহ দূর হয়ে এখন এক নীরবতা নেমে এসেছে। কিন্তু এই নীরবতাকে শান্তি বলা যায় না। ফার্মের কাজ আগের মতই চলছে—শুধু বাথশেবা আ আগের মত নেই। লাভ লোকসানের চিন্তা তাকে আর বিচলিত করে না মঝে মাঝে অতীতের কথা চিন্তা করে সে আনমনা হয়ে যায়।

বাথশেবার এই অনাসক্তির অবশ্যি একটা নীট ফলাফল হল—গ্যাব্রিয়ে ওকের 'বেলিফ' পদে উন্নতি। দেখাশুনা সে আগে থেকেই করতে থাকলে পরিচয় ছিল তার শেফার্ড হিসেবেই আর বেতনও ছিল কম। এখন পদোন্নতি সাথে সাথে আর্থিক লাভও হল বেশ।

বোল্ডউড নির্জনে, অকর্মন্যভাবে দিন কাটায়। তার গম এবং বার্লি বেশ ভাগই সেই প্রচণ্ড বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন সেই গমের দানা থেকে ছোট ছোট চারা বেরিয়ে সারা উঠোন থিকথিক করছে। কিন্তু শূকরের খা ছাড়া তা দিয়ে আর কিছু হবার নয়। এই অবহেলা আর অপূরণীয় ক্ষতির কথ এখন সমস্ত লোকের মুখে মুখে ফেরে। ভুলে যাওয়ার অজুহাত আদপেই টি নয়, কারণ অধস্তন কর্মচারীদের পক্ষে যতবার সম্ভব, ততবারই বোল্ডউডকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল। এখন যেন ক্ষতির সম্পর্কে চেতনা ফিরছি বোল্ডউডের। সে একদিন সন্ধ্যেবেলা গ্যাব্রিয়েলকে ডেকে পাঠাল। বাথশে সম্প্রতি তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করার কারণেই হোক বা অন্য যে জন্যেই হো

গ্যাব্রিয়েলকে সে প্রস্তাব দিল তার ফার্মেরও দেখাশুনা করবার জন্যে, কারণ আর কোনও যোগ্য এবং বিশ্বাসী লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। গ্যাব্রিয়েলের কুগ্রহ বোধ হয় কেটে যাচ্ছিল খুব তাড়াতাড়ি।

ঐ বিষয়ে ওক যখন বাথশেবার পরামর্শ চাইল বাথশেবা প্রথমে রাজী হয় নি। কারণ, একজন লোকের পক্ষে দুটো ফার্মের এত কাজ তত্ত্বাবধান করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। বোল্ডউড যেহেতু লাভ লোকসান বিচারের থেকেও ব্যক্তিগত কারণে আর পেরে উঠছিল না, সে প্রস্তাব দিল—গ্যাব্রিয়েলকে একটা ভাল ঘোড়া দেওয়া হবে তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে। এবং ফার্ম দুটোই যেহেতু পাশাপাশি, নিজের একটা ঘোড়া থাকলে, গ্যাব্রিয়েলের পক্ষে দুটো কাজই চালিয়ে নিতে কিছু অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বোল্ডউড এসব কথা অবশ্যি নিজে বাথশেবাকে বলে নি। গ্যাব্রিয়েলের মাধ্যমেই বলেছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থায় আসা গেল। গ্যাব্রিয়েলকে এখন এই দু হাজার একর ব্যাপী বিশাল দুই ফার্মের এখানে ওখানে হেঁটে বেড়াতে হয় যেন এ সবই তার নিজের সম্পত্তি।

খুব শীগগিরই গ্রামে এ কথা রটতে দেরী হল না যে গ্যাব্রিয়েল বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। সুসান টল একদিন বলছিল, কি ভাবো কি তোমরা! গেবল ওক এখন হপ্তায় দু তিনদিন নতুন জুতো পরে। একটাও তালি নেই তাতে। আর রোববার হলেই মাথায় উঁচু টুপি, আমি তো শুধু তাকিয়ে দেখি ভাই!

একথা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, গ্যাব্রিয়েল বাথশেবার থেকে কেবল নির্দিষ্ট একটি বেতন নিত। কিন্তু বোল্ডউডের সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছিল ফসলের ভাগ নেওয়ার। লভ্যাংশটা খুব অল্প নয়, নিছক বেতনের থেকে শতগুণে তফাৎ। ওক অবশ্যি তাব পুরনো বাড়ি এবং পুরনো চালচলন ত্যাগ করে নি। শুধু পুরনো বলেই যেন আঁকড়ে ছিল সেগুলো। সে নিজেই নিজের জামায় বোতাম পরাত এবং নিজেই নিজের বিছানা পাতত। কারও কারও বিচারে তাই সে ছিল 'কাছের লোক'।

বোল্ডউডের মনে এখন একটা গোপন আশা উঁকিঝুঁকি মারত। সরষের দানার মত ক্ষীণ যে সম্ভাবনাকে সে এতদিন মনে মনে নাড়াচড়া করেছে। মধ্যবয়সী লোকদের কাছে বাথশেবা এখন আরও পরিণত, তাই অনেক বেশী সুন্দর। তার সেই চোখধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য স্তিমিত হয়ে এসেছে, সৌন্দর্যের সঙ্গে গৃহিনীপনার এক অপূর্ব মিলন হয়েছে। ইতিমধ্যে মাস দুয়েকের জন্যে

বাথশেবা নরকুম্বে তার বুড়ো পিসির কাছে বেড়াতে গিয়েছিল। আবেগতাড়িত বোল্ডউডের কাছে এই একটা সুযোগ এল, তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার।

একদিন বিকেলবেলা লিডি মাঠে কিছু কাজকর্ম করছিল। বোল্ডউড এগিয়ে এসে বলল—তোমাকে যে আজ বাইরে দেখছি, লিডিয়া ?

লিডি একটু মুচকি হাসল। সে ভাবতে পারে নি এই বৃদ্ধ ফার্মার তার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করবে।

—মিসেস ট্রয় ভালভাবে ফিরেছেন তো ?—বাথশেবার কোনও অনুৎসুক প্রতিবেশীও এর থেকে বেশী উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারত না।

—হ্যাঁ।

—তোমার সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলেন তো ?

—না, এখনও ঠিক তত—

—কিছু কিছু বলেন তো ?

—হ্যা, তা বলেন।

—তোমার উপরে উনি খুব নির্ভর করেন —করাই তো স্বাভাবিক।

—তা করেন, ওঁর সমস্ত বিপদ আপদেই পাশে পাশে ছিলাম তো। মিঃ ট্রয় চলে যাওয়ার সময়েও—উনি যদি আবার বিয়ে করার ইচ্ছা করেন, তাহলেও থাকতে হবে।

—তোমাকে বলেছেন বুঝি, হ্যাঁ। তা তো বলতেই পারেন—বোল্ডউড চতুর প্রেমিকের মত কথাটা বার করে নিতে চাইল।

—না, তা কিছু বলেন নি—আমি নিজেই ভাবছিলাম।

—ও আচ্ছা। যদি কখনও কথা তোলেন, তুমি আমার কথা বলতে পার।

—না, তিনি কখনই অমন কথা তোলেন না—লিডির মনে হচ্ছিল মি বোল্ডউড কেমন যেন বোকা বোকা হয়ে গেছেন।

—হুঁ, না বললে অবশ্যি তোমার পক্ষে কথা পাড়া ঠিক নয়।

—উনি অবশ্যি একদিন বলছিলেন, মিঃ ট্রয় আর না ফিরে এলে, বছর সাতেক পরে উনি বিয়ের কথা ভাববেন।

—তার মানে আরও ছ'বছর পরে। কোন দরকার নেই—উনি এখনই বিয়ে করতে পারেন—যে কোন বুদ্ধিমান লোকে তাই বলবে। ট্রয় নিশ্চিতই মারা গেছে। তার ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই—উকিলরা যাই বলুক না কেন।

—আপনি বুঝি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?

—না, তা করি নি—বোল্ডউড লজ্জিত হয়ে পড়ছিল। নিজের উপরে বিরক্ত হয়ে সে লিডির কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। এই প্রথম তাকে তার মর্য্যাদার আসন থেকে নীচে নেমে আসতে হল। বেচারী বোল্ডউড এর থেকে ভাল প্রেমের ছলাকলা জানত না। নিজের বোকামি এবং সঙ্কীর্ণতার কথা ভেবে নিজেই সে লজ্জাবোধ করছিল। অবশ্যি একটাই তার সান্ত্বনা ছিল, যে সে লিডিকে বোঝাতে পেরেছে—ছ'বছর পরেও ইচ্ছা করলে তাকে বিয়ে করতে পারে বাথশেবা। ছ'বছর অবশ্যি খুবই দীর্ঘ সময়, কিন্তু কোনদিন না হওয়ার তুলনায় কিছু নয়। তার জীবন থেকে ছ'টি বছর সে কয়েক মিনিটের মত খরচা করে ফেলবে—বাথশেবার প্রেমের তুলনায় সময়ের দীর্ঘতা সম্পর্কে এমনই ছিল তার ধারণা। বোল্ডউড আশা করছিল, লিডির সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বাথশেবা হয়তো তার হৃদয়ের কথা খুলে বলে নি, কিন্তু তার ধারণাগুলো মোটামুটি ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। তাই ছ'টি বছরে পরে বাথশেবা খুব সম্ভবতঃ তাকে বিয়ে করতে পারে।

ইতিমধ্যে গ্রীষ্মকালের গোড়ায়, গ্রীণ হিলের মেলা এসে পড়ল। গবাদি পশু, ভেড়া ইত্যাদি বিক্রির জন্যে এতদঞ্চলের মধ্যে এই মেলাই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। ওয়েদারবেরীর লোকেরাও তাই প্রতিবছরই এই মেলায় হাজির হত।

॥ ৪০ ॥

গ্রীনহিল জায়গাটা দক্ষিণ ওয়েসেক্স এর এক পাহাড়ের চূড়ায় কিছুটা সমতল অংশ। চারিদিকে পাহাড়ের দেয়াল উঠে গেছে। মধ্যিখানে শ্যামল প্রান্তর। প্রায় পনেরো কুড়ি একর বিস্তৃত। ইতস্ততঃ এক আধটা স্থায়ী আবাসস্থান দেখা গেলেও পুরো মাঠটার আর কোথাও আচ্ছাদন নেই। দেশ-দেশান্তর থেকে শেফার্ডরা তাদের ভেড়ার পাল নিয়ে আসে এবং এই খোলা আকাশের নীচে রাত কাটিয়ে দেয়। বহু দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে এখানে বেচা এবং কেনা দুই কারণেই। কোন কোন শেফার্ডকে এমনকি সাতদিন আগে থাকতে রওয়ানা দিতে হয়—পথে ভেড়ার পাল নিয়ে এখানে সেখানে রাত কাটাতে হয়। ওয়েদারবেরীর ফার্ম অবশ্য এখান থেকে অতদূরে নয়। বাথশেবা এবং ফার্মার বোল্ডউড দুজনের ফার্ম মিলিয়ে এক বিরাট সংখ্যক ভেড়ার পাল

চলল মেলায়, কেইনবল এবং বোল্ডউডের শেফার্ডদের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্যাব্রিয়েল গেল তাদের সঙ্গে। আর পেছন পেছন চলল তার পুরনো কুকুর—বুড়ো জর্জ।

গ্রীনহিল পাহাড়ের মাথায়, আঁকা বাঁকা ঘোরানো পথে পিলপিল করে উঠে আসছিল অসংখ্য ভেড়ার পাল। সকালবেলার বাঁকা রোদ্দুরে বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তাদের। শ'য়ে, শ'য়ে, হাজারে হাজারে, অগণ্য তাদের সংখ্যা। খয়েরী, বাদামী, লাল, আকাশী, নীল, কত বা তাদের রংয়ের বাহার—কারও শিং আছে, কারও শিং নেই—গুটি গুটি গুটি গুটি সব হাজির হ'ল সেই মাঠের মধ্যে। মানুষগুলো কেউ চেঁচাচ্ছে। কুকুরগুলো নতুন উৎসাহে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। কিন্তু যাদের ঘিরে এই উৎসব—তারা নির্বিকার। এই দীর্ঘপথের যাত্রায় তাদের সমস্ত ভয় কেটে গেছে। শুধু এই অবাঞ্ছনীয় অভিজ্ঞতায় নিতান্ত অরাজী হয়ে কোথাও কোথাও দু'একটা ভেড়া করুণভাবে বা—অ্যা—করে উঠছে।

বেলা বেশী ওঠার আগেই এই হাজারে হাজারে ভেড়াগুলোকে আলাদা আলাদা খোঁয়াড়ে পুরে ফেলা হ'ল, এক এক জাতের ভেড়া এক একদিকে। আর প্রতিটা খোঁয়াড়ের কোণে তাদের প্রহরী কুকুরটি একটা খুঁটোয় বাঁধা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেশ বিদেশের লোক ছেয়ে গেল মেলার প্রাঙ্গনে। প্রতিটা খোঁয়াড়ের পাশে পাশেই লোক—ক্রেতা এবং বিক্রেতা।

পাহাড়ের অন্যপ্রান্তে দুপুরবেলা থেকেই আর এক নাটক শুরু হয়েছিল। একটা গোল পেল্লায় সাইজের তাঁবু পড়েছে। বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই অসংখ্য ভেড়ার মালিকানা যতই বদল হয়ে যাচ্ছিল—শেফার্ডেরা ততই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছিল ঐ তাঁবুর দিকে—সেখানে বসেছে এক সার্কাস। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই তাঁবুর চারিদিকে ভিড় উপচে পড়ল—জোসেফ পুয়োরগ্রাস আর জ্যান কোগানও ভিড় করেছিল মজা দেখার জন্যে।

—এই হাভাতেটা আমায় ঠেলছে—একটা মেয়েছেলে কোগানের দিকে তাকিয়ে বলল।

—পেছন থেকে চাপ আসছে দেখতে পাচ্ছনা—কোগান কোনরকমে পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দিল—ভিড়ের চাপে তার শরীর সামনের মেয়েদের গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে।

বড় তাঁবুটার পেছন দিকে দুটো ছোট ছোট তাঁবু—একটা বেটাছেলে ওস্তাদদের কাপড় জামা পরার জন্যে—আর একটা মেয়েদের। বেটাছেলেদের তাঁবুটাতে বসেছিল সার্জেণ্ট ট্রয়। এই সার্কাস পার্টির সঙ্গে দেশবিদেশ ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে এই মেলায় এসে হাজির হয়েছে। ছোরাখেলা, তরোয়ালের লড়াই, ঘোড়ায় চড়া আর জিমন্যাষ্টিকের খেলায় সে'ই সেরা ওস্তাদ। বাড়ী ফেরার কথা বা তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা সে একবারও ভাবতে পারে নি—কারণ ঐ তেজী মহিলার অনুগত হয়ে চলার পাত্র সে ছিল না। তাছাড়া এতদিনে তার ফার্মের অবস্থা কি হয়েছে তার ঠিক নেই—হয়তো বন্ধই হয়ে গেছে লোকসানের ধাক্কায়। তাহলে তো স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্বও তাকে নিতে হবে। ফ্যানির চিন্তা তাকে সবসময় মনোকষ্ট দিত—এইসব লজ্জা, দুঃখ এবং বিরক্তি মিশ্রিত কারণে সে ওয়েদারবেরীতে ফেরার চিন্তা মুলতুবী রেখেছিল, হয়তো একেবারেই ত্যাগ করত যদি অন্য কোথাও ঐরকম একটি তয়ের সম্পত্তি নিয়ে ঘর বাঁধতে পারত। অবশেষে মহাকালের কি খেয়ালে সে এসে হাজির হল এই গ্রীনহিলের মেলায়।

বাথশেবাও মেলায় এসেছিল। তার গাড়ী চালিয়ে এনেছিল জোসেফ পুয়োরগ্রাস। একজন মিঃ ফ্রানসিস এর অদ্ভুত তরোয়ালের খেলার কথা বাথশেবার কানেও পৌছল। খেলা দেখার আগ্রহ ছিল তার। তাই মেলায় এসে এমন সুযোগ হাতছাড়া করবার ইচ্ছা করল না। বোল্ডউড সারাদিন ধরে তাকে চোখে চোখে রেখেছিল। কখন ফাঁকায় দুটো কথা বলতে পারবে। লোকজন সরে গেল সে এসে বলল—

—বিক্রীবাটা কেমন হ'ল মিসেস ট্রয়?

লজ্জায় বাথশেবার চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠল।

কোনরকম সে উত্তর দিল—আমাদের সব বিক্রী হয়ে গেছে, বেশী দেরী করতে হয় নি।

—তা'লে মিটে গেছে সব?

—হ্যাঁ, কেবল একজনের কাছে কিছু টাকা বাকি। সে দুঘণ্টা সময় নিয়েছে, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সার্কাস পার্টির কথা শুনছি। তরোয়ালের ত্রিফলা খেলাটা নাকি দারুণ দেখায় এরা।

—দেখতে চাইলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি, একেবারে বসে।

বাথশেবা ইতস্ততঃ করছে দেখে, সে বলল—আমি অবশ্যি দেখব না। আমি

আগেও দেখেছি ত্রিফলার খেলা।

বাথশেবার দেখবার ইচ্ছা ছিল, তবে সে ওকের জন্য অপেক্ষা করছিল। এই সব সময়ে ওকের সাহচর্য্য তার কাছে অপরিহার্য্য, কেমন যেন একট অধিকারবোধও এসে গিয়েছিল তাব। কিন্তু ওককে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। অগত্যা সে বলল—দেখুন যদি জায়গা থাকে তো, একটুখানি দেখে আমি বেরিয়ে আসব।

একটু পরেই দেখা গেল বোল্ডউডের পাশে পাশে বাথশেবা তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। বোল্ডউড তাকে একটা 'রিজার্ভ সিটে' বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। একটু পরেই বাথশেবা দেখতে পেল, অদূরে জ্যান কোগান আর জোসেফ পুয়োরগ্রাস নিবিষ্ট মনে খেলা দেখছে।

ট্রয় একবার তাঁবুর ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখে—সামনেই বসে আছে তার স্ত্রী। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে ভিতরে ঢুকে গেল। মনে মনে অবশ্যি ট্রয় আশা করছিল যে ওয়েদারবেরীর কারও না কারও সঙ্গে তার দেখা হবে—কিন্তু এ যে বাথশেবা স্বয়ং! জামা-কাপড়ে পরিচয় গোপন করতে পারলেও, চলাফেরায় তো সে ধরা পড়ে যাবেই। পরিস্থিতি এমন হতে পারে একথা সে আগে ভাবে নি। বাথশেবাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল, যে ওয়েদারবেরীর লোকদের সম্পর্কে ট্রয়ের অনীহা বদলে গেল। নিজের পরিচয় গোপন করার ইচ্ছা তো ছিলই তদুপরি লজ্জা আর সঙ্কোচ এসে তাকে ঘিরে ধরল। এতদিন পর বাথশেবা তার স্বামীকে সার্কাস পার্টিতে দেখে কি ভাববে।

কিন্তু বিপদ এলেই ট্রয়ের মাথায় বুদ্ধি খেলে বেশী। তাকে খুব তৎপর দেখা গেল। মুহূর্তের মধ্যে কি ভেবে ম্যানেজারের ঘরের দিকে এগুলো সে, গিয়ে বলল—কে এখন টাকা দেবে শালাকে?

—কেন কি হ'ল?

—ঐ যে তাঁবুর মধ্যে বসে আছে এক মূর্তিমান—ব্যাটা কিছু টাকা পেত আমার কাছে—আমাকে দেখলেই তো চিনে ফেলবে—এখন কি করা যায়?

—কিন্তু তোমার তো স্টেজে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।

—আমি যেতে পারব না।

—সে কি?—ম্যানেজার ঘাড় নাড়তে লাগল—তাতো হয় না।

—হোক বা না হোক। আমি নামতে পারব না। ট্রয় দৃঢ়ভাবে বলল।

—আচ্ছা, দেখি কি করা যায়। ম্যানেজার বোধহয় তার একজন কুশলী

কারিগরকে চটাতে চাইছিল না। একদিনের তো ব্যাপার নয়—শো চালিয়ে পয়সা তুলতে গেলে কর্মচারীদের অন্যায় বায়না কখনও কখনও সহ্য করতে হয়। বিশেষতঃ খেলাটি খুব মনোযোগের খেলা—যে কোন মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা।

ম্যানেজার কোনরকমে বলে কয়ে একজন বদলী খেলোয়াড়কে রাজী করালো। ঠিক হ'ল যে, সেকেণ্ড শো'য়ে তার খেলা ট্রয় কিছুটা পুষিয়ে দেবে।

সেকেণ্ড শো'তেও ট্রয়কে তার স্বাভাবিক মুডে দেখা গেল না। একবার যেন মনে হ'ল হঠাৎ সে তার খেলা শেষ করে দিতে চায়। দর্শকদের মধ্যে একটি লোক, দুটো গর্তে ঢোকা তীব্র চোখ দিয়ে যেন তাকে গিলছিল। ট্রয় তাকে চিনতে পেরে যতই ভাবভঙ্গি পাল্টানোর চেষ্টা করুক না কেন, সে বুঝতে পারছিল, যে শয়তানের শিরোমণি পুরনো বেলিফ পেনিওয়েজ এর চোখে সে ধরা পড়ে গেছে। পেনিওয়েজ এর চাকরি চলে গেলেও সে ওয়েদারবেরীর আশে পাশেই ঘোরাফেরা করত, মাঝে মাঝে বাথশেবার ফার্মেও যাতায়াত করত।

ট্রয় প্রথমে ভাবল ব্যাপারটা সে উড়িয়ে দেবে। হয়তো সে সত্যিসত্যি লোকটির চোখে ধরা পড়ে গেছে, তবুও একেবারে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায় না। কিন্তু তারপরেই মনে হল ওয়েদারবেরীতে এ খবর বানের জলের মত ছড়িয়ে পড়বে। তার স্ত্রীর চোখে কত হেয় হয়ে পড়বে সে, সার্কাস পার্টির লোক বলে। একেবারেই যে ওয়েদারবেরীতে ফিরবে না এমন কোন ইচ্ছাও ছিল না তার। আবার বাথশেবার বর্তমান হাল হকিকৎ সম্পর্কে জানবার ইচ্ছাও হচ্ছিল খুব। এই মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ট্রয় দর্শকদের পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল। সে ভাবল পেনিওয়েজ এর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ট্রয়ের মুখে নকল দাড়ি। এদিকে রাত হয়ে গেছে বেশ। ভদ্রলোকেরা যে যার গাড়ী ঘোড়া যুতে নিয়ে ফেরবার উদ্যোগ করছে।

মেলায় সবচেয়ে বড় খাবারের দোকান দিয়েছিল পাশের টাউনের এক রেস্তরাওয়ালা। ভাল খাবার দাবার এবং ভাল বসার ব্যবস্থা বলতে এই একটাই দোকান। দোকানটার মাঝখানে আবার পার্টিশান করে আলাদা করা। সামনের দিকটা সাধারণ লোকের জন্যে আর ভেতরে ভদ্রলোকদের ব্যবস্থা। পেনিওয়েজকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে ট্রয় এখানে এসে দেখল, চটের পর্দার ওপারে যেন বাথশেবার গলা শোনা যাচ্ছে। কোনও এক ভদ্রলোকের সঙ্গে

কথা বলছিল সে। ট্রয় ভাবল, কারও সঙ্গে প্রেম করার জন্যে মেলায় আসার মত মেয়ে বাথশেবা নয়। তাহলে কি বাথশেবা তার মৃত্যুর সংবাদ নিশ্চিত বলে ধরে নিয়েছে। ট্রয় পকেট থেকে একটা কাঁচি বের করে, ছোট চৌকোনা একটা ফুটো করে ফেলল চটটার গায়ে। ফুটোটায় চোখ রেখে সে চমকে পিছিয়ে এল। ফুটোটা থেকে বাথশেবার মুখ ঠিক এক বিঘতের মধ্যে। এত কাছ থেকে ঠিক দেখা যায় না। তাই আর একটু সরে গিয়ে নীচু করে সে একটা ফুটো করল। সেখান থেকে বসে বসে সে স্বচ্ছন্দে ভেতরের সব কিছু দেখতে পাচ্ছিল। ভেতরের পুরো দৃশ্যটা এখন নজরে এল তার। বাথশেবা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল। সঙ্গের ভদ্রলোকটি মিঃ বোল্ডউড। বাথশেবা যেন নিতান্ত অবহেলায় কথা বলছিল। তার কাঁধ প্রায় চটের গায়ে লেগে। ট্রয় দেখল বাথশেবা এখনও আগের মতই সুন্দরী আছে। ট্রয় খুব আলতো করে চেয়ে থাকল, শরীরকে যথাসম্ভব দূরে রেখে। যাতে শরীরের গরমও বাথশেবা টের না পায়।

—ম্যাডাম! আর এক কাপ দিতে বলব? বোল্ডউড জিজ্ঞাসা করল।

—না, আর না— বাথশেবা উত্তর দিল। লোকটা এত দেরী করিয়ে দিল এতক্ষণ দু ঘণ্টারও আগে আমার চলে যাওয়ার কথা। মোটেই খেতাম না আমি, তবে এক কাপ চায়ের মত এমন সতেজ আর কিছু নেই, তাই।

ট্রয় বাথশেবার মুখের দিকে তাকিয়েছিল একদৃষ্টে। সাদা ঝিনুকের মতো দুটো কান। মুখের প্রতিটি ইঞ্চি তার একান্ত পরিচিত। বাথশেবা তার মানি-ব্যাগ বার করে বোল্ডউডকে বারংবার অনুরোধ করছিল দাম না দিতে। এমন সময়ে পেনিওয়েজ ঢুকে পড়ল তাঁবুর মধ্যে। ট্রয় কেঁপে উঠল ভয়ে, কি করবে সে ভেবে পাচ্ছিল না। এখনই এখান থেকে সরে গিয়ে পেনিওয়েজকে ধরে ফেলবে? দেখবে সে তাকে চিনতে পেরেছে কিনা। ভাবতে ভাবতে সে দেখল, দেরী করে ফেলেছে, কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে।

পেনিওয়েজ বলছিল—ম্যাডাম! এক মিনিট একটু গোপন কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

—এখন তো আমি শুনতে পারছি না। বাথশেবা এই লোকটিকে দেখতে পারত না। সে মাঝে মাঝেই তার কাছে এ খবর সে খবর নিয়ে আসত। নানা লোকের সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়ে সে বাথশেবার আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করত।

—ঠিক আছে তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি। পেনিওয়েজ খুব স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে

বলল। তারপর পকেট থেকে একটা পুরনো নোটবুকের পাতা বের করে তাড়াতাড়ি লিখল—"আপনার স্বামী এখানে আছেন। আমি তাঁকে দেখেছি।" কাগজটা তারপর অনেকবার ভাঁজ করে ছোট একটুখানি করে সে বাথশেবার দিকে এগিয়ে দিল। বাথশেবার হাত বাড়িয়ে নেওয়ারও ইচ্ছা ছিল না। পড়া তো দূরের কথা। তখন এক অবজ্ঞার হাসি হেসে সে লেখাটা বাথশেবার কোলের উপর ফেলে দিয়ে চলে গেল।

পেনিওয়েজ কি লিখেছিল, ট্রয় তা দেখতে পায়নি। যদিও হাবভাবে এবং কথায় মনে হচ্ছিল পেনিওয়েজ তার কথাই বলতে এসেছিল। এখন তো আর এই অনিবার্য্য ঘটনা রুখে দেওয়ার সাধ্য নেই। ইতিমধ্যে বোল্ডউড লেখাটা হাতে নিয়ে বলল—মিসেস ট্রয়, লেখাটা তাহলে আমি ছিঁড়ে ফেলি ?

বাথশেবা নিরাসক্তভাবে উত্তর দিল—না পড়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না। তবে কি লেখা আছে, আমি বেশ বুঝতে পারছি—নিশ্চয়ই কারও কাছে সুপারিশ করতে হবে নতুবা আমার কোনও কর্মচারী সম্পর্কে মিথ্যে অভিযোগ। এইই করে ও।

বাথশেবা ডান হাত থেকে বাঁহাতে নিল লেখাটা। বাঁহাতে তখনও তার মানিব্যাগটা রয়েছে। ডানহাতে একটা স্লাইস মুখে তুলতে তুলতে সে বাঁ হাতটা পাশে নামিয়ে দিল চটের ধার ঘেঁষে। ট্রয় দেখল সুযোগ এসেছে আর একবার। সে সেই সুন্দর গোলাপী হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল, সুনীল ধমনী, সুন্দর আঙুলের ডগা, কত পরিচিত ছিল একদিন এ সব তার কাছে। তার পর বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রগতিতে সে চটের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল। নিঃশব্দে ফুটোর মধ্য দিয়ে চোখ রেখে সে বাথশেবার হাত থেকে লেখাটা ছিনিয়ে নিল। চটটা ফেলে দিয়েই সে পালিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। বাথশেবার ভয়ার্ত্ত চীৎকার শুনে হাসি পাচ্ছিল তার। দৌড়ে বেড়া ডিঙিয়ে, লোকের পাশ কাটিয়ে সে তার সার্কাসের তাঁবুর সামনে পৌঁছে গেল। এখন তার পেনিওয়েজকে ধরা দরকার—পাছে সে আবার এই ঘোষনা না করে বসে।

দু একজন লোকে এক দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের গল্প করছিল। কোন বদমাস নাকি চটের বেড়ার তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে, এক তরুণী ভদ্রমহিলার হাত থেকে ছিনতাইয়ের চেষ্টা করছিল—ব্যাটা সেই মহিলার হাতের একটা কাগজকে বোধহয় ব্যাঙ্ক নোট ভেবেছিল। পয়সার ব্যাগ ছেড়ে সেইটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। বেটা বেশ ঠকেছে—বলে লোকগুলো খুব হাসছিল। তবে

এ ঘটনা খুব বেশী হৈচৈ সৃষ্টি করে নি। ট্রয় খানিকটা এগিয়ে এসে দেখল—এক বাঁশীওয়ালার সামনে খুব ভিড। বহুলোক কাতার দিয়ে তার বাজনা শুনছে। এদেরই পিছনে দাঁড়িয়েছিল পেনিওয়েজ। ট্রয় তাকে গোপনে ডেকে নিয়ে কি যেন বলল—তারপর তুজনে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

॥ ৪১ ॥

বাথশেবার ওয়েদারবেরীতে ফেরা একটু মুস্কিল হয়ে পড়েছিল—কারণ তার গাড়ীর চালক পুয়োরগ্রাসের পুরনো ব্যারাম। মেলায় এসে বিকেল থেকে সবকিছু আবার সে ডবল দেখছে—এমন লোকের হাতে গাড়ী এবং নিজেকে ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। এখন ওকের সঙ্গে যাওয়া ছাড়া আর পথ নেই। কিন্তু ওক খুব বেশী ব্যস্ত। সে আটকে পড়েছিল বোল্ডউডের অবিক্রীত ভেড়াগুলো নিয়ে। অগত্যা বাথশেবা নিজেই গাড়ী চালিয়ে চলে যাবে ভাবছিল কিন্তু রেঁস্তোরাতে ফার্মার বোল্ডউডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। (অন্ততঃ বাথশেবার তরফে ঘটনাটা আকস্মিকই ছিল)। তারপর এইরকম একটা তু:সাহসিক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় এবং বোল্ডউড তার সঙ্গে পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়ায় বাথশেবা 'না' বলতে পারল না। বোল্ডউড তাকে ভরসা দিল, অন্ধকারের জন্যে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই—একটু পরেই আকাশে চাঁদ উঠবে।

রেঁস্তোরার ঘটনার পরেই বাথশেবা উঠে পড়েছিল চলে যাওয়ার জন্যে। তার পুরনো প্রেমিকের এই সাহায্য সে কৃতজ্ঞমনে গ্রহণ করেছিল। তবে গ্যাব্রিয়েলের অভাবটা বোধ হচ্ছিল খুব। গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে যাওয়াই যেন সব থেকে সঙ্গত ও নিশ্চিন্ত। বোল্ডউডের প্রতি কোনও রূঢ় ব্যবহার করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না তার—একবারের ঘটনাতেই এত অনুতপ্ত ছিল সে। গভীর চেতনাশক্তি থেকে বাথশেবার মনে হত, যে বোল্ডউড এখনও তার প্রতি অনুরক্ত—সেজন্যে সহানুভূতিও ছিল তার বোল্ডউডের প্রতি।

বোল্ডউড বাথশেবার গাড়ীর পিছন পিছন ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। হঠাৎ কি এক কারণে সে এগিয়ে এল এবং বাথশেবার পাশে পাশে চলতে লাগল। চন্দ্রালোকিত পথে তারা মাইল তুই-তিন চলে এল নানান কথা বলতে বলতে—মেলার কথা, চাষবাসের কথা, তাদের তুজনের কাছেই ওকের প্রয়োজনীয়তার

কথা ইত্যাদি। হঠাৎ বোল্ডউড জিজ্ঞেস করল—মিসেস ট্রয়, তুমি তো বিয়ে করবে আবার?

এই আকস্মিক প্রশ্নে বাথশেবা একটু বিমূঢ় হয়ে গেল। মিনিট খানেক পরে সে উত্তর দিল—তেমন কিছু এখনও চিন্তা করি নি।

—আমিও তাই ভাবছিলাম। তবুও তোমার স্বামী গত হয়েছেন তো প্রায় বছরখানেক হ'ল। সুতরাং—

—তার মৃত্যু তো নিশ্চিত প্রমাণিত হয় নি—হয়তো সে বেঁচে আছে এখনো। বাথশেবা কোনরকমে ভেসে ওঠার চেষ্টা করল।

—নিশ্চিত না হলেও, ঘটনা পরম্পরায় তো প্রমাণিত হয়েছে। একজন ভদ্রলোক তাকে ডুবে যেতেও দেখেছে—কোনও যুক্তিতেই তার মৃত্যুকে অপ্রমাণ করা যায় না।

কিছুক্ষণ তারা চুপচাপ চলতে লাগল। শুধু চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ আর বোল্ডউডের লাগাম জিনের আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। বোল্ডউড আবার নৈঃশব্দ ভেঙে দিল—এ দুঃখ আমি কোনদিন ভুলতে পারব না—যে ভাবে তুমি আমার থেকে তফাতে চলে গেলে।

—সেজন্যে আমিও আন্তরিক দুঃখিত। ঘটনাটা যে ভুলবোঝাবুঝি থেকে—

—পুরনো কথা ভেবে আমি কি যে আনন্দ পাই। এমন একদিন ছিল যখন তোমার অন্তরে আমার স্থান ছিল, যখন সে আসেও নি এখানে। অবশ্যি সে সব অবান্তর, কারণ তুমি তো আমাকে পছন্দ করতে না।

—না, করতাম, শ্রদ্ধাও করতাম।

—এখনও করো?

—হ্যাঁ।

—কোনটা?

—তার মানে?

—পছন্দ করো না শ্রদ্ধা করো?

—জানি না—অন্তত: আপনাকে বলতে পারবো না। (মেয়েদের অনুভূতি তারা কথায় প্রকাশ করতে পারে না, পুরুষরাই তার বিভিন্ন রকম নাম দেয়।) আপনার সঙ্গে আমি দুর্ব্যবহার করেছি—ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছি—সেজন্য আমি চিরকালের অনুতপ্ত। কিন্তু সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার কোনও রাস্তা আমার ছিল না—এখনও নেই।

—নিজেকে অত দোষী করো না, বাথশেবা। অমন অপরাধ তুমি নিশ্চয়ই করো নি। আচ্ছা মনে কর, তোমার স্বামীর মৃত্যু যদি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, তাহলে কি তুমি আমাকে বিয়ে করে তোমার পুরনো ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে ?

—সে কথা আমি বলতে পারবো না—বলা উচিতও নয়।

—ভবিষ্যতে কোন না কোনও দিন পারবে ?

—হ্যাঁ তা সম্ভব হতে পারে।

—তুমি কিন্তু আর কোন প্রমাণ না পেলেও ছ'বছর পরে আবার বিয়ে করতে পারো। তাতে কেউ আপত্তি বা দুর্নাম করতে পারবে না।

—তা ঠিকই। বাথশেবা তাড়াতাড়ি উত্তর দিল। সে সব আমি জানি, তবে ছ সাত বছর পরে আমরা কে কোথায় থাকবো তার কি ঠিক আছে ?

—ছ বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এখন যত দীর্ঘ সময় মনে হচ্ছে কেটে গেলে মনে হবে এই তো সেদিনের কথা। ততদিন আমি অপেক্ষা করলে, আমাকে বিয়ে করবে তো ? তুমিই তো বললে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও, এইভাবেই কর না কেন ?

—কিন্তু মিঃ বোল্ডউড, ছটি বছর সময়—

—তুমি আর কারও স্ত্রী হতে চাও কি ?

—না, তা চাই না। আমি বলছিলাম এ সম্পর্কে এখনই আমাদের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া যে কথা বলছিলাম, আমার স্বামী হয়তো এখনো বেঁচে আছেন।

—ঠিক আছে, তুমি যদি চাও তবে এ আলোচনা বন্ধ থাক। তোমার দিক থেকে তো তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমি আমার মধ্যবয়সে পৌঁছে গেছি এবং অবশিষ্ট জীবন তোমাকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দিতে পারি। আমার তরফ থেকে এইটুকুই আশ্বাস আমি চাই যে, তুমি যখন ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও, এখন থেকে অনেকদিন পরে হলেও তোমাকে আমি পাব। প্রথম আসনটি কি আমারই পাওয়া উচিত ছিল না ? এইটুকু প্রতিশ্রুতিও কি তুমি দিতে পার না আমাকে ? বাথশেবা ! বল, কথা বল, শুধু একটি প্রতিশ্রুতি—তুমি যদি আবার বিয়ে কর, আমাকেই বিয়ে করবে।

বোল্ডউড এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে বাথশেবার অনেক সহানুভূতি সত্ত্বেও ভয় লাগছিল। ভয়টা কোনও আবেগজনিত বিতৃষ্ণা নয়—শুধুমাত্র

সাধারণ ভয়। বাথশেবার মনে পড়ে গেল, ইয়ালবেরী রোডের ওপরে আর এক সন্ধ্যায় বোল্ডউডের সেই উগ্রমূর্ত্তি। সে কম্পিত গলায় উত্তর দিল—আপনি যতদিন আমাকে স্ত্রী হিসাবে চাইবেন ততদিন আমি অন্য কোনও পুরুষকে বিয়ে করব না। কিন্তু এর বেশী আর কিছু—

—তাহলে, আর ছটি বছর পরে তুমি আমার স্ত্রী হবে। দুর্ঘটনার কথা স্বতন্ত্র, সে তো ঘটতেই পারে। তাহলে এবারে তুমি তোমার কথা রাখবে?

—সেইজন্যেই তো দোমনা করছিলাম এতক্ষণ।

—মন ঠিক কর, অন্ততঃ পুরনো কথা মনে রেখে কথা দাও।

বাথশেবা একবার শ্বাস নিয়ে খুব দুঃখিত গলায় বলল—

—কি যে অসহায় অবস্থায় পড়েছি! আমি আপনাকে ভালবাসি না, কোন দিনই হয়তো স্বামীর মত ভালবাসতে পারব না। তবুও যদি আপনি আমার প্রতিশ্রুতি পেলে খুশী হন, তো সেটা আমার কাছে খুবই সম্মানের ব্যাপার। প্রতিশ্রুতি আমি এখনই না দিতে পারলেও ভেবে দেখব।

—এখনই নয় মানে কখনই নয়।

—না, তা কেন? যত শিগগিরই পারি, ক্রিসমাসের সময়ে সিদ্ধান্ত নেব।

—ক্রিসমাস! বলে সে চুপ করল। তারপর এইটুকু বলে শেষ করল—তাহলে তার আগে আমি আর কোনও কথা তুলব না।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। বাথশেবার মানসিক অবস্থা দিনে দিনে এক অদ্ভুত আকার ধারণ করল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে যেন বাধ্য হয়ে জড়িয়ে পড়ছিল এক প্রতিশ্রুতির আবর্তে—অন্তরের সায় না থাকলেও নিছক প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে। ক্রিসমাস যতই এগিয়ে এল তার উদ্বেগ এবং অস্থিরতা বেড়ে যেতে লাগল।

একদিন হঠাৎ গ্যাব্রিয়েলকে সে তার অশান্তির কথা বলে ফেলল। বলে সে আনন্দ না পেলেও অনেকটা হাল্কা হল। তারা দুজনে মিলে একদিন ফার্মের হিসাব পত্র দেখছিল। হঠাৎ কথায় কথায় বোল্ডউডের কথা উঠলে, ওক বলল, ম্যাডাম, উনি তোমাকে কোনদিন ভুলতে পারবেন না, কোনদিনও না।

তখনই বাথশেবার মনের আগল খুলে গেল। সে বলতে লাগল তার নতুন বিপদের কথা। বোল্ডউড তাকে কি বলেছে এবং তার সম্মতি আদায়ের জন্যে কি অসম্ভব পীড়াপীড়ি। বাথশেবা বলল, সব থেকে দুঃখের কথা হচ্ছে,

আমার যা মনে হয়, যদিও আর কারো কাছে আমি এ কথা বলি নি, আমি মত না দিলে বোধ হয় ভদ্রলোকের মাথাই খারাপ হয়ে যাবে।

—তাই নাকি? গ্যাব্রিয়েল গম্ভীর হয়ে গেল।

—আমার মনে হয়, বাথশেবা বলতে লাগল—আমার অন্তরে কোনও ফাঁকি নেই। আর আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি আমার ওপরেই নির্ভর করছে ভদ্র-লোকেব ভবিষ্যৎ। সেই দায়িত্বের কথা মনে হলে আমি চোখে আঁধার দেখি।

—ম্যাডাম, যে কথা আমি অনেকদিন আগেও একবার বলেছিলাম—গ্যাব্রিয়েল বলতে লাগল, তোমাকে আশা করা ছাড়া ওঁব জীবনে আর কোনও বাসনা নেই। আশা করি, তুমি যেমন ভেবেছ তা ওর কোনদিন হবে না। তবে উনি এমনিতেই একটু অদ্ভুত ধবনের লোক। পরিস্থিতি যখন এতদূর গড়িয়েছে, শর্তসাপেক্ষে প্রতিশ্রুতি দিলেই পারতে।

—কিন্তু সেটা কি ঠিক? জীবনে অর্বাচীনেব মত না ভেবে চিন্তে যে সব ভুল কাজ করেছি, তার জন্যে আমার অনুতাপেব অন্ত নেই। এখন আব না ভেবে কাজ করতে চাই না। ছবছর কম সময় তো নয়! হয়তো আমরা সবাই তত দিন পরলোকের বাসিন্দা হয়ে যাব। মিঃ ট্রয় যদি কোনদিন নাও ফিরে আসেন তাই না? উনি কি ভাবছেন জানি না। কিন্তু আমি কি অন্যায় করেছি? তুমিই বল গ্যাব্রিয়েল, আমার থেকে তো তুমি বয়সেও বড়।

—আট বছরের বড ম্যাডাম।

—হ্যাঁ, আট বছরের। তা আমি কি অন্যায় করেছি?

—না, চুক্তিটা কেমন যেন অবাস্তবই মনে হয়। তোমার অন্যায় তো কিছু দেখছি না। ওক আস্তে আস্তে বলল, অন্য আর কিছু নয়, সন্দেহের কারণটা হল, তুমি যে কিছুতেই ওকে বিয়ে করতে চাইছ না। আমার মনে হয়—

—তুমি ভাবছ আমি ভালবাসি কি না, বাথশেবা ছোট করে বলল। সত্যি কথা বলতে কি, আমার জীবন থেকে প্রেম ভালবাসা বিদায় নিয়েছে, সে মিঃ বোল্ডউডই হোন বা অন্য যে কেউ হোক না কেন!

—তুমি যে ভালবাস না সেটাই বরং স্বস্তির কারণ মনে হচ্ছে আমার কাছে। আসল পাপ কোথায় জান? সত্যিকারের বিশ্বাস এবং ভালবাসা না থাকলে বিবাহ বন্ধনের মধ্যেই যাওয়া উচিত নয়।

—আমার ভুলের জন্যে আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী। তুমি তো জান,

গ্যাব্রিয়েল। কিবকম হাল্কাভাবে সেই ভ্যালেন্টাইনের ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল। না হলে হয়তো মিঃ বোল্ডউড কোনদিন আমাকে বিয়ে কবতে চাইতেন না। টাকা দিয়ে যদি ক্ষতিপূবণ কবা যেত, তাহলে হয়তো আমাব মন থেকে এই পাপের বোঝা নেমে যেত। নিজেব ভবিষ্যতেব জন্য আমি একটুও ভাবি না। শুধু চিন্তা হয় যে, আমাব বিবেক বিবেচনাব ওপর নির্ভব কবে, এবং আমাব স্বামী আব কোনদিন ফিববে না এই ভবসায় একটি লোক সাতটি বছব অপেক্ষা কবে থাকবে এ কেমন কথা? এ বকম বিয়েব কথা ভাবতেও আমাব পাবাপ লাগে।

—আসল কথাটা হচ্ছে তুমি কি আব সকলেব মতই তোমাব স্বামী মারা গেছেন একথা বিশ্বাস কব?

—এখন না কবলেও একদিন নিশ্চযই কবতে হবে। কাবণ বেঁচে থাকলে এতদিনে হয়তো ফিবে আসতো।

—তাহলে তো তোমাব পুনবায় বিয়ে করতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। কিন্তু তুমি পাদ্রী মশাইকে একবাব জিজ্ঞেস কব না কেন, মিঃ বোল্ডউডকে কি বলা যায় সে ব্যাপাবে।

—না। কোন বিষয়ে খোলামনে বিচাব কবতে হলে, আমি সেই পেশার লোকদেব পবামর্শেব বিশেষ ধাব ধাবি না। তাই আইনেব সমস্যা উপস্থিত হলে, আমি পুরুৎঠাকুবেব কাছে যাই। ডাক্তাবী সমস্যা এলে উকিলেব কাছে যাই। ব্যবসাব আলোচনা কবি ডাক্তাবেব সঙ্গে, আব আমাব ব্যবসাব ম্যানেজার তোমাব উপব নির্ভব কবি নীতিগত প্রশ্নে।

—ও, আব তোমাব ভালবাসাব ব্যাপাবে?

—নিজের উপবেই নির্ভব কবি।

—বিচার শক্তিটা বোধ হয় ঠিক হল না তোমাব। ওক গম্ভীবভাবে হেসে বলল।

বাথশেবা তক্ষুনি উত্তব দিল না। একটু পরে 'গুড ইভনিং' বলে বিদায় নিল।

বাথশেবা তার অন্তবের সমস্ত কথা ব্যক্ত কবে দিয়েছিল। গ্যাব্রিয়েলের উত্তর সম্পর্কে তার আগ্রহ বা অনাগ্রহ কিছুই ছিল না। কিন্তু তাব রহস্যপূর্ণ হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে কোথায় যেন একটা ব্যথা খচখচ কবে বিঁধছিল, তার কারণকে সে বিশেষ আমল দিতে প্রস্তুত নয়। ওক একবারও বলল না যে, সে নিজেই বাথশেবাকে নির্দিষ্ট সময় পবে বিয়ে করতে আগ্রহী। একবারও

বলল না 'আমিও মিঃ বোল্ডউডের মত অপেক্ষা করতে রাজী'। এই বেদনাটাই বোলতার কামড়ের মত যন্ত্রণা হয়ে বিঁধছিল তাকে অনুক্ষণ। এমন কোনও অনুমানে অবশ্যি তার বিশেষ আস্থা ছিল না। ভবিষ্যৎ যে অনিশ্চিত সে কথাই তো সে সর্বদা বলে এসেছে। আর গ্যাব্রিয়েল তাকে ভালবাসার কথা বলবে এমন আর্থিক সঙ্গতি গ্যাব্রিয়েলের কোথায়? তথাপি সে একবার তার পুরাতন প্রেমের আভাস দিতে পারত! অথবা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করতে পারত সে প্রসঙ্গ তুলবে কি না। এ রকমটি হলে বাথশেবা আর কিছু না হোক খুব খুশী হত, তখনই সে দেখাতে পারত মেয়েদের 'না' কখনও কখনও কত ইতিবাচক এবং আর্দ্র হতে পারে। তাই বলে এমন ঠাণ্ডা উপদেশ কে চেয়েছিল? আর চাইলেই কি উপদেশ দিতে হবে নাকি? এইসব ভাবনা চিন্তায় তার সারা বিকেল কেটে গেল।

॥ ৪২ ॥

ক্রিসমাস ইভ এসে গেল। সেদিন সন্ধ্যেবেলা বোল্ডউডের পার্টি দেওয়ার কথা। বিষয়টা ওয়েদারবেরীতে খুব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ক্রিসমাস ইভের দিনে পার্টি দেওয়াটা এমন কিছু আলোচনার বিষয় হতে পারে না, আশ্চর্য যেটি তা হল, বোল্ডউড এর এই পরিবর্ত্তন। সেই আজ নিমন্ত্রণ করেছে সবাইকে। ব্যাপারটা যেমন অস্বাভাবিক তেমনিই অসঙ্গতিপূর্ণ। ঠিক যেন কোনও মহামান্য বিচারপতি নাটক করতে নেমেছেন। পার্টি যে বেশ জমজমাট হবে তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। এই চিরকুমারের গৃহ আজ বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত। ফুলে ফুলে, লতায় পাতায় খুব জমকালো আয়োজন। ভোর ছটা থেকে ভেতর বাড়ীতে উনুন জ্বলছে। সেখানে অবিরাম কেক আর খাবার তৈরী হচ্ছে। বিকেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় হলঘরটার মধ্যে থেকে সমস্ত চেয়ার টেবিল সরিয়ে, নাচবার জন্য প্রশস্ত জায়গা বার করা হল।

কিন্তু এত সব সত্ত্বেও আমোদ বা ফুর্তির চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। গৃহকর্তার এ বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতার খুবই অভাব। তাই সর্বত্রই যেন অযথা গাম্ভীর্য্যের বাহুল্য। আর সব কিছুর মধ্যে একটা ভাড়া করা গন্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত কিছু নয়।

বোল্ডউড জামাকাপড় পরছিল। ক্যাষ্টার ব্রিজ থেকে দর্জি নিজে চলে

এসেছে তার তৈরী কোট ঠিকমত ফিট্ করল কি না দেখতে। পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে বোল্ডউডকে এতবেশী খুঁৎখুঁতে আর কখনও দেখা যায় নি। কখনও হাতাটা টেনে, কখনও বা কলারটা চেপে ধরে নানাভাবে দেখা হচ্ছিল। অবশেষে দর্জি তার বিল মিটিয়ে চলে গেলে, ওক এসে ঢুকল সারাদিনের কাজকর্মের খবর দিতে।

—ও! ওক! বোল্ডউড বলল—আজ রাত্রে নিশ্চয়ই আসছ। একটু আনন্দ-স্ফূর্তি করা যাবে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে সমস্ত আয়োজন রেখেছি।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চেষ্টা করব আসতে। তবে হয়তো দেরী হয়ে যাবে একটু —ওক ধীরভাবে বলল—আপনার যে এইরকম পরিবর্ত্তন হয়েছে, দেখে খুব ভাল লাগছে।

—আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে। এত আনন্দ হচ্ছে যে কি বলব—দিনটা এত শিগগির ফুরিয়ে যাবে বলে দুঃখও হচ্ছে। সুখের সময়েও দুঃখের কালোছায়া যেন আমাকে ছাড়তে চায় না। কেমন যেন ভয় করে এত সুখ কি আমার কপালে সইবে। যদি কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যায়। অবশ্যি এ সবই হয়তো অলীক ভীতি। বোধহয় আমার রাত্রি এবার ভোর হচ্ছে।

—আশা করি আপনার সুখের দিন দীর্ঘ ও শান্তিপূর্ণ হবে।

—আচ্ছা ওক! মেয়েরা কি কথা দিলে কথা রাখে?

—নিতান্ত অসুবিধা না হ'লে রাখে বৈকি!

—ঠিক কথা দেয়নি এখনও—প্রায় কথা দেওয়ার মত।

—প্রায় কথা দেওয়ার ব্যাপারে বলতে পারি না—ওক ঈষৎ বাঁকাভাবে বলল—ও কথার তো কোনও মানে হয় না—চালুনির মত বড় বড় ছিদ্র ওতে।

—ও কি কথা বলছ ওক! তুমি আজকাল সন্দেহবাদী হয়ে পড়েছ কেন? মনে মনে আমি যতই তরুণ হচ্ছি—তুমি যেন বয়স্ক হয়ে যাচ্ছ। যাকগে প্রায় প্রতিশ্রুতির কথা ছাড়ো, কোনও এক সময়ে প্রতিশ্রুতি দেবে বলে যদি কথা দেয়, সে কথা কি রাখে? বল ওক! তুমি তো আমার থেকে মেয়েদের বেশী জান।

—আপনি বোধহয় আমার বিচারবুদ্ধিকে খুব বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন। তবে কথা হচ্ছে খুব বেশী দীর্ঘ ব্যবধানের প্রতিশ্রুতি সাধারণতঃ রাখা যায় না। আর আপনি যখন একবার প্রতারিত হয়েছেন। তিনি হয়তো খুব সৎ বিশ্বাসেই কথা দিয়েছেন তথাপি তাঁর বয়স এখনও খুবই কম।

—প্রতারিত? কক্ষোনো না। আমাকে তো প্রথমবারে সে কথাই দেয়নি—কাজেই কথা না রাখার প্রশ্ন উঠতে পাবে না। কথা দিলে সে নিশ্চয়ই আমাকে বিয়ে করবে। বাথশেবা কথার খেলাপ করে না। বোল্ডউডের উত্তরটা খুব তীব্র শোনাল।

ক্ষণিক নীরবতার পরে বোল্ডউড বলতে লাগল—ওক! শোন, চলে যাওয়ার আগে একটা দরকারী কথা আছে। আমি ভাবছি, আমার ফার্মে তোমার যে শেয়ার আছে, সেটাকে বাড়িয়ে দেব। আমি তো আজকাল কোন কাজকর্মই দেখতে পারছি না—তাই আমি স্লীপিং পার্টনার হয়ে যেতে চাই। আর তুমি যেহেতু যাবতীয় দায়িত্ব বহন করছ—তোমার লভ্যাংশ বেড়ে যাওয়া উচিত। তাছাড়া আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে, আশাকরি খুব শিগ্‌গির হয়ে যাবে—

—আমার অনুরোধ, অত বেশী নিশ্চিত হবেন না—ওক তাড়াতাড়ি বলল—ভবিষ্যতে কি হবে না হবে কেউ বলতে পারে না। কথায় বলে, চায়ের কাপ আর ঠোঁটের মধ্যেও কি যেন—আমার যুক্তি হ'ল কোন বিষয়ে অত অতিরিক্ত স্থিরনিশ্চিত হবেন না।

—বুঝেছি, বুঝেছি। আমি তোমার শেয়ার বাড়িয়ে দিতে চাই তার কারণ তোমার প্রাক্তন ইতিহাস আমি কিছু জেনেছি। তুমি যে অত দেখেশুনে কাজ করো, তার কারণ তুমি তো নেহাৎ বেতনভুক কর্মচারী নও। তাছাড়া তুমি একটি মানুষের মত মানুষ—আর আমিও তোমার সফল প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য তোমার ত্যাগ স্বীকারই আমার সাফল্যের কারণ। সে সব যাইহোক—তোমার প্রতি বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ এটুকু আমার উপহার।

—তার কোনও দরকার ছিল না। ওক তাড়াতাড়ি বলল—এতো আমাকে মেনে নিতেই হবে—অন্যেরা যেমন সহ্য করে। আমিই বা পারব না কেন।

ওক তারপরে চলে গেল। বোল্ডউডের কথা ভেবে তার খারাপ লাগছিল—লোকটি দিনরাত এই এক চিন্তা করতে করতে কেমন যেন বদলে গেছে।

বোল্ডউড কিছুক্ষণ একলা বসেছিল ঘরে। অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে সে এখন তৈরী। মনের উদ্বেগও কেটে গেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে দেখল—দিগন্তরেখা জুড়ে আকাশের ক্যানভাসে কেবল গাছের ছায়া দেখা যাচ্ছে। তারপর গোধূলি ঘন হয়ে অন্ধকার নেমে এল। বাইরের দরজায় গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। বোল্ডউড নীচে নামার তোড়জোড় করছিল

—এমন সময়ে বুড়ো একটা চাকর এসে খবর দিল—অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। বোল্ডউড উত্তর দিল—আচ্ছা, আমি আসছি। কে এলেন? মিসেস ট্রয?

—না, তিনি এখনও আসেন নি।

বোল্ডউড একটু বিমর্ষ হল, কিন্তু বাথশেবার নাম করতেও যেন শরীরে শিহরণ জাগছিল।

॥ ৪৩ ॥

বোল্ডউডের বাড়ীর সামনে, সদর দরজার ঠিক বাইরে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কিছু লোক কথাবার্তা বলছিল। কোনও ভদ্রলোক বা অতিথি এসে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলে, তাদের চোখেমুখে আলো ছড়িয়ে পড়ল। একজন ফিসফিস করে আর একজনকে বলল—অবিশ্বাসের কিছু তো দেখিনে—কারণ তাঁর ডেডবডি তো কখনই পাওয়া যায় নি। এই তো আজই একটা ছেলে বলছিল—বিকেলের দিকে তাঁকে ক্যাষ্টারব্রিজে দেখেছে।

আর একজন বলল—ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত, তবে আমাদের ম্যাডাম কিন্তু কিছুই জানেন না।

—কিচ্ছু না।

-আসলে বোধহয় ওকে জানতে দিতে চায় না। অপর আর একজন বলল।

—তবে বেঁচে থেকেও যে এদিকে ঘোরাফেরা করছে গোপনে, তার মানে ওর কোনও কুমতলব আছে। প্রথমজন বলল—ম্যাডামের জন্যই দুঃখ হয়—ওঁর জীবনটাকে শেষ করে দেবে। কেন যে এমন একটা লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন—নিজে যা বোঝেন, তাই করেন কিনা।

—ও কথা বোলো না, বয়েসটাই বা কি ছিল ওনার তখন—তাছাড়া মানুষটা কেমন হবে সে কথা জানবেই বা কি করে?

-সে যাইহোক, আমাদের এব্যাপারে চুপচাপ থাকাই ভাল। যদি এসব সত্যি না হয় তো ম্যাডাম খুব রেগে যাবেন—এবং ওঁর সুনাম নষ্ট হবে। আর সত্যি হলেও বিপদকে ঠেকানর কোনও রাস্তা নেই। আহা ভগবান! যেন মিথ্যে হয় এসব। হেনরি ফ্রে ভদ্রমহিলার সম্পর্কে যে অভিযোগই করুক না

কেন—আমাকে উনি কোনদিন ভাল ছাড়া মন্দ করেন নি। সত্যি কথার জন্যে যত ক্ষতিই হোক না কেন, সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলেন না কখনো।

—ঠিক কথা, উনি একেবারেই বলেন না। যত খারাপই হোক না কেন, উনি তোমার মুখের উপরে বলে দেবে ভেতরে ভেতরে কিছু করবে না।

তারপরে কিছুক্ষণ কেউ আর কথা বলল না। প্রত্যেকে নিজের নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকল। ভেতর থেকে আনন্দস্ফূর্তির আওয়াজ ভেসে আসছিল। তারপর সদরের দরজাটা খুলে গেল। চৌকোনা আলোর ফ্রেমে দাঁড়িয়ে মিঃ বোল্ডউড। একটু এগিয়ে বোল্ডউড বাইরে এল একবার—তারপর ভেতরের প্যাসেজটায় ফিরে গিয়ে লম্বা শ্বাস নিল। খুব মৃদুস্বরে বোল্ডউডের কথা শোনা যাচ্ছিল—হে ভগবান, ওকে একবার এনে দাও—নাহলে এ সবই আমার দুঃখের বোঝা হবে। ও ডার্লিং, ডার্লিং, কেন তুমি এত কষ্ট দিচ্ছ আমায়।

বোল্ডউডের কথাগুলো বাইরে থেকে স্পষ্ট শোনা গেল। ভেতরের কোলাহল উত্তরোত্তর বাড়ছিল। মিনিট কয়েক পরেই একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল। বোল্ডউড তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিল—আলোয় দেখা গেল বাথশেবা ঢুকছে। বোল্ডউড শুধু স্বাগত জানিয়েই তার আবেগ সংযত রাখল। মৃদু হেসে সে বাথশেবাকে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে গেল। এসবই বাইরে থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একজন লোক বলল—হায় ভগবান, এই অবস্থা! আমি ভেবেছিলাম ওঁর পুরনো খেয়াল টেয়াল কেটে গেছে।

—তা'লে তুমি ওঁর সম্বন্ধে কিছুই জান না।

—আমার মনে হয়, আমরা যা শুনেছি, এখনই বলে দেওয়া ভাল—প্রথম ব্যক্তি বলতে লাগল—নাহলে এর ফলাফল অনেকদূর গড়াবে। বেচারী মিঃ বোল্ডউড সহ্যই করতে পারবে না। সব থেকে ভাল হত ট্রয় এসে পড়লে। ভগবান! এরকম ইচ্ছার জন্যে ক্ষমা করো—ঐ লোকটি ওয়েদারবেরীতে আসার পর থেকে এখানকার কোনও মঙ্গল হয়নি। নাও—চলো। আমি এখন ভেতরে ঢুকবো না—একটু ওয়ারেনের সরাইখানা থেকে ঘুরে আসি।

স্যামওয়ে, টল আর স্মলবেরী সরাইখানার দিকে এগুলো আর বাকীরা ঢুকে গেল ভেতরে। ওরা তিনজন সদর রাস্তায় না এসে পেছনদিককার বাগানের মধ্য দিয়ে সরাইখানায় হাজির হ'ল। কাঁচের জানলা দিয়ে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছিল। স্মলবেরী ছিল সামনে। একটু থেমে, হঠাৎ কি যেন দেখে সে সঙ্গীদের বলল—এই চুপ—ঐ দেখ।

জানালার আলোয় দেখা গেল একটা মানুষের মুখ—কাঁচে মুখ রেখে ভেতরদিকে তাকিয়ে আছে। এখন আর অবিশ্বাসের কিছু রইল না। ট্রয় একেবারে দেওয়ালের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু ভেতরে দেখছেই না—কিছু কথাবার্ত্তাও শুনছে বোধ হয়। সরাইখানার ভেতরে ওক এবং বৃদ্ধ সরাইওয়ালা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বুড়ো জিজ্ঞাসা করছিল—

—আজকের সব ফূর্ত্তিফার্তা বোধ হয় ম্যাডামের জন্যে তাই না? ওপরে অবশ্যি বলছে ক্রিসমাসের কথা।

—আমি ঠিক বলতে পারি না। ওক উত্তর দিল।

—না, না, এটাই আসল ব্যাপার। আমি বুঝি না, ফার্মার বোল্ডউড এই বয়সে বোকার মত একটি মেয়ের পেছনে কেন ছুটছে? আর সে মেয়ে তো তাকে একেবারেই পোঁছে না।

ট্রয়কে দেখে লোকগুলো আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল। বাথশেবার ভাগ্যে আজ রাত্রির গুরুত্ব অনেক। প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি কথাই তার সম্পর্কে সম্পর্কিত। বেশ কিছুটা তফাতে চলে এলে, স্যামওয়ে বলল—

—তাহলে এখন কি করা যায়? কি করবে?

—আমাদের আর কি করার আছে—আস্তে আস্তে বলল স্মলবেরী।

—শুধু আমাদের কেন, প্রত্যেকেরই কিছু করার আছে—স্যামওয়ে বলল—আমার মালিক মিঃ বোল্ডউড ভুল পথে চলছেন—আর ম্যাডাম তো কিছুই জানেন না। লাবান! তুমি বরং গিয়ে ম্যাডামকে বলে এসো—

—আমি ওসব পারি না, ভয় লাগে—লাবান বলল—আমার মনে হয় উইলিয়ামের যাওয়া উচিৎ—ওই আমাদের মধ্যে বড়।

—বড় বলে আমার অপরাধটা কোথায়? স্মলবেরী বলল—আরে চুপ করে বসে থাকো না—একটু পরেই দেখবে ট্রয় নিজেই উপস্থিত হয়েছে।

—তার কোন নিশ্চয়তা নেই—চল লাবান, চল—

—ঠিক্ আছে, যেতে হয় তো যাবো—কি বলতে হবে?

—শুধু গিয়ে আমার মালিকের সঙ্গে দেখা কর।

—না, না, আমি মিঃ বোল্ডউডের সঙ্গে কথা বলতে পারব না। বড়জোর ম্যাডামকে বলতে পারি।

—ঠিক আছে, তাই হোক—স্যামওয়ে বলল।

লাবান দরজার কাছে গেল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউয়ের

মত কলকোলাহল ভেসে এল হু হু করে—আবার দরজা বন্ধ করতেই মৃদু হয়ে গেল আওয়াজ। ঘরের মধ্যে লোকগুলো উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছে। একটু পরে লাবান ফিরে এল সেখান থেকে, আমতা আমতা করে বলল—আমি কিছু বলতে পারলাম না। ওখানে ওব মধ্যে কথা বলা যায় না—সবাই হাসি ঠাট্টা করছে তার মধ্যে আমি কি করে বলি।

—ঠিক আছে। সবাই মিলে যাই তবে, দেখি, একবার বলা যায় কিনা।

ঘরের মধ্যে তখন খুশীর হুল্লোড। যুবক যুবতীরা একসঙ্গে নাচছে। বাথশেবা কি করবে বুঝতে না পেবে চুপচাপ বসেছিল। তাব চারপাশে এক মর্যাদা ও গাম্ভীর্যের পবিবেশ। বাথশেবা কখনও কখনও ভাবছিল—না আসাই উচিত ছিল। কিন্তু না এলে খুবই অভদ্রতা এবং নিষ্ঠুবতার কাজ হ'ত সেটা। তাই সে ভেবেছিল—কোনবকমে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে ফিবে যাবে, নাচ গান বা কিছুতেই অংশগ্রহণ কববে না।

চলে যাওয়াব সময় হয়ে এসেছে। বাথশেবা লিডিকে বলল—তাডাতাডি করাব দরকার নেই। বলে উঠে পডল। একটু পায়চারী কবে সে হলঘর থেকে পাশের বসবার ঘবে গেল। এটিও সুন্দব কবে সাজানো, কেউ ছিল না এ'ঘরে। একটু পবেই গৃহকর্তা এসে ঢুকলেন।

—মিসেস ট্রয! এখনও কিন্তু চলে যাওয়ার সময় হয় নি—সবে শুরু হয়েছে।

—আপনি যদি কিছু না মনে করেন, আমি এখনই চলে যেতে চাই—বাথশেবাব আচরণে লজ্জা ও সঙ্কোচ। তাব পুরনো কথা মনে পড়ছিল, এখনই বোল্ডউড তাকে প্রতিশ্রুতির জন্যে চাপ দেবে। সে বলল—এখনও তো বেশী রাত হয় নি—আমি না হয় হেঁটে হেঁটেই ফিরে যাই, লিডি ওরা থাকবে'খন।

—আমি অনেকক্ষণ থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুঁজছি—বলল বোল্ডউড, বুঝতেই পাবছ, আমি কি বলতে চাই?

বাথশেবা চুপ কবে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল।

—তুমি তাহলে কথা দিচ্ছ তো? সে আগ্রহভরে বলল।

—কিসের? বাথশেবা বলল খুব আস্তে আস্তে।

—এই তো তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। তুমি বলেছিলে আজ বলবে—একথা আমি আর কাউকে বলি নি, কাউকে জানাতেও চাই না। কিন্তু তুমি আমাকে কথা দাও, এতে তো আবেগের কিছু নেই—নিছক চুক্তি।

বোল্ডউড জানত সে ঠিক উল্টোকথা বলছে—কিন্তু এইভাবে ছাড়া বাথশেবাকে বলাও যেত না—নাও, তাহলে যেমন কথা ছিল—এখন থেকে পাঁচবছর আটমাস পরে তুমি আমাকে বিয়ে করবে—ঠিক তো ?

—আচ্ছা—বলল বাথশেবা—আপনি বলছেন যখন, কিন্তু আমি যে কি অশান্তিতে আছি।

—তুমি এখনও সত্যিই সুন্দর—বোল্ডউড বলল। কথাগুলো তার আন্তরিক অনুভূতি, এর মধ্যে কোন মিথ্যাচার বা ভণ্ডামি ছিল না। কিন্তু বাথশেবার মনে এখন আর দোলা লাগে না, সে বলল—

—ওসব আর ভাবি না এখন আমি। আমি জানি না, আমি কি করছি, আমার মত পরিস্থিতিতে কি করা উচিত। কাউকে জিজ্ঞাসা করব এমনও কেউ নেই আমার। কথা যখন দিতেই হবে--কথা দিচ্ছি, তবে শর্ত হ'ল আমাব স্বামী যদি মারা গিয়ে থাকেন তবেই।

—তাহলে এখন থেকে পাঁচ ও ছয় বছরের মধ্যে।

—আপনি অত করে চাপ দেবেন না—আমি কথা দিচ্ছি অন্য কাউকে বিয়ে করব না।

—কিন্তু সময়টা বলবে তো—না হলে কেমন কথা দিচ্ছ ?

—জানি না, আমি বলতে পারব না, আমায় যেতে দিন- বাথশেবার বুক ওঠানামা করতে লাগল—আপনার প্রতি ন্যায় বিচার করতে গিয়ে আমি নিজের প্রতি অন্যায় করছি।

—দুনিয়ায় সবাব থেকে বেশী ভালবেসেছি তোমাকে। তোমার কুকুরকে বোধহয় আমার মত এত কষ্ট দাও না তুমি। তোমার জন্যে কি না করেছি—তুমি কোনদিন সে সব জানবে না। তোমার জন্যে আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত।

উত্তেজনায় বাথশেবার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। অবশেষে সে কেঁদে ফেলল।

—পাচ থেকে ছ'বছবেব মধ্যে বললে, আপনি আব আমায় চাপ দেবেন না তো—কোনরকমে কথাগুলো বলল বাথশেবা।

—না, আমি আর কিছু চাই না। শুধু উপহার হিসেবে তুমি এই আংটিটা পর।

বোল্ডউড এগিয়ে এসে বাথশেবার একখানা হাত উঁচু করে ধরল।

—ও কি ? ও আংটি আমি পরতে পারব না। বাথশেবা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।—তাছাড়া, এখনই কোন এনগেজমেন্টে আমরা যেতে পারি

না—অসম্ভব, মিঃ বোল্ডউড। আপনি পীড়াপীড়ি করবেন না। বাথশেবা জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিতে পারল না—তাই ধপ করে মেঝেতে পা ফেলল একবার। চোখে জল ভরে এল তার।

বোল্ডউড জোর করে একটা আংটি ঢুকিয়ে দিল তার আঙুলে। বাথশেবা কাঁদতে কাঁদতে বলল—এ আমি পরতে পারব না। আপনি আমায় যেতে দিন!

—শুধু আজ রাত্রের জন্যে—পরো, প্লীজ, আমাকে দুঃখ দিও না।

বাথশেবা বসে পড়ল, রুমালে মুখ ঢাকল। একটা হাত তাব তখনও বোল্ডউডেব হাতের মধ্যে—অবশেষে অতি কষ্টে আস্তে আস্তে বলল—ঠিক আছে, আপনি বলছেন যখন আজ রাত্রেব মত পরব। এখন আমার হাত ছেড়ে দিন।

বোল্ডউড তাব হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল। বলল—এবার আমি খুশী, ঈশ্বর তোমার ভাল করবেন।

বোল্ডউড ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল। একটু পরে যখন মনে হল বাথশেবা একটু সুস্থ হয়েছে—একটা ঝিকে পাঠিয়ে দিল। বাথশেবা ততক্ষণে তৈরী হয়ে নিয়েছে।

—সে আস্তে আস্তে বেবিয়ে এল, ঝিটা তার পেছনে পেছনে চলে এল। হলঘবের মধ্য দিয়ে এসে বাইরের দিকে পা বাড়াল বাথশেবা। পিছন ফিবে একবার তাকিয়ে দেখল আনন্দ স্ফূর্তির চেহাবা। বোল্ডউড একটু ভেতরে দাঁড়িয়েছিল। এখন ঘবের মধ্যে নাচ-গান বন্ধ হয়ে গেছে। সবকিছু কেমন যেন থমথমে। এককোণে কিছু লোক নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে। প্রত্যেকের চোখে কেমন যেন এক জিজ্ঞাসুদৃষ্টি।

বোল্ডউড জিজ্ঞাসা করল, কিগো! কি হল তোমাদের?

তাদের মধ্যে একজন অস্বস্তির সঙ্গে বলল, ঐ লাবান নাকি কি শুনে এসেছে তাই বলছিল।

—খবর? কিসের? বিয়ে? এনগেজমেণ্ট? জন্ম? না মৃত্যু? ফার্মার খুব হাল্কা ভাবে হাসতে হাসতে বলল। কি হল টল! বলো, আমাদেরও বলো, তোমাকে তো দেখে মনে হচ্ছে ভয় পেয়ে গিয়েছ।

—না কেউ মারা যায় নি, টল উত্তর দিল। একজন গেলে খুব ভাল হত, স্যামওয়ে বলল ফিসফিস করে।

—কি স্যামওয়ে! তুমি কি বলছ হে? বলার থাকলে জোরে বলো। না

হলে নাচ শুরু করো। এমন সময়ে বাইরের দরজায় বেশ জোরে টকটক শব্দ হতে লাগল। একটা লোক দরজা খুলে বাইরে গেল। ফিরে এসে বলল, মিসেস ট্রয়কে একজন ডাকছে।

বোল্ডউড বলল, ভেতরে আসতে বলো। আহ্বানটি পৌঁছে দেয়া হল। চাদর দিয়ে চোখ পর্যন্ত মাথাটাথা মুড়ি দিয়ে ট্রয় এসে দাঁড়াল বাইরের দরজায়।

এক অপার্থিব নিঃস্তব্ধতা নেমে এল চারিদিকে। সকলেরই দৃষ্টি তখন আগন্তুকের দিকে। ট্রয়ের সাম্প্রতিক গতিবিধি সম্পর্কে যারা জানত, তারা তাকে তক্ষুনি চিনতে পারল, আর যারা জানত না, তারা হতভম্ব হয়ে গেল। বাথশেবার দিকে কারও নজর ছিল না। সে তখন সিঁড়ির গায়ে দাঁড়িয়ে, ভ্রু দুটো কুঁচকে গেছে তার। সারা মুখে এক শুষ্কতা, ঠোঁট দুটো আলাদা হয়ে গেছে, কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নবাগত লোকটির দিকে।

বোল্ডউড তাকে ট্রয় বলে চিনতেই পারে নি। সে উৎফুল্লস্বরে আহ্বান করল, ভেতরে এস, ভেতরে এস, আমাদের সঙ্গে ক্রিসমাস উদ্‌যাপন কর।

ট্রয় আস্তে আস্তে ভেতরে প্রবেশ করল। মাথা থেকে মুড়ি দেওয়া চাদর সরিয়ে ফেলল এবং সোজা তাকিয়ে রইল বোল্ডউডের মুখের দিকে। বোল্ডউড তখনও চিনতে পারে নি, তার সুখের কণ্টক, শান্তি বিঘ্নকারী, তার দুঃস্বপ্ন, যম দূতের মত দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে, দ্বিতীয়বার তার মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে। ট্রয় যন্ত্রের মত হাসল, এবার আর বোল্ডউডের চিনতে কষ্ট হল না।

ট্রয় বাথশেবার দিকে তাকাল। বেচারী বাথশেবার তখন অবর্ণনীয় এক অবস্থা। নীচের সিঁড়িটাতে সে বসে পড়েছে, মুখ তার শুকনো এবং নীল আর কাল চোখে এক শূন্য দৃষ্টি। সবটাই মায়া, নাকি সত্যি, সে বুঝতে পারছিল না। এবার ট্রয় কথা বলল—বাথশেবা! আমি তোমার জন্য এসেছি।

বাথশেবা কোনও উত্তর দিল না।

—চলো, আমার সঙ্গে বাড়ী চলো।

বাথশেবা বসে বসেই পা নাড়ল একটু। ট্রয় তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—শুনছ, আমি কি বলছি। ট্রয়ের কথায় আদেশের ইঙ্গিত।

হলঘরের কোণা থেকে এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। যেন দূরদেশের কোন জেলখানায় আবদ্ধ ছিল এতদিন। সমবেত লোকজনের কেউ, এটা বোল্ডউডের গলা বলে ধারণাই করতে পারল না। এই আকস্মিক অভিঘাতে বোল্ডউড আপন সত্তা হারিয়ে ফেলেছিল। বাথশেবা!—তোমার স্বামীর সঙ্গে

যাও বলল, বোল্ডউড।

বাথশেবা কিন্তু নড়াচড়া করল না। সে মূর্ছা না গেলেও চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। অর্ধচেতন অবস্থায় তার চোখে সব অন্ধকার লাগছিল। ট্রয় হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিল বাথশেবা। এরকম ভয় পেয়ে যাওয়াতে ট্রয় বিরক্ত হল। সে জোর করে বাথশেবার হাত ধরে টান দিল। বাথশেবার ব্যথা লেগে থাকুক বা শুধুমাত্র স্পর্শের জন্যেই হোক, হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে সে কুঁচকে গেল ভয়ে, এবং এক তীক্ষ্ণ চাপা আর্তনাদ করে উঠল।

আওয়াজটা শোনার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই, হলঘরটার ভেতর এক ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হল। পাথরের মত স্থাণু হয়ে গেল সব লোক। ধূসর ধোঁয়ায় ভরে গেল ঘরের ভেতরটা। হতচকিত হয়ে সবাই বোল্ডউডের দিকে তাকাল। তার পেছনেই দেয়ালের গায়ে বন্দুক রাখার ষ্টাণ্ড। সাধারণ সব খামার বাড়ীতেই যেমন থেকে থাকে। বাথশেবার আতঙ্কিত আর্তনাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বোল্ডউডের মুখ থেকে সমস্ত হতাশা দূর হয়ে যায়। শিরাগুলো ফুলে ওঠে রাগে, আর চোখ থেকে ঠিকরে বেরোয় আগুন। চকিতে সে পিছন ফিরে একটা বন্দুক তুলে নেয় এবং লোড করা বন্দুক ট্রয়ের দিকে তাগ করে ঘোড়া টিপে দেয়।

ট্রয় পড়ে গেল। মৃত্যু যে কত আকস্মিক হতে পারে লোকগুলো দেখে থ হয়ে গেল। একটা দীর্ঘ প্রলম্বিত বিলাপ ধ্বনি শোনা গেল। সমস্ত শরীরটা একবার সামনের দিকে কঁকড়ে গিয়ে অনেকটা জায়গা বিস্তার করে ট্রয় পড়ে গেল।

ধোঁয়ার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল বোল্ডউড তখনও বন্দুকটা নিয়ে ব্যস্ত। যন্ত্রটায় একসঙ্গে দুটো গুলি ভরার ব্যবস্থা ছিল। বোল্ডউড পা দিয়ে বন্দুকটা চেপে ধরে দ্বিতীয় গুলিটা তার নিজের দিকে তাগ করছিল। স্যামওয়ে তার কর্মচারী, হঠাৎ খেয়াল করে দেখল ব্যাপারটা, ভয়ে আতঙ্কে শিহরিত হল সে। ততক্ষণে দ্বিতীয়বার বন্দুকের ঘোড়া টেপা হয়ে গেছে। কিন্তু বিদ্যুতের গতিতে স্যামওয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ায় বন্দুকের নিশানা ব্যর্থ হয়ে গেল। গুলি ছুটে গিয়ে লাগল সিলিং এর গায়ে।

—ঠিক আছে। বোল্ডউড একবার লম্বা শ্বাস নিল।—মৃত্যু আমার কপালে থাকলে, ঠেকাতে কেউ পারবে না।

তারপর স্যামওয়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, বাথশেবার হাতে একবার চুম্বন করে সে বেরিয়ে গেল। অন্ধকারে তাকে নিরস্ত করার কথা কারও মনে হল না।

॥ ৪৪ ॥

সিধে রাস্তা ধরে বোল্ডউড এগিয়ে চলল গ্রীষ্টারব্রিজের দিকে। তার চলায় যেমন ব্যস্ততা নেই, তেমনি শ্লথও নয়। ইয়ালবেরী হিল পেরিয়ে, মেলষ্টকের মাঠের পাশ দিয়ে, সে টাউনে যখন ঢুকল, তখন রাত এগারোটা কিংবা বারোটা হতে পারে। রাস্তায় একটিও লোক নেই। রাস্তার আলোয় শুধু সারবন্দী বন্ধ দোকানের ছাইরঙা ঝাঁপগুলো দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে ঘুরে, সে এক খিলান দেওয়া দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। লোহার বড় বড় নাটবল্টু গাঁথা আদ্যিকালের মোটা সেই দরজার গায়ে। এটি পুলিশ থানা। বোল্ডউড আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকে গেল, বহির্জগৎকে চিরকালের মত বিদায় জানিয়ে।

এর অনেক আগেই ওয়েদারবেরীতে সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। বোল্ডউডের আনন্দোৎসবের করুণ পরিণতির কথা পৌঁছে গিয়েছিল সবার কানে। ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে ওক যখন এসে অকুস্থলে পৌঁছাল, বোল্ডউড তার একটু আগে বেরিয়ে গেছে। পরিস্থিতি একেবারেই আয়ত্তের বাইরে। আমন্ত্রিত মেয়েরা ঝড়ের তাড়া খাওয়া ভেড়ার পালের মত দেয়ালের গায়ে সেঁটে আছে। বাথশেবা কিন্তু আগের থেকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। ট্রয়ের মাথাটি কোলে নিয়ে সে মেঝেতে বসে আছে, এক হাতে রুমাল দিয়ে ট্রয়ের ক্ষতস্থান চেপে ধরে। অন্য সবাই বিমূঢ় বলেই সে নিজেকে ফিরে পেয়েছিল। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকার কথা শাস্ত্রে বা দর্শনে যত সহজেই বলা হয়ে থাকুক না কেন, বাস্তবে তার অভ্যাস খুবই অসাধারণ। কিন্তু বাথশেবার কাছে অভ্যাসই ছিল তার দর্শন। মহাপুরুষদের মায়েরা যে ধাতুতে তৈরী হন, বাথশেবা ছিল সেই প্রকৃতির। চায়ের আসরে তার সম্পর্কে সমালোচনা সম্ভব নয়। দোকান-বাজারের লোক তাকে সমীহ করত। আর বিপদে হাল ধরতে দেখলে মানুষ তাকে ভাল না বেসে পারে না। সেই প্রশস্ত ঘরে বাথশেবা তার স্বামীর মাথা কোলে করে বসেছিল।

গ্যাব্রিয়েল ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বাথশেবা মুখ তুলে বলল, গ্যাব্রিয়েল! এখনই ক্যাষ্টারব্রিজে গিয়ে একজন ডাক্তার আনা দরকার। আর কোনও আশা নেই, তবু একবার যাও।

ওক ঘটনা সম্পর্কে আর কিছু বোঝার আগেই, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘোড়া সাজিয়ে রওনা দিল ক্যাষ্টারব্রিজের দিকে। মাইল খানেক চলে আসার পরে ওকের খেয়াল হল অন্য কাউকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে, তার নিজের ওখানেই থেকে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বোল্ডউডের কি হল? তাঁরও তো খবর নেওয়া দরকার। ভদ্রলোক পাগল হয়ে গেল নাকি? ঝগড়া বিবাদ কিছু একটা হয়েছিল বোধ হয়। ট্রয় কোত্থেকে এসে হাজির হল ওখানে? সবাই যাকে মৃত বলে ধরে নিয়েছে তাকে দেখে কেমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল? বোল্ডউডের বাড়ীতে ঢোকার আগে, ওক অবশ্যি ট্রয়ের ফিরে আসবার গুজব শুনেছিল। মনে মনে প্রস্তুতও হচ্ছিল তাই। কিন্তু এক আশ্চর্য্যের সম্মুখীন হওয়ার আগেই আর এক অঘটন। যাই হোক, এখন আব অন্যলোক পাঠানোর কথা ভেবে লাভ নেই। নিজের মনেই নানা চিন্তা করতে করতে ওক ক্যাষ্টারব্রিজে গিয়ে পৌছল। বাত হয়েছিল বেশ, অন্ধকারও খুব। ডাক্তারকে ডাকাডাকি করে তুলতে হল। তারপরে ওকের মনে হল, শহরে যখন এসেছি, শান্তিরক্ষকদের একবার জানিয়ে যাওয়া ভাল। নাহলে পরে হুজ্জোতি হতে পারে। থানায় গিয়ে সে জানতে পেল, কিছুক্ষণ আগে মিঃ বোল্ডউড নিজে এসে আত্মসমর্পণ করেছেন।

ওয়েদারবেরীতে কয়েকদিন খুব জল্পনা কল্পনা চলল, ন্যায়বিচার কি হওয়া উচিত। বোল্ডউডকে কতখানি দায়ী করা যায় ইত্যাদি। প্রতিদিনই শহর থেকে খবর আসে, আলাপ আলোচনা চলে, আবার পরের দিনের খবর আসার অপেক্ষায় সময় কাটে। ইতিমধ্যে একদিন বোল্ডউডের আচরণ এবং অবস্থা সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হল।

গ্রীনহিলের মেলার পর থেকে সেই ভয়ঙ্কর ক্রিসমাস ইভ পর্য্যন্ত এই পুরোটা সময় বোল্ডউড যে সর্বদাই এক উত্তেজিত এবং খানিকটা মুড়ে থাকত একথা তার ঘনিষ্ঠজনেরা জানত। কিন্তু তার মধ্যে মানসিক বিচ্যুতির কোনও লক্ষণ ক্বচিৎ কখনও গ্যাব্রিয়েল আর বাথশেবা ছাড়া কেউ লক্ষ্য করে নি। এখন একটা তালাবন্ধ ছোট তোরঙ্গের মধ্যে কিছু জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হল। মেয়েদের বহুমূল্য কিছু পোষাক-পরিচ্ছদ। সবই সিল্ক, সাটিন বা ভেলভেটের তৈরী। রং

গুলো তাদের, বাথশেবা যেমন যেমন রং পছন্দ করে তেমনি। তাছাড়া ছিল একবাক্স রত্নাভরণ। চারটে সোনার ব্রেসলেট, কয়েকটা আংটি এবং লকেট। যেমন সুন্দর তাদের ডিজাইন, তেমনি জেল্লা তার রংয়ে। বাথ এবং নানান শহর থেকে এগুলো নানান সময়ে কেনা। সযত্নে কাগজে মোড়ানো এবং প্রতিটির গায়ে লেখা 'বাথশেবা বোল্ডউড'—ছ বছর পরের একটা করে তারিখও দেওয়া ছিল সঙ্গে সঙ্গে।

ভালবাসা আর যত্নের অভাবে মানুষটার অন্তর যে একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল এই সিদ্ধান্তেই সবাই একমত হল, সেদিন ওয়ারেনের সরাইখানায় বসে। এমন সময়ে ওক ক্যাষ্টারব্রিজ থেকে বোল্ডউডের কি সাজা হল সেই খবরাখবর নিয়ে পৌছুল। তার মুখ দেখেই সাজার বিবরণ বোঝা যাচ্ছিল ভালই। সকলের অনুমান মতই বোল্ডউড নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করেছে এবং তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়েছে।

বোল্ডউডের অপরাধের জন্যে যে তাকে নৈতিকভাবে দায়ী করা যায় না এই মতটাই সাধারণের মধ্যে প্রাধান্য পাচ্ছিল এখন। বিচার শুরু হওয়ার আগেই অবশ্যি এমন সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তা বলে কেউ বোল্ডউডের মানসিক প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে নি। এখন এই যুক্তির স্বপক্ষে বহু সাক্ষ্য প্রমাণ এসে হাজির হল, যথা, গত বর্ষার সময়ে ফসলপাতি নিয়ে বোল্ডউডের তীব্র অবহেলা।

বোল্ডউডের সাজাকে পুনর্বিবেচনার আরজি জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে লেখা একটি আবেদনপত্র রচিত হল। বোল্ডউডের বন্ধুত্বের পরিসর এত বিস্তৃত ছিল না, যে ক্যাষ্টারব্রিজের বহুসংখ্যক লোকে এই আবেদনে স্বাক্ষর করবে। দোকানদারদের নীতিবিচার তুলাদণ্ডের মাপের মতই নিখুঁত, তাই বোল্ডউডের অপরাধকে অনেকেই মানসিকভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার যুক্তি খুঁজে পেল না। যাই হোক, কেউ কেউ এটাকে নিছক হত্যাকাণ্ড না মনে করে, অপ্রকৃতিস্থতার ফল বলে বিবেচনা করার আবেদন জানাল।

আবেদনের ফলাফল কি হয় না হয় তা দেখার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল ওয়েদারবেরীর লোক। মামলার রায় বেরোনর পনেরো দিন পরে, এক শনিবার সকাল আটটায় ফাঁসির সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল। শুক্রবার বিকেল পর্য্যন্তও আবেদনের কোনও ফলাফল জানা গেল না। গ্যাব্রিয়েল সেদিন ক্যাষ্টারব্রিজ জেলে গিয়েছিল বোল্ডউডকে বিদায় জানাতে। ফেরবার সময়ে সে সদর

রাস্তা এড়িয়ে গাঁয়ের রাস্তা ধরল। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হাতুড়ি দিয়ে পেটার এক আওয়াজ শুনতে পেল সে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে ফাঁসির কাঠ পোতার উদ্যোগ আয়োজন চলছে। ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল তার। গ্রামের লোক ভেঙে এল তার কাছে খবর নিতে। ক্লান্তভাবে গ্যাব্রিয়েল বলল—কিছু খবর নেই। কোন আশার কারণও দেখছি না।

—তোমার কি মনে হয় সত্যি সত্যি ওর মাথা ঠিক ছিল না? স্মলবেরী জিজ্ঞাসা করল।

—কি করেই বা বলি—ওক উত্তর দিল—যাকগে, সে পরে ভাবা যাবে। এখন কথা হ'ল আজ বিকেলে আমাদের ম্যাডাম কেমন আছেন?

—কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। শুধু মাঝে মাঝে তুমি এলে কিনা জিজ্ঞাসা করছেন আর কি হ'ল না হ'ল খবর নিচ্ছেন। উত্তর দিতে দিতে মুখ ব্যথা হওয়ার জোগাড়, তুমি এসেছ তা বলে আসব?

—না, থাক—ওক বলল—এখনও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমি আর থাকতে পারলাম না—মনটা বড় খারাপ লাগল। লাবান আছে এখানে? লাবান!

—হ্যাঁ আছি—লাবান উত্তর দিল।

—আমি বলি কি—তুমি আজ রাত্রে শহরে যাবে। ন'টা নাগাদ বেরিয়ো, খবরটা নিয়ে বারোটা নাগাদ এখানে পৌছে যাবে। এগারোটার মধ্যে যদি কিছু খবর না পাও, তা'হলে আর কোন আশা নেই।

—আমার মনে হয় বেঁচে যাবে, লিডি বলল—না হলে আমাদের মিস্ট্রেসেরও মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ওঃ! কি যে কষ্ট—দেখলে চোখ ফেটে জল আসে। এই ক'দিনে কি যে গেল ও'র জানের উপর দিয়ে।

পরিকল্পনা মত লাবান বেরিয়ে গেল। রাত এগারটা থেকেই গ্রামবাসীরা কেউ কেউ পথে বেরিয়ে পড়েছিল। ওক ছাড়া বাথশেবার অন্যান্য লোকেরাও ছিল তার মধ্যে। গ্যাব্রিয়েলের বিবেক বলছিল—বোল্ডউডের উচিত সাজা হয়েছে আর অন্তর বলছিল সে বেঁচে যাক। অবশেষে সকলেই যখন উদ্বেগে অধীর, একটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই একজন অশ্বারোহী তাদের মধ্যে এসে পৌছল।

গ্যাব্রিয়েল জিজ্ঞাসা করল—কে লাবান নাকি ?

—হ্যাঁ আমি। মৃত্যুদণ্ড মকুব হয়ে গেছে। যাবজ্জীবন হয়ে গেল।

—হুররা! কোগান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—সবার উপরে এখনও ভগবান আছেন।

॥ ৪৫ ॥

শীত কেটে যেতে বাথশেবা আবার সপ্রাণ হয়ে উঠল। সমস্ত উদ্বেগ ও অনিশ্চিতির অবসান হয়েছে। এতদিন প্রায়ই বাথশেবার ঘুসঘুসে জ্বর হ'চ্ছল বিকেলের দিকে—এখন সেটা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু দিনের বেশীর ভাগ সময়েই একা একা থাকতে ভালবাসে—ঘরের বাইরে বেরোয় না, বেরোলেও বড়জোর বাগান পর্যান্ত যায়। প্রতিটি লোককেই সে এড়িয়ে চলে, এমন কি লিডির সঙ্গেও কোনও কথা বলতে চায় না।

বেশ গরমের আমেজ এসে পড়াতে সে বাইরে বেরুতে লাগল। রোদ্দুরে ঘোরাফেরা করে এবং ফার্মের কাজকর্ম সম্বন্ধে খোঁজখবর নেয়—খোঁজখবর নেওয়া দরকারও বটে, কারণ দীর্ঘদিন এসব দেখাশুনা বন্ধ ছিল। গত ক্রিসমাসেব সেই দুঃখজনক ঘটনার এতদিন পরে বাথশেবা আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয়ে এসেছে। আগষ্টমাসের এক শুক্রবারের সন্ধ্যেবেলা সে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী এবং ফার্মের কম্পাউণ্ড ছাড়িয়ে গ্রামের মধ্যে এল। এখনও তার চিবুকে সেই পুরনো বর্ণীন আভা ফিরে আসে নি—বরং একটা কালো গাউন পরেছিল বলে বোধহয় মুখটা আরও বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে সে গীর্জার উল্টো দিকের দোকানটার সামনে এসে গীর্জার ভিতরে সংগীতের ধ্বনি শুনতে পেল। বাথশেবা বুঝল যে, ভিতরে ছেলেদের গান অভ্যাস করানো হচ্ছে। রাস্তা পার হয়ে দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকল। সামনেই অদূরে সারিসারি কবরের উপরে স্তম্ভ। সে খুব ধীরে ধীরে হেঁটে যে কোণে ট্রয় ফ্যানি রবিনের কবরে ফুল সাজিয়ে দিয়েছিল—সেই দিকে এগিয়ে গেল। কবরের উপরে লেখাগুলো পড়তে তার মুখে একটা তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ল। উপরেই ছিল ট্রয়ের নিজের কথাগুলো

'ফ্যানি রবিন (বয়স কুড়ি)-এর

[মৃত্যুদিন—৭ই অক্টোবর ১৮—]

পুণ্যস্মৃতিতে ফ্রান্সিস ট্রয় কর্তৃক নির্মিত হইল।

তাব নীচেই নতুন করে লেখা হয়েছিল—

একই শয্যায় শায়িত রহিল

ফ্রান্সিস ট্রয় (বয়স ছাব্বিশ)-এর মরদেহাবশেষ

[মৃত্যুদিন—২৪শে ডিসেম্বর ১৮—]

বাথশেবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখাগুলো পড়ল। গীর্জা থেকে অর্গ্যান-এর গম্ভীর ধ্বনি ভেসে আসছিল। মৃদুপায়ে সে গীর্জাব বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ভেতর থেকে দবজা বন্ধ। ছেলেদেব একটা নতুন স্তব শেখান হচ্ছিল। বাথশেবার বুকের মধ্যে কেমন যেন তোলপাড় করে উঠল—এতদিন সে এইসব অনুভূতির পরপারে চলে গিয়েছিল। ভেতব থেকে শিশুকণ্ঠের গান ভেসে এল—বাচ্চারা হয়তো তাব অর্থ কিছুই বুঝছিল না।

লীড—কাইণ্ডলি লাইট, এমিড দি এনসার্কলিং গ্লুম

লীড দাউ মি অন—

অন্য মেয়েদেব মতই বাথশেবার অনুভূতিও হঠাৎ এসে হাজির হত। বড একটা কিছু যেন তাব গলায় এসে আটকে যাচ্ছিল—আর চোখ ভরে আসছিল জলে। বাথশেবা ভাবছিল গাল বেয়ে অশ্রু যদি মাটিতে পড়ে তো পড়ুক। চোখ ভেঙে জল এল তার—টপটপ করে পড়তে লাগল পাথরের বেঞ্চির উপর। কেন যে কান্না পেল, বাথশেবা প্রথমে বুঝতে পারেনি। কিন্তু তারপরে কত না কথা মনে ভিড় করে এল। বাচ্চাদের মতই কথাগুলোর তাৎপর্য চিন্তা না করে ভাবে আপ্লুত হ'ল তার মন। তার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা যেন এই মুহূর্তে আবেগের স্রোতস্বিনীধারায় রূপান্তরিত হয়েছিল। দুঃখ তার কাছে এখন আর রুদ্রদাহন তাপ নয়, অবসরের বিলাসিতা মাত্র।

হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল বাথশেবা, তাই সে লক্ষ্য করেনি একজন কেউ এসে দাঁড়াল বারান্দায়। লোকটা তাকে দেখে পিছিয়ে যাবে ভাবছিল—কিন্তু কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাথশেবা তখনও মুখ নীচু করে বসেছিল। একটু পরে যখন তাকাল, মুখটা তার ভেজাভেজা, চোখ দুটো বসে ছোট হয়ে গেছে। অপ্রস্তুত হয়ে সে বলল—মিঃ ওক! কতক্ষণ এসেছ তুমি এখানে?

—এই একটু আগে—ওক খুব সম্মানের সঙ্গে বলল।

—তুমি কি ভেতরে যাবে?—বাথশেবা জিজ্ঞাসা করল।

—ভেতরে ছিলাম এতক্ষণ—গ্যাব্রিয়েল উত্তর দিল—গত কয়েকমাস ধরেই আমি এদের সঙ্গে গান গাই। বাচ্চারা চড়া সুরে গায়—আর খাদে নামলে

আমি ধরি।

—তাই নাকি? আমি ঠিক জানতাম না। তাহলে চলি—তোমার অসুবিধা হতে পারে।

—আমি তো তোমাকে যেতে বলছি না, ম্যাডাম। আর তাছাড়া আজ আর আমি গাইব না।

—না, তুমি আমাকে যেতে বলবে কেন, তা তো আমি বলি নি।

তারপর দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। বাথশেবা ওকের অলক্ষিতে মুখ মুছে নিল। একটু পরে ওক বলল—অনেকদিন তোমাকে দেখিনি, মানে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়নি, তাই না? পুরনো কথা মনে করে দুঃখের স্মৃতি জাগিয়ে তোলার ইচ্ছা ছিল না তার। তাই তাড়াতাড়ি সে কথা চাপা দিয়ে ওক বলল—তুমি কি উপাসনায় এসেছিলে?

—না, বাথশেবা উত্তর দিল—আমি একটু ঐ কবরের স্তম্ভটা দেখতে গিয়েছিলাম—যেমন বলেছিলাম লেখাটা তেমন হয়েছে কিনা। মি. ওক! তোমার মনের মধ্যে কিছু বলবার থাকলে বলো, হয়তো আমিও একই কথা ভাবছি মনে মনে।

—লেখাটা ঠিক ঠিক হয়েছে তো? ওক জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ, তুমি দেখ নি তা হলে চলো দেখে আসি।

দুজনে গিয়ে সেই কবরের কাছে দাঁড়িয়ে লেখাগুলো পড়ল।—আট মাস হয়ে গেল—গ্যাব্রিয়েল তারিখটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল—অথচ মনে হচ্ছে এই সেদিন।

—আমার কিন্তু মনে হয় কতদিন হয়ে গেল—কত বছর। এর মধ্যে আমি যেন মরে গিয়েছিলাম। আবার জীবন ফিরে পেয়েছি। আচ্ছা—আমি চলি মিঃ ওক!

ওক তার পিছন পিছন গেল। আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলব বলে ভাবছিলাম—ওক ইতঃস্তত করে বলল—এই-ই কাজকর্ম সংক্রান্ত। তুমি যদি অনুমতি দাও তো এখন বলি।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

—বলছিলাম যে, আমি হয়তো তোমার ফার্মের কাজ আর দেখাশুনা করতে পারব না। আসলে, আমি ভাবছি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যাব। এখনই না—দেরী আছে—এই শীতের পরে।

ইংল্যাণ্ড ছেড়ে যাবে? যুগপৎ বিস্মিত ও হতাশ হ'ল বাথশেবা—কিন্তু তাতে তোমার লাভ?

—ওটাই আমার পক্ষে সব থেকে ভাল মনে হচ্ছে—ওক ঈষৎ থেমে থেমে বলল—ভাবছি ক্যালিফোর্ণিয়াতে গিয়ে চেষ্টা করে দেখি যদি কিছু করতে পারি।

—শুনছিলাম যে, মিঃ বোল্ডউডের ফার্মের সঙ্গে তুমি হিসাবপত্র মিটিয়ে নিচ্ছ—সত্যি নাকি?

—হ্যাঁ কিছুটা সত্যি, তবে এখনও ঠিক হয়নি কিছু। এই বছরেই আমার চুক্তি শেষ—ট্রাষ্টির ম্যানেজার ছিলাম আমি—ভাবছি চুক্তি আর বাড়াব না।

—তা'লে, তোমাকে ছাড়া আমি কি করব? গ্যাব্রিয়েল! আমার কিন্তু মনে হয় তোমার চলে যাওয়া ঠিক হবে না। আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমি এতদিন আছ—দুঃখের দিনে, সুখের দিনে—আমরা পরস্পরের পুরনো বন্ধু—আর তুমি এত নিষ্ঠুর একটা কাজ করবে? আমি আরও ভাবছিলাম ঐ ফার্মটা যদি তুমি নিজের জন্যে লীজ নিয়ে নাও, তাহলে আমার দিকেও একটু দেখাশোনা করতে পারবে। আর তুমি কিনা চলে যেতে চাইছ?

—সে তো খুবই ভাল হ'ত।

—এখন আমি বিপদাপন্ন, নির্বান্ধব—আর এখনই তুমি ছেড়ে যাবে?

—তুমি একাকী, নির্বান্ধব বলেই আমাকে আরও ছেড়ে যেতে হবে—দুঃখিতভাবে বলল গ্যাব্রিয়েল। গীর্জা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়ে সে. হঠাৎ বিদায় নিয়ে খুব ব্যস্তভাবে উল্টোদিকে ফিরল। তারপর হনহন করে পা চালিয়ে দিল। বাথশেবার পক্ষে তাকে ধরা সম্ভব হ'ল না।

মনে মনে নতুন এক দুশ্চিন্তা নিয়ে বাথশেবা বাড়ী এল। তার নিশ্চল অন্ধকারময় জীবনে বরং একটা বৈচিত্র্য এল—কারণ এই দুর্ভাবনা তাকে ভাবিত করলেও মৃত্যুর মত চেপে বসেছিল না। বাথশেবা মনে মনে ভাবছিল, ওক কেন তাকে এড়িয়ে চলতে চায়? এতদিনে তার খেয়াল হ'ল গত কয়েক মাসের কয়েকটা ঘটনায় ওক পারতপক্ষে তার সামনে আসতে চায় নি। তখন তার তাৎপর্য্য না বুঝলেও এখন এর গভীর অর্থ সে ধরতে পারল। বেদনায় তার মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল, যে তার শেষ শুভার্থীও অবশেষে এইভাবে তাকে ত্যাগ করে চলে যাবে। কী গভীর আস্থা ছিল তার ওকের উপরে, কত না বিপদে, সে নির্ভীকভাবে তার পক্ষে দাঁড়িয়েছে—দুনিয়ার সবকিছু চলে গেলেও ওক ছিল তার অকৃত্রিম বন্ধু—আর সেই ওকও কিনা আজ ক্লান্ত, তার প্রতি অবহেলা

করছে—এই সমস্যাসঙ্কুল বিপদের মধ্যে তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

এইভাবে আরও তিন-চার সপ্তাহ কেটে গেল। বিভিন্ন ঘটনায় ওকের নির্লিপ্তভাব ধরা পড়তে লাগল আরও। এতকাল ফার্মের হিসাবপত্র দেখাশুনা বা কাজকর্মের যুক্তি পরামর্শের ব্যাপারে ওক অর্থ সময়ে বা বসবার ঘরে এসে বসত—তারা দুজনে একসঙ্গে হিসাবপত্র দেখত তাহলে ওক চিঠি লিখে রেখে যেত। এখন বাথশেবা লক্ষ্য করে দেখল যে, তার থাকবার সম্ভাবনা আছে এমন সময়গুলোতে ওক এদিকেই মাড়ায় না, কখনও কখনও যখন তার থাকার আদৌ সম্ভাবনা নেই এমন উটকো সময়ে এসে আবার চলে যায়। পরামর্শ বা নির্দেশের দরকার হলে সে লিখে পাঠায়—তাও সে চিঠিতে কোনও সম্বোধন থাকে না বা স্বাক্ষরও থাকে না। তাই সেও বিনা সম্বোধন ও বিনা স্বাক্ষরে উত্তর দেয়। বেচারা বাথশেবার মনে এইগুলো খুব বাজতে লাগল যে তাকে বোধহয় অবজ্ঞা করা হচ্ছে।

এই গম্ভীর বিষাদ ও দুর্ভাবনার মধ্যে শরৎকাল কেটে গেল। ক্রিসমাস এল আবার। বাথশেবার বৈধব্যের এক বছর পূর্ণ হল। আর তার নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা প্রায় তৃতীয় বছরের দিকে পা বাড়াল। বাথশেবা তার হৃদয় অনুসন্ধান করে দেখল বোল্ডউডের হলঘরে এক বছর আগেকার সেই তাণ্ডবের জন্য সে আদৌ ব্যথিত নয়। বরং মনে হচ্ছিল সবাই যেন তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কি তার নিজের অপরাধ সে জানে না। আর শেষে যে এক এক করে সবাই চলে যাচ্ছে, এদের দলপতি গ্যাব্রিয়েল ওক। সে দিনের কথা মনে পড়ছিল বাথশেবার। সে ভেবেছিল, আগের মতই ওক তার পেছন পেছন আসবে। কিন্তু হঠাৎ কি এক ছুতোনাতায় ওক পিছন ফিরে তাকে ত্যাগ করে চলে গেল—নিছক তাকে এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

পরদিন সকালবেলা ব্যাপারটা চরমে পৌঁছল। বাথশেবা অনেকদিন আগে থেকেই এটা আশঙ্কা করছিল। গ্যাব্রিয়েল সেদিন চিঠি লিখে তাকে যথাযথ নোটিশ দিল যে, আগামী লেডি-ডের পর থেকে তার পক্ষে ফার্মের তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হবে না। চিঠিটা পেয়ে বাথশেবা খানিকক্ষণ খুব কাঁদল, খুবই দুঃখ পেয়েছিল সে। এতকাল যাবৎ গ্যাব্রিয়েলের একতরফা ভালবাসা পেয়ে তার যেন এক অধিকার বোধ জন্মে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা যে গ্যাব্রিয়েল এইভাবে তার খুশীমত ফিরিয়ে নেবে একথা বাথশেবা ভাবতে পারে নি। আবার নিজেকেই তার যাবতীয় চিন্তা বহন করতে হবে ভেবে বাথশেবা ভয়ে কাঁঠাল.

হয়ে যাচ্ছিল। আবার হাটে বাজারে যেতে হবে, দরদাম করতে হবে, বিক্রি বাটা করতে হবে। বাথশেবা কিছুতেই এত উৎসাহ ফিরে পাবে, ভাবতে পারছিল না। ট্রয়ের মৃত্যুর পর থেকে ওকই সমস্ত মেলায় ও হাটে যেত। বাথশেবার হয়ে যাবতীয় কেনাবেচা করত। কিন্তু এখন কি হবে? তার জীবনের সমস্ত শক্তি যে নিঃশেষ হয়ে গেছে?

আজ এই সন্ধ্যায় নিজেকে এত বিপন্ন মনে হচ্ছিল বাথশেবার, যে শুধুমাত্র সহানুভূতির আবেদন জানাবার জন্যে সে পুরনো বন্ধুর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যে হওয়ার একটু পরেই সে গ্যাব্রিয়েলের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল। মাথার ওপরে তখন দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদের মেটে রংয়ের আলো।

জানালা থেকে ঘরের ভেতরে আগুনের গনগনে আভা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ভেতরে কেউ চোখে পড়ল না। বাথশেবা খুব লাজুক ভাবে দরজায় টোকা দিল, এক একবার তার মনে দ্বিধা হচ্ছিল। একা একা কোনও মেয়ের পক্ষে এভাবে একক পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে আসা—হোক না সে ম্যানেজার এবং কাজের প্রয়োজনেই তার সঙ্গে কথা বলতে আসা, অশোভন হবে কি? গ্যাব্রিয়েল দরজা খুলে দিল। চাঁদের আলো এসে পড়ল তার প্রশস্ত কপালের উপর।

—মিঃ ওক! বাথশেবা গোঙানীর মত স্বরে বলল।

—হ্যাঁ, আমিই মিঃ ওক—গ্যাব্রিয়েল উত্তর দিল। আপনার পরিচয়—ও হো! কি আশ্চর্য। আমি বুঝতেই পারি নি আমাদের মিষ্ট্রেস!

—আমি তো আর বেশীদিন তোমার মিষ্ট্রেস থাকব না, তাই না গ্যাব্রিয়েল? খুব ভেঙে পড়া গলায় বলল বাথশেবা।

—না তা নয়—আমি ভাবছিলাম—এস ভেতরে এস। দাঁড়াও, একটা আলো আনি। ওক অপ্রস্তুত হয়ে বলল।

—না, না, আমার জন্যে ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।

—আমার এখানে তো কখনই কোনও মহিলা বেড়াতে আসেন না। তাই ঠিক উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই আর কি। বোসো না, এই যে চেয়ার। আরও একটা আছে এদিকে। চেয়ারগুলোও বিশেষ ভাল না, ভাবছিলাম, দু একটা নতুন কিনব। ওক দু তিনটে চেয়ার এগিয়ে দিল।

—ঠিক আছে, ওতেই হবে।

দুজনে তারা পাশাপাশি বসল।

ফায়ার প্লেসের লকলকে আগুনের আভা যেন তাদের মুখের উপর পড়ে

নাচছিল। দুজনে দুজনকেই এত বেশী জানত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখত, তা সত্ত্বেও এই নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ভাবে যেন দেখা হল দুজনের। তাই কারও মুখে কথা ছিল না। মাঠে, হাটে, বাথশেবার বাড়ীতে, কতবারই তো কত কথা হয়েছে তাদের কিন্তু এখন যেহেতু ওক গৃহকর্তা এবং বাথশেবা তার অতিথি, তাদের জীবন মুহূর্তে যেন সেই প্রাক পরিচয়ের দিনগুলোতে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

—তুমি হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ যে আমি এসেছি—কিন্তু—

—না, না, একটুও না।

—আমি ভাবলাম, গ্যাব্রিয়েল যে তুমি হয়তো কোন কারণে আমার ওপরে ক্ষুন্ন হয়েছো, তাই চলে যেতে চাইছ। এই ভেবে মনে খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার। তাই চলে এলাম।

—ক্ষুন্ন হয়েছি? তুমি কি তেমন কিছু করতে পারো, বাথশেবা?

—কিছু করিনি তো? বাথশেবা যেন খুব তৃপ্ত হল শুনে। তাহলে কেন চলে যাচ্ছ?

—আমি তো একেবারে চলে যাচ্ছি না। তাছাড়া তোমাকে যখন বলেছিলাম, আমি ভাবি নি যে তুমি নিষেধ করবে। তাহলে আমি এগুতাম না। গ্যাব্রিয়েল খুব সরল ভাবে বলল, ঐ ফার্মটার যাহোক একটা ব্যবস্থা করেছি। এতকাল তো আমার শেয়ার ছিল ওতে। কিন্তু তাতে তোমার কাজকর্ম দেখতে আমার কোনও অসুবিধা ছিল না। কিন্তু এখন আমাদের সম্পর্কে গ্রামে এমন সব কথাবার্ত্তা চলছে।

—কি? বাথশেবা বিস্মিত হল।

—তোমাকে এবং আমাকে জড়িয়ে কথাবার্ত্তা চলছে।

—কি কথাবার্ত্তা?

—সে তোমায় আমি বলতে পারব না।

—বললে বোধ হয় ভাল করতে। অনেকবারই তো তুমি আমার ভুল শুধরে দিয়েছ। এখন কেন বলতে ভয় পাচ্ছ কি জানি।

—না, এটা তোমার কোনও ভুল নয়। কথা চলছে যে আমি এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। বেচারী বোল্ডউডের ফার্ম দখল করবার তালে আছি আবার তোমার দিকেও নজর রয়েছে আমার।

—আমার দিকে নজর রয়েছে, তার মানে?

—মানে তোমাকে বিয়ে করা আর কি? তুমিই বলতে বললে তাই বললাম, আমাকে যেন এজন্যে অন্যায় বুঝো না আবার।

ওক বোধ হয় ভেবেছিল যে, কানের কাছে বোমা ফেটেছে, এতটা চমকে উঠবে বাথশেবা। কিন্তু বাথশেবার তেমন কিছু ভাবান্তর দেখা গেল না। —আমার সঙ্গে বিয়ে? তুমি এই আলোচনার কথা বলছিলে এতক্ষণ, আমি বুঝতেই পারি নি। বাথশেবা আস্তে আস্তে বলল—না, সে কি করে হয়। বিয়ের কথা অসম্ভব, এখনই ভাবা যায় না।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভাবা যায় না। আর আমি তা চাইও না। দুনিয়ায় আর যাকেই হোক, তোমাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারি না—তুমি যা বলেছ ঠিকই, অসম্ভব।

—আমি বলেছি 'এ-খ-নই' সম্ভব না।

—তোমার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছি বলে মাপ করো—তুমি বলেছ অসম্ভব।

—আমিও মাপ চাইছি—অশ্রুপূর্ণ চোখে বাথশেবা উত্তর দিল। আমি বলেছিলাম 'এখুনি'। যাক গে যাক যা বলেছি। আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম, এখুনি সম্ভব নয়, বিশ্বাস করো।

গ্যাব্রিয়েল অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। উনুনের আগুন নিভে এসেছিল—তাই বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছিল না। গ্যাব্রিয়েল একটু কাছে সরে এসে খুব কোমলভাবে বলল—বাথশেবা! শুধু একটি কথা যদি তোমার থেকে জানতে পারতাম—তুমি আমার ভালবাসা অনুরাগ চাও কি না! আমায় বিয়ে করতে চাও কি না—শুধু এইটুকু যদি জানতে পারতাম!

—জানতে তুমি কোনদিন পাবে না, বাথশেবা মৃদুস্বরে বলল।

—কেন?

—কারণ, তুমি কখনও চাও নি।

ও হো হো—গ্যাব্রিয়েলের মুখে আনন্দের হাসি দেখা দিল—প্রিয়া আমার! বাথশেবা বাধা দিয়ে বলল—আজ সকালে তুমি একটা অত কড়া চিঠি কেন পাঠালে আমাকে? তার মানে তুমি আমার কথা একটুও ভাবো না —তাই অন্যদের মত আমাকে ফেলে চলে যেতে চাও। এত নিষ্ঠুর কি করে হলে তুমি? একবারও ভাবলে না, আমিই তোমার প্রথম প্রেমিকা। আর তোমাকেই আমি প্রথম ভালবেসেছিলাম। আমি তো কখনও ভুলতে পারি না।

—বাথশেবা! এর থেকে বাগিয়ে দেওয়ার কথা আর কিছু আছে? গ্যাব্রিয়েল হাসতে হাসতে বলল—তুমি বেশ ভালই জান, আমি একটি অবিবাহিত পুরুষ। কেউ নেই আমার। শুধু কর্তব্যবোধেই আমি তোমার যাবতীয় ভালমন্দ দেখাশুনা করি নি, অন্য কিছু টান ছিল তার মধ্যে। গ্রামের লোকে তো সেইরকমই ভাবে। তাইতো তারা তোমাকে জড়িয়ে নানা রকম কথা বলে, যেটা আমার মনে হয়েছে তোমার সুনামের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। সেজন্যে যে মনে মনে কত কষ্ট পেয়েছি আমি, কেউ জানে না।

—ও! এই কথা?

—হ্যাঁ।

—ও! ভাগ্যিস এসেছিলাম তোমার কাছে। বাথশেবা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। আমি ভাবছিলাম না জানি কি হয়েছে তোমার। তুমি একবার দেখাও কর না আমার সঙ্গে। যাক গে, এখন আমি চলি। আচ্ছা গ্যাব্রিয়েল! —বাথশেবা দরজার দিকে এগুতে এগুতে ঈষৎ হেসে বলল—কি আশ্চর্য! ঠিক মনে হচ্ছে, আমি যেন তোমার কাছে অভিসারে এসেছিলাম।

—হ্যাঁ ঠিকই তো, গ্যাব্রিয়েল উত্তর দিল। এতকাল আমিই শুধু তোমার পিছে পিছে ছুটেছি। বহুদিন ধরে, বহু পথ ঘুরে ঘুরে। আর তুমি মাত্র একবার এসে ঠিকই ভেবেছ।

দুজনে হেঁটে হেঁটে অনেকদূর এল। গ্যাব্রিয়েল তার অন্য খামের বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে নানান কথাবার্তা বলল। কিন্তু দু'জনের কেউই প্রেম ভালবাসা বা আবেগ অনুভূতি নিয়ে আদিখ্যেতা করল না। বন্ধুত্বের টান যেখানে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, সেখানে ওসব বাক্যালঙ্কার বাতুলতা মাত্র। নারী পুরুষের প্রেম সাধারণতঃ সুখের দিনে শুরু হয়, দুঃখের দিনে তার দেখা পাওয়া যায় না। কিন্তু দুঃখের যন্ত্রণা পেরিয়ে, পরস্পরের বিকর্ষণকে কাটিয়েও যদি প্রেম টিঁকে যায়, তখন তা অন্তরের সম্পদ, বাহ্যিক কোনও অলঙ্কার বা অনুভূতিতে তার তিলার্ধও প্রকাশ হয় না। সেই প্রেমই অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, তার বিনাশ নেই। হায়! 'প্রেম' কথাটিকে কত খেলো করে ফেলেছি আমরা।

॥ ৪৬ ॥

এই ঘটনার কিছু পরে ওক একদিন সন্ধ্যেবেলা বসে বসে ভাবছিল—অতি সাধারণ, ব্যক্তিগত এবং অনাড়ম্বর বিয়ের কথা। কথাগুলো বাথশেবার। ওক ভাবছিল, কিভাবে সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা যায়। প্রথমেই তার মনে হল, শহরে গিয়ে বিশপের থেকে অনুমতি নিতে হবে। তাই একদিন বিকেল থাকতে সে রওনা দিল ক্যাস্টারব্রিজের দিকে। কাজকর্ম সেরে, 'সারোগেট' এর অফিস থেকে অনুমতি পত্র বার করে, সন্ধ্যের পরে পরেই সে বাড়ীর পথ ধরল। গ্রামের মধ্যে এসে হাঁটতে হাঁটতে সে দেখে, তার সামনেই চলেছে কোগান থপথপ করে। গীর্জার কাছাকাছি পৌঁছে লাবান টলের বাড়ীর রাস্তার সামনে এসে পড়ল দুজনে। লাবান টল কিছুদিন হল পুরোহিত হয়েছে। এখনও সে আগের মতই ভীতু আছে। বাইবেল পড়ার সময় শক্ত শক্ত কথাগুলো এসে পড়লে সে ভয় পেয়ে যায়। লাবান টলের বাড়ীর গলিতে এসে ওক বলল—গুড নাইট, কোগান! আমি একটু এই দিকে যাব।

—ও! কোগান বিস্মিত হল। জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার, ওক! তোমাকে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে?

কোগানকেও কিছু না বলাটা ওকের কাছে খুব অশোভন মনে হচ্ছিল। বহু দুঃখের দিনে, বাথশেবাকে নিয়ে যত মনোকষ্ট পেয়েছে সে, সর্বদাই কোগান ছিল তার বিশ্বস্ত বন্ধু। গ্যাব্রিয়েল বলল—আর কাউকে বলবে না তো, কথা দাও।

—সে তো তুমি ভালই জান আমাকে—আর আমিও জানি।

—হুঁ, তা জানি। তাহলে শোন, কাল সকালে আমি তোমাদের মিস্ট্রেসকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।

—ওমা, তাই নাকি! আমি কতদিন এ'রকম একটা কথা ভেবেছি। সত্যি বলছি ভেবেছি—কিন্তু এতদিন একেবারে চুপচাপ। যাক গে তাতে কোনও ক্ষতি নেই—প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও।

—ধন্যবাদ কোগান। আসলে এত চুপিচুপি আমি করতে চাই নি। বাথশেবা যে এইরকম চায় তার কারণ, ও বলছে যে গীর্জায় সারা গাঁয়ের লোক ভিড় করবে—ও'র দিকে তাকিয়ে থাকবে—সেটা খুব লজ্জার কারণ হবে—ওতো এমন লাজুক—আর আমিও প্রকৃতপক্ষে একটু নার্ভাস বোধ করছি।

—ও। তাতো হবেই। তাতো হবেই, তা এখন বুঝি পুরুৎঠাকুরের কাছে যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ, যাবে আমার সঙ্গে ?

—কিন্তু তা লে কি ঘটন ভুমি অত চেপে রাখতে পারবে ?—কোগান হাঁটতে হাঁটতে বলল—লাবান টলের বুড়ো গিন্নী ত। আধঘণ্টার মধ্যে সারা গাঁযে রাষ্ট্র করে দেবে ঐ খবর।

—হুঁ, তা বটে। আমি তো এতদূর ভাবিনি। ওর একটু থেমে বলল—কিন্তু আজরাত্রেই তো ওকে না বললেও নয়—সকালে খুব উঠে বেরিয়ে যায় কাজে।

—আচ্ছা চলো, আমি একটা মৎলব ঠাউরেছি। কোগান বলল—আমি লাবানকে বাইরে ডেকে নিয়ে আসব, তুমি পিছনে দাঁড়িয়ে থেকো। তারপর যা বলবার বলে দিও। ওর বৌ কিছু বুঝতে পারবে না—আমি ওর একটু চাষবাসের গল্প ফেঁদে বসবখন।

পরিকল্পনাটি যথাযথ মনে হল কোগান সাহস করে এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিল। মিসেস টল নিজেই দরজা খুলে দিল।

—লাবানের কাছে একটু দরকার ছিল।

—সে তো বাড়ী নেই, রাত এগারটার আগে বোধহয় ফিরবেও না। কাজ ছুটি করে ফিরতেই, তাকে ইয়ালবেরীতে ডেকে নিয়ে গেছে। তুমি অবশ্যি আমাকেও বলতে পারো।

—না। তোমাকে বললে হবে না। আচ্ছা দাড়াও—বলে কোগান বাইরে গেল ওকের সঙ্গে পরামর্শ করতে।

—কে ? ওখানে দাঁড়িয়ে কে ?—মিসেস সুসান টল জিজ্ঞেস করল। ও আমার এক বন্ধু, কোগান উত্তর দিল।

আগামীকাল সকাল আটটায় গীর্জার সামনে আমাদের মিস্ট্রেসএর সঙ্গে দেখা করতে বলে দাও ওকে—গ্যাব্রিয়েল ফিসফিস করে বলল—বলো, ভুল হয় না যেন—আর বেশ পরিষ্কার জামাকাপড় পরে যেন যায়।

—জামা-কাপড়ের কথা বলতেই তো ধরে ফেলবে—কোগান বলল।

—উপায় নেই—ওক উত্তর দিল।

কোগান বার্তাটি পৌছে দিল, বলল—মনে রেখ, ঝড়ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি বাদল যাইহোক না কেন, ওর যেন ভুল না হয়। দরকারটা খুব জরুরী, মিস্ট্রেস বোধহয়

অন্য কোনও ফার্মারের থেকে শেয়ার কিনে নিচ্ছেন বা লীজ নিচ্ছেন—এইসব আইন সংক্রান্ত ব্যাপার টাপার আছে। অতএব অবিশ্যি করে যাওয়া চাই। আমি নেহাৎ তোমাকে খুব ভালবাসি তাই অনেক কথা বলে ফেললাম—এসব খুব গোপন ব্যাপার।

সে অন্যকিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই কোগান বেরিয়ে গেল। তারপর দু'জন একসঙ্গে গেল ভাইকার এর বাড়ীতে। সেখান থেকে গ্যাব্রিয়েল বাড়ী চলে গেল। পরের দিনের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল।

সেদিন রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে, বাথশেবা লিডিকে বলল—

—লিডি! কাল সকালে ঠিক ছ'টার সময় ডেকে দিবি আমাকে। আমি যদি না উঠতে পারি তাহলেও ভুলে যাস না যেন।

—সে তো তুমি রোজই উঠে পড়ো, ম্যা-ম।

—তা উঠি। কিন্তু কাল বিশেষ দরকার আছে, সময়মত তোকে বলব সব। কালকে ভোরবেলা উঠতেই হবে।

বাথশেবা অবশ্যি ভোর চারটে বাজলেই উঠে পড়লো, কিছুতেই আবার ঘুম এল না চোখে। কিছুক্ষণ পর বাথশেবার মনে হ'ল রাত্রে তার ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়। সে আর অপেক্ষা করতে পারছিল না—লিডির দরজায় গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করতে লাগল। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করার পর লিডি উঠে পড়ল। অবাক হয়ে সে বলল—আমারই তো তোমাকে ডাকবার কথা, ম্যা-ম্! এখন সবে সাড়ে পাচটা বাজে।

—কে বলেছে তোকে? ছ টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। তাড়াতাড়ি উঠে আয়, মাথাটা ভাল করে আঁচড়ে দিবি আমার।

লিডি যতক্ষণে বাথশেবার ঘরে এ'ল—ততক্ষণে সে তৈরী হয়ে নিয়েছে। লিডি এত তাড়াহুড়োর কোনও কারণ বুঝতে পারছিল না। সে জিজ্ঞাসা করল—ম্যা-ম্ ব্যাপারটা কি?

—বলবখন, দাঁড়া—বাথশেবার চোখে রহস্য ও দুষ্টুমিভরা হাসি।

—ফার্মার ওকের আজ আমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন।

—ফার্মার ওক! আর কেউ না? শুধু তোমরা দুজনে খাবে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু গাঁয়ে, যে সব কথাবার্তা চলছে—এটা কি ঠিক হবে? লিডি সন্দিগ্ধভাবে বলল, মেয়েদের সুনাম নিয়ে এত পাঁচা হয়।

বাথশেবা হেসে ফেলল, লিডির কানে কানে কি যেন বলল, যদিও তার কথা শুনে ফেলবে, এমন আর কেউ সেখানে ছিল না। লিডি চোখ বড় বড় করে তাকাল, চেঁচিয়ে উঠল—কি আনন্দ! ও মা, আমি কোথায় যাবো! আমার বুকের মধ্যে যেন নেচে উঠছে।

—আমারও কেমন যেন ধুকধুক করছে বুকের ভিতর, বাথশেবা বলল।

সেদিন সকালটা কেমন যেন স্যাঁৎসেঁতে ভাব ওক অবশ্যি সময়মত বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর—

'তারপরেতে উঠল পাহাড় বেয়ে,
ধীর অথচ দৃঢ় সবল পায়ে,
যেমন করে পুরুষমানুষ হাঁটে
খোসমেজাজে। আজকে যে তার বিয়ে।

ওক বাথশেবার বাড়ীর দরজায় এসে টোকা দিল। মিনিট দশেক পরে একটি ছোট আর একটি বড় ছাতি মাথায় দিয়ে দুটি নারীপুরুষ বেরিয়ে এল, বাড়ীর দরজা দিয়ে। গীর্জা সেখান থেকে সিকি মাইলটাক দূর। গাড়ী চড়ে যাওয়ার থেকে তারা হেঁটে যাওয়াই ভাল মনে করল। এখানে ওখানে এক আধজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, ওক আর বাথশেবা, তাদের জীবনে এই প্রথম, পরস্পরের হাত ধরাধরি করে হেঁটে চলেছে। ওকের গায়ে আজানুলম্বিত কোট, বাথশেবারও তাই। বাথশেবার চিবুক, অধর অনেকদিন পরে রাঙা হয়ে উঠেছে। গ্যাব্রিয়েলের কথায়, সে আজ সকালে, সেই নরকুম্ব হিলের দিনগুলোর মত করে চুল বেঁধেছে। আজ তাকে সেদিনের সেই স্বপ্ন সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে। গীর্জায় টল, লিডি আর দু একজন লোক ছিল।

খুব অল্প সময়ে এবং অনাড়ম্বরে কাজকর্ম সমাধা হয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা, বাথশেবার বৈঠকখানা ঘরে বসে গ্যাব্রিয়েল আর বাথশেবা চা খাচ্ছিল। ফার্মার ওকের এই বাড়ীতে উঠে আসাই ঠিক হয়েছিল। কারণ তার অর্থ, বিত্ত, গৃহ বা আসবাবপত্রের প্রাচুর্য ছিল না। যদিও সে সব কিছুই কিনে ফেলবে মনস্থ করেছিল, কিন্তু বাথশেবার প্রচুর রয়েছে তাই উঠে এসেছিল এখানে।

বাথশেবা কাপে চা ঢালতে ঢালতে শুনতে পেল—তাদের বাড়ীর ঠিক সামনেই পটকা, বাজী ফাটানোর আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল—জয় ঢাক, কাঁসর, বাঁশি, ক্লারিওনেট এর বিচিত্র কনসার্ট।

ওক হাসতে হাসতে বলল, ঐ শোনো। আমি জানতাম, ওদের মুখ দেখেই বুঝেছিলাম, ওরা কিছু একটা করবে।

আলোটা নিয়ে ওক বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বাথশেবাও পিছন পিছন এসে দাঁড়াল সেখানে। নববিবাহিত দম্পতিকে দেখে লোকগুলো হুররা—বলে চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল তাদের কাড়া নাকাড়া মৃদঙ্গ জগঝম্প। এ সবই ওয়েসাবসেক্সীর আদ্যিকালের বাজনা, যুগযুগান্ত ধরে এদের পিতৃপুরুষরা বাজিয়ে এসেছে—মার্লবরোর যুদ্ধ জয়েই হোক আর গাঁয়ের বিবাহ উৎসবেই হোক। বাজনদারেরা ঘুরে ঘুরে বাজাতে লাগল সপ্তমস্বরে।

—এই মার্ক ক্লার্ক আর জান কোগানের কীর্তি এসব—ওক বলল—এস এস ভাইসব— আমি এবং আমার স্ত্রীর সঙ্গে কিছু পানাহার কর।

—না, আজ না—মার্ক ক্লার্ক বলল—আমাদের পাওনাটা তোলা থাক—আমরা সময়মত আসব। তবে আজ রাত্রে আমাদের যদি খুশী করতে চাও, তো কিঞ্চিৎ পানীয় আর খাদ্য পাঠিয়ে দিতে পার ওয়ারেনের সরাইখানায়—ওখানেই সদ্ব্যবহার করা যাবে। এস, আমাদের প্রতিবেশী ওক আর তার স্ত্রীর দীর্ঘজীবন কামনা করি আমরা।

—ধন্যবাদ, তোমাদের অশেষ ধন্যবাদ—ওক বলল। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি সব ওয়ারেনের সরাইখানায়। এখুনি আমি আমার স্ত্রীকে বলছিলাম, আমাদের বন্ধুরা নিশ্চয়ই কিছু আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করবে।

—আরে শোনো, শোনো—কোগান বলল—আমাদের বর কেমন বানান করে বলছে আমার 'ইস্তিরি'। বিগো শুনছ তোমরা?

—আমি এই কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনে কাউকে এত সুন্দর করে বলতে শুনি নি, একজন বলল।

ওক হো হো করে হেসে ফেলল। বাথশেবাও মিটিমিটি হাসছিল। তাদের বন্ধুরা সব আস্তে আস্তে চলে গেল।

—এ্যাঃই, এইবার ঠিক মানিয়েছে—জোসেফ পুয়োরগ্রাস বলছিল।—এইটা ঠিক শাস্তর মত কাজ হয়েছে। বলেচি না শাস্তর মেনে চললে তার কল্যাণ হবেই হবে। আহা কী ভক্তিমান লোক! ভগবান এদের সুখী করুন।

সমাপ্ত